তত্ত্ব-বিচার

# সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার

( পুনর্ল্লিখিত )

রায় বাহাদুর

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন, বি, এ,
প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

১৩৩০

মূল্য ২৲ টাকা।

কলিকাতা

৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৮নং নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

# উৎসর্গ পত্র

এই পুস্তক

যিনি জ্ঞানের উত্তুঙ্গশৈল-শিখরে ভক্তিমন্দাকিনী-সৈকতে সিদ্ধিরূপ-
সুবর্ণরেণু সংগ্রহ করিয়াছেন—যিনি ঘোর ধর্ম্মবিপ্লবের দিনে
শাস্ত্রের নিগূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা দ্বারা আর্য্য-ঋষি-সেবিত
সনাতন ধর্ম্মের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন
—যিনি বঙ্গের নগরে নগরে সুষুপ্তি-মগ্ন
আত্মবিস্মৃত হিন্দু সন্তানগণকে জাতীয়
জীবনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন,—

সেই আজীবন জ্ঞান-দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক,
ঋষিকল্প তপঃপরায়ণ কৃপাপারাবার

শ্রীশ্রীগুরুদেবের

শ্রীপাদপদ্মে

উৎসর্গ করিলাম।

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

শিব চতুর্দ্দশী
১৩২০ }

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

# সূচীপত্র।

# ভূমিকা

বিগত ১০।১৫ বৎসরের মধ্যে এতদ্দেশে হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই পুনরুত্থান আন্দোলনের ফলে আজ কাল অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু সন্তানগণের শাস্ত্রের প্রতি এবং স্বধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিয়াছে। অনেক শিক্ষিত লোকের মুখে আজ কাল বেদ উপনিষদ গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্র হইতে মহামূল্য সারতত্ত্ব সকলের সানুরাগ আবৃত্তি শুনিতে পাওয়া যায়। ইহা একটি বিশেষ শুভ লক্ষণ সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই অতি অল্প লোকেই সেই সকল শাস্ত্রোপদেশ অনুসারে ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। অতি অল্পলোকেই শাস্ত্রের উপদেশ অনুসারে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, প্রচলিত সাকার উপাসনা সম্বন্ধে কোন কোন বিষয়ে অধিকাংশ লোকের মনে গুরুতর সন্দেহ রহিয়াছে। পরন্তু বিগত ৫০।৬০ বৎসর যাবৎ ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিগণ যে নিরাকারবাদের আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন তদ্দ্বারা ঈশ্বরোপাসনা সম্বন্ধে প্রকৃত মীমাংসার পথ আরও দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহাদের তর্ক কুজ্ঝটিকা সমাচ্ছন্ন হইয়া অনেকের চক্ষু সত্যের জ্যোতিঃ দর্শন করিতে পারিতেছে না। সত্য নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইলেও অধিকাংশ লোকের মনে যে প্রবল ধর্ম্ম পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তাঁহারা সমুৎসুক হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে প্রকৃত তথ্য নিরূপণ বিষয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সাহায্য করিবার আশায় এই সামান্য পুস্তকখানি বিনীত ভাবে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতেছি।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ব্রাহ্মগণ হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়া আসিতেছেন ; তাহা অতি বিশদ ভাবে ও প্রাঞ্জল ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" প্রথম ভাগ ও "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" নামক পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। এজন্য এই দুইখণ্ড পুস্তক অবলম্বনে নিরাকার বাদীগণের আপত্তি খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যে সকল পাঠক-গণের উক্ত পুস্তক পাঠ করিবার সুযোগ হয় নাই, তাঁহাদের সুবিধার জন্য নগেন্দ্রবাবুর যুক্তি যতদূর সম্ভব, তাঁহার নিজের কথায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

একটি কথা প্রথমেই বলিয়া রাখি। এই পুস্তকে কেবল দেশীয় শাস্ত্র ও পাশ্চাত্যদর্শন মূলক যুক্তি অবলম্বন করা হইয়াছে, যাঁহারা শাস্ত্র না মানিয়া কেবল যুক্তির উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের মতের আলোচনা করা হয় নাই।

মদীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এ এই পুস্তকের কপি প্রস্তুত ও অধিকাংশ প্রুফ্ সংশোধন করিয়া দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। মদীয় অকৃত্রিম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীও এবিষয়ে সময় সময় সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তকে যে সকল সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা ভ্রমাত্মক বলিয়া বুঝিতে পারিলে ভবিষ্যতে সংশোধন করিতে যত্নশীল হইব।

এই সামান্য পুস্তকখানি পাঠ করিয়া যদি একটি হিন্দু সন্তানেরও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে মতি জন্মে তবে আমার সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি

বাউববালী<br>
জেলা ফরিদপুর<br>
৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

# দ্বিতীয় বারের ভূমিকা

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এই পুস্তকখানি প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল। বহুকাল হইল ইহার প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। কিন্তু নানা কারণ বশতঃ এতদিন ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে পারি নাই। অনেক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির আগ্রহাতিশয্যে এবার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম।

নানা কারণে দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিতে বিলম্ব হইয়াছে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পরে ইহার অনেকরূপ সমালোচনা ও প্রতিবাদ বাহির হয়। আদি সমাজের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "ভারতী" পত্রিকায় এক সুদীর্ঘ সমালোচনা করেন, তাঁহার সেই সমা-লোচনা তৎপ্রণীত "আধুনিক সাহিত্য" পুস্তকে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। নব বিধান সমাজের পক্ষ হইতে ৺চিরঞ্জীব শর্ম্মা ( ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ) মহা-শয় তাঁহার "নব বিধান" পত্রে সমালোচনা করেন। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মুখপত্র "তত্ত্ব-কৌমুদী" পত্রের আট নয় সংখ্যায় ধারাবাহিক ক্রমে সমা-লোচনা বাহির হয়। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সম্পাদিত "ব্রহ্ম-তত্ত্ব" পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী একটি সমালোচনা বাহির করেন। পরে তাহা "সাকার বাদের অদ্ভুত সমর্থন" নাম দিয়া এক পুস্তিকা আকারে বাহির করা হয়। এতভিন্ন "নব্য ভারত" ও অন্যান্য অনেক মাসিক পত্রিকা ও সংবাদ পত্রে সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, এবং সভা সমিতিতেও এ সম্বন্ধে অনেক বক্তৃতাদি হইয়াছিল। মোট কথা, এই পুস্তকের দ্বারা তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজে একটি ক্ষুদ্র আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা লেখকের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। যে সমস্ত সমালোচকগণ বিরুদ্ধ সমালোচনা দ্বারা আমার ভ্রম প্রদর্শনের চেষ্টা

করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা প্রশংসা বাক্যের দ্বারা আমাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এই আন্দোলনের ফলে যে সকল নূতন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল তাহার মীমাংসার জন্য আমার হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ ও পাশ্চাত্যদর্শনাদি অধিকতর মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন ছিল। আবার ইতি মধ্যে আমি অন্য কয়েকখানা পুস্তক প্রণয়নে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলাম, সুতরাং এই পুস্তকে আর হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পাইলাম না।

আবার এতদ্দেশে সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া যে প্রবল আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা এই পঁচিশ বৎসরে অনেক প্রশমিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রণী অনেক মহাত্মা দেহত্যাগ করিয়াছেন। যে মহাত্মাকে প্রধানতঃ উপলক্ষ করিয়া এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সেই শ্রদ্ধাস্পদ নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আর ইহলোকে নাই। যাঁহারা এখন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় আছেন তাঁহাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আক্রমণের ভাব আর বিশেষ লক্ষিত হয় না। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এখন দেশ হইতে প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রণ উচিত হইবে কিনা, এবিষয়েও আমার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে হিন্দুধর্ম্মের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা এই পুস্তকের প্রধান উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া এই দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম। যাহাতে কোন প্রকার সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পুনরুত্থিত না হয় সাধ্যানুসারে তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

স্বর্গীয় নগেন্দ্র বাবুর প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে আমার কোনকালেও বিদ্বেষ ভাব ছিলনা এবং এখনও নাই, যে কারণে তাঁহার পুস্তকাবলম্বনে নিরাকারবাদ খণ্ডন করিয়াছিলাম তাহা প্রথমবারের ভূমিকাতেই উল্লেখ করা হইয়াছিল। সুখের বিষয় নগেন্দ্র বাবুও আমার সমালোচনা সেই ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি নিজে আমার পুস্তকের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। ব্রাহ্মসমাজও সেই ভাবে উহা গ্রহণ করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তবুও নগেন্দ্র বাবুর নামের উল্লেখ করিলে পাছে বর্ত্তমান সময়ে কোন পাঠক আমাকে ভুল বুঝেন সেই জন্য নগেন্দ্র বাবুর নাম ও মতামত যতদূর সম্ভব পুস্তক হইতে বর্জ্জন করিয়াছি। তবে তাঁহার কোন কোন উক্তি অতি বিশদ ও প্রাঞ্জল বলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের মত হিসাবে রাখা হইয়াছে।



এই পুস্তকের যে সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছিল, তাহার যেগুলি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহা গ্রহণ করিয়াছি। আবার যে গুলি অযৌক্তিক বোধ হইয়াছে যথাস্থানে তাহার উত্তর প্রদান করিয়াছি এবং কয়েকটি সমালোচনার উত্তর পুস্তক মধ্যে না দিয়া পরিশিষ্টে দিয়াছি।

এইসকল কারণে, এবং আমার বিগত পঁচিশ বৎসরের অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় ইহার অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। আকারও পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বড় হইয়াছে। এখন এই গ্রন্থ সুধীসমাজে আদৃত হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

বগুড়া
১৩৩০ সাল। } শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

# সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার

## প্রথম অধ্যায়

### নিরাকার বাদের উৎপত্তি।

প্রাচীন কালের নির্গুণোপাসনা ও সগুণোপাসনা

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে দুই প্রণালীর ব্রহ্মোপাসনা-প্রচলিত আছে। প্রথম প্রণালী নির্গুণোপাসনা, দ্বিতীয় প্রণালী সগুণোপাসনা। নির্গুণোপাসনার অর্থ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যাদি অবলম্বন না করিয়া কেবল উপাসকের চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা আত্ম-স্বরূপে বা ব্রহ্ম-স্বরূপে লীন হওয়া। সগুণো-পাসনার অর্থ ব্রহ্মের নাম, রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য্যাদি অবলম্বন করিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তৎপ্রতি চিত্তবৃত্তি সমর্পণ দ্বারা, তাঁহার সহিত মিলিত হওয়া। প্রথম প্রকারের উপাসনা প্রণালী জ্ঞানযোগ বা অধ্যাত্মযোগ নামে খ্যাত; দ্বিতীয় প্রকারের উপাসনা ভক্তিযোগ নামে পরিচিত। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই, নির্গুণোপাসনা অতি কঠোর সাধনা সাপেক্ষ। সগুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে

চিত্তশুদ্ধি হইলে নির্গুণোপাসনার অধিকার জন্মে। এই নির্গুণোপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিয়া অতি পূর্ব্বকাল হইতে হিন্দুযোগিগণ সাধন করিয়া আসিতেছেন, আর সর্ব্বসাধারণ লোকে সগুণোপাসনা অবলম্বন করিয়া সাধন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিবার অধিকারী তাঁহারা সগুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি লাভ করিলে সদ্‌গুরুর উপদেশ অনুসারে জ্ঞান মার্গ অবলম্বন করেন। আবার কেহ কেহ আজীবন সগুণোপাসনা দ্বারা পরাভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। এইরূপে পূর্ব্বকাল হইতে দুই প্রকারের উপাসনা প্রণালী হিন্দুসমাজে অবিরোধে চলিয়া আসিতেছে। সগুণোপাসনা প্রণালীতে ঈশ্বরের মূর্ত্তি অবলম্বনে উপাসনা করা হয় বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে সগুণোপাসনা সাকার উপাসনা নামে অভিহিত হইয়াছে, ও নির্গুণোপাসনাতে সেরূপ করিতে হয় না বলিয়া তাহা নিরাকার উপাসনা নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত আধুনিক নিরাকার উপাসনার সহিত এই নির্গুণোপাসনার কোন সাদৃশ্য বা সম্বন্ধ নাই; এ বিষয় পরে বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

আধুনিক নিরাকারবাদ পাশ্চাত্য Theism বা একেশ্বরবাদের অনুকরণে এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। তাহা প্রবর্ত্তনের সময় হইতেই সাকার ও নিরাকার উপাসনা লইয়া এক তুমুল মত-বিরোধ ও প্রবল আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।



আধুনিক নিরাকার বাদের প্রবর্ত্তন

ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ে যখন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণ এদেশে আগমন করিলেন, তখন তাঁহারা হিন্দুর সগুণ ব্রহ্মোপাসনাকে বর্ব্বর জাতির পৌত্তলিকতা বা জড়পূজা বোধে ইহার যথাসাধ্য নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা একথা তলাইয়া বুঝিলেন না যে, যীশুখৃষ্টকে মধ্যে রাখিয়া ঈশ্বরের উপাসনা ও কোন দেবতাকে মধ্যে রাখিয়া হিন্দুর ব্রহ্মোপাসনা ইহার মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। যাহা হউক, ইয়ুরোপীয় জাতি সুসভ্য—জ্ঞান ও বিজ্ঞান বলে বলীয়ান, সুতরাং তাঁহাদের কথার গুরুত্ব খুব অধিক। এক সময় তাঁহাদের কথায় ভারতবাসীর মন টলিয়াছিল। তাহার ফলে অনেক কৃতবিদ্য ভারতসন্তান খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মৃত মহাত্মা কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় প্রধান ছিলেন। আর কয়েকজন খৃষ্টীয়ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের মন দেশের প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস হইতে বিচলিত ও স্খলিত হইয়া-ছিল। ইঁহাদের মধ্যে মহাত্মা রাজা রামমোহনরায় প্রধান ছিলেন। খৃষ্টীয়ান মিশনারীগণ ইঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খৃষ্টীয়ান করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহাদের আন্দোলনে ইঁহারা হিন্দুর দেবদেবীমূর্ত্তিকে বিদ্বেষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইঁহাদের মতে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই একমাত্র বিধেয়, সাকার দেবদেবীর পূজা ঈশ্বরোপাসনা নহে ইহাই স্থিরীকৃত হইল। "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" এই অদ্বৈতজ্ঞানসূচক মহাবাক্যের অর্থ করা

হইল, ঈশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই, সুতরাং হিন্দুর উপাস্য দেবতা-সকল ঈশ্বর নহেন। এই আন্দোলনের ফলে এদেশে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিন্তু পরবর্ত্তী ব্রাহ্মদের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য ছিল। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত রাজার জীবন-চরিত হইতে জানা যায়, তিনি প্রধানতঃ শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুসারে বেদান্ত মত আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিরাকার ব্রহ্মবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন; কিন্তু শঙ্করাচার্য্যের সকল মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি শাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন, "ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণাদি দেবতাকে ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন" (৯৩ পৃষ্ঠা)। তাঁহার মতে "পরমেশ্বর একমাত্র সর্ব্বত্রব্যাপী, আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন, তাঁহারই উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির কারণ হয়, আর নামরূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়।............যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিষয়ে শ্রবণ মননেতে অশক্ত হইবেক সেই ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মে প্রবর্ত্ত না হইয়া রূপ কল্পনা করিয়া ও উপাসনা দ্বারা চিত্ত স্থির করিবেক।"————ঈষোপনিষদের ভূমিকা।

রাজা রামমোহন রায়ের মত

"রামমোহন রায় বলেন যে হিন্দুশাস্ত্রে কেবল ঈশ্বরোদ্দেশে দেবপূজার বিধি আছে। যিনি যে দেবতার পূজা করিবেন—তিনি তাঁহাকে ঈশ্বর ও সর্ব্বময় ভাবিবেন।"—জীবন-চরিত ৯৮ পৃষ্ঠা।

"হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা সাকার উপাসনা করেন তাঁহারা কি নিজ



নিজ উপাস্য দেবতার চৈতন্য রহিত দেহের উপাসনা করেন? কদাপি নহে। তাঁহারা যে সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, সেই সকল মূর্ত্তিকে তাঁহারা কদাপি আরাধ্য বলিয়া মনে করেন না। যতক্ষণ না সেই সকল মূর্ত্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় অর্থাৎ যতক্ষণ না তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, উহাতে দেবতার আবির্ভাব হইয়াছে, ততক্ষণ তাঁহারা উহার পূজা করেন না। অতএব পাদ্রি সাহেবের কথা অনুসারে কাহাকেও সাকারোপাসক বলা যাইতে পারে না—কেন না—চৈতন্যরহিত মূর্ত্তির উপাসনা কেহই করেন না। বাস্তবিক কথা এই যে মানস মূর্ত্তি বা হস্ত নির্ম্মিত মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া উপাসনা করিলে সাকার উপাসনা করা হয়।"—পাদ্রি সাহেবের সহিত বিচার, জীবন চরিত ২২৬ পৃষ্ঠা।

রাজা রামমোহনের মতে জ্ঞানলাভের পূর্ব্বে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক। "বেদে যজ্ঞাদিতে চিত্তশুদ্ধির সাধনরূপে কহিয়াছেন।" "শাস্ত্রানুসারে আহার ও ব্যবহার নিষ্পন্ন করা উচিত, অতএব যে শাস্ত্রে প্রচলিত আছে, তাহার কোন এক শাস্ত্রকে অবলম্বন না করিয়া ইচ্ছামতে আহার ব্যবহার যে করে, তাহাকে স্বেচ্ছাচারী কহা যায়। আর স্বেচ্ছাচারী হওয়া শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ উভয়থা বিরুদ্ধ হয়। শাস্ত্রে স্বেচ্ছাচারের নিষেধে ভূরি প্রয়োগ আছে।"—অনুষ্ঠান।

উদ্ধৃতবাক্য সকল হইতে দেখা যায় রাজা রামমোহন রায় প্রধানতঃ বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রের উপর তাঁহার মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতৃগণ তাঁহার মত সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করেন নাই।

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মমতের প্রবর্ত্তক ছিলেন কিন্তু

বস্তুতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। তাঁহার আত্মজীবন চরিত পাঠে জানা যায়, তিনিও প্রথম প্রথম উপনিষদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা

"মনে করিয়াছিলাম যে বেদান্ত দর্শনকে ছাড়িয়া কেবল একাদশ উপনিষৎকে গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পোষকতা পাইব, সেজন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া কেবল সেই সমস্ত উপনিষদের উপরেই একান্ত নির্ভর করিয়াছিলাম। কিন্তু যখন উপনিষদে দেখিলাম "সোঽহমস্মি" তিনিই আমি "তত্ত্বমসি" তিনিই তুমি, তখন আবার সেই উপনিষদের উপরেও নিরাশ হইয়া পড়িলাম, এই উপনিষৎ তো আমাদের সকল অভাব দূর করিতে পারিবে না, তবে এখন আমাদের কি করিতে হইবে? আমাদের উপায় কি? ব্রাহ্মধর্ম্মকে এখন কোথায় আশ্রয় দিব? বেদে তাহার পত্তনভূমি হইল না,—উপনিষদেও তাহার পত্তনভূমি হইল না। কোথায় তাহার পত্তন দিব? দেখিলাম যে আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই তাহার পত্তনভূমি। পবিত্র হৃদয়ই ব্রহ্মের অধিষ্ঠান। পবিত্র হৃদয়ই ব্রাহ্মধর্ম্মের পত্তনভূমি, সেই হৃদয়ের সঙ্গে যেখানে উপনিষদের মিল, উপনিষদের সেই বাক্যই আমরা গ্রহণ করিতে পারি। আর হৃদয়ের সঙ্গে যাহার মিল নাই, সে বাক্য আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ যে উপনিষৎ তাহার সঙ্গে আমাদের এই সম্বন্ধ হইল।"—৯২—৯৩পৃষ্ঠা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এইরূপে "আত্ম প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়"কে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া উপনিষদের মন্ত্র সকল সঙ্কলন ও স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ—ব্রহ্মানন্দ কেশব-



চন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতিও সেই আত্মপ্রত্যয় (Intuition) কেই প্রধানতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই প্রমাণ বলেই তাঁহারা হিন্দুর সাকার উপাসনা প্রণালীকে পৌত্তলিকতা বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম ভূতপূর্ব্ব নেতা স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল এইরূপ লিখিয়াছেন :—

পরবর্ত্তী ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকগণ

"প্রথম যৌবনে ইংরাজী শিখিয়া পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে পড়িয়া বাঙ্গালীর এ সকল উৎসবাদিতে বহুদেবোপাসনা ও পৌত্তলিকতা ভাবিয়া কেহ বা বর্জ্জন করিয়া, আর প্রায় সকলেই হেয় জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিলাম, বিদেশীরা আমাদিগকে যে বুলি পড়াইতেন, তখন তাহাই অবিচারে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতাম। সে শিক্ষা আপাততঃ সত্য ছিল ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না। হিন্দু নানা দেবদেবীর ভজনা করেন, আর প্রত্যেক দেবীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্যরূপেও বরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং আপাততঃ দৃষ্টিতে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে যে বহু দেবোপাসনা বিহিত হইয়াছে, একথা উড়াইয়া দিতেও পারা যায় না। কিন্তু এসকল দেবতার প্রকৃত অর্থ কি, সেকালে আমরা জানিতাম না। "একংসদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এক ও অদ্বিতীয় এবং অবিভাজ্য ও অখণ্ড সত্য বস্তুকেই বিপ্রেরা বিবিধ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, এই শ্রুতিবাক্য তখনও আমরা শুনি নাই। বেদের নাম মাত্র জানিতাম; বেদে নৈসর্গিক শক্তির পূজা করিয়াছেন এ সকল কথা শুনিয়াছিলাম। আর এসকল শক্তি এক নহে বহু, ইহাও জানিতাম, সুতরাং বেদে বহু দেবতার উপাসনা বিহিত হইয়াছে, তখন আমাদের এরূপই বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছিল।

উপনিষদের কথা, কি প্রাচীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, কি নব্য শিক্ষিত ইংরাজী নবীশেরা কেহই প্রায় জানিতেন না। সুতরাং বৈদিক দেববাদের যে সমাহার ও সমন্বয় উপনিষদ করিয়াছেন, তাহার খোঁজ খবর তখনও পাই নাই। বৈদিক মীমাংসা শাস্ত্র আমাদের একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। অতি প্রাচীনকাল হইতে যুগে যুগে সাধক, তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্ধ মহাপুরুষেরা পূর্ব্বাপরের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করিয়া হিন্দুধর্ম্মের তত্ত্বাঙ্গের এবং সাধনাঙ্গের অভিব্যক্তি ধারাকে যে ভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, তাহার কথা সেকালে আমরা ইংরাজী নবীশের দল কিছুই জানিতাম না, সুতরাং ইংরাজ আমাদিগকে আমাদের স্বদেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা শিখাইত, তাহার আপাতঃ যুক্তি যুক্ততা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাহাকেই প্রামাণ্য সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই জন্যই প্রথম বয়সে স্বদেশের লৌকিক ধর্ম্ম-কর্ম্মকে কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম"। *

কিন্তু কালক্রমে অনেক ব্রাহ্মই বিপিন বাবুর ন্যায় তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহা দেশের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন :—

"আমাদের দেশে এই পূজা ও উৎসব একেবারে ফাঁকা ও অন্তঃসার-শূন্য ছিল না। বিদেশীয়েরা জানিয়া শুনিয়া যাহাকে idolatory বলিয়া অবজ্ঞা করিত তাহা বাস্তবিক idolatory নহে। ব্রাহ্মণাদি ভদ্র সন্তানের কথা আমি বিশেষ করিয়া বলিতেছি, কোথাও কোথাও যে bigotry ছিল না, তাহা নহে। বাস্তবিক উক্ত উপাসক সমাজের মধ্যেই ছিল, সংখ্যায় অবশ্য অতি অল্প। সেই সকল খাঁটি ভক্তদের কথা ছাড়িয়া

* "বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব"—সাহিত্য, আশ্বিন ১৩২৯, ৪৪৩ পৃষ্ঠা।



দিলেও একথা খুব ঠিক যে ব্রাহ্মণও ব্রাহ্মণেতর সকল শ্রেণীর মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞান কিছু না কিছু নিহিত ছিল, ছিল বলিয়াই তখনকার প্রতিমা পূজাকে কিছুতেই আমি Superstition বা idolatory বলিতে প্রস্তুত নহি। সমাজের এই ভাবটিকে যদি ধর্ম্মভাব বলা যায়, তাহা হইলে আমি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি যে আমাদের দেশের সমাজের সকল স্তরেই এই ধর্ম্মভাব কিছু না কিছু ছিল, এবং এখনও আছে।" *

এইরূপে আমরা দেখিলাম, পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কুহকে এক সময়ে হিন্দুর সাকারোপাসনা পৌত্তলিকতা বলিয়া নিন্দনীয় বোধ হইয়াছিল, সে কুহক এখন অনেক পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে। রাজা রামমোহন রায় প্রধানতঃ বেদান্তবাদী থাকিলেও সেই কুহকে ভুলিয়াই সাকার উপাসনার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন, তবে তিনি স্থল বিশেষে সাকার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী আচার্য্যগণ বেদ বেদান্তকে অনেক পরিমাণে বর্জ্জনপূর্ব্বক পাশ্চাত্য দর্শন মূলক আত্মপ্রত্যয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া হিন্দুর সাকার উপাসনা পুতুলপূজা এবং তাঁহাদের নিরাকার উপাসনাই একমাত্র মুক্তির পথ, এই মত খুব প্রবলরূপে প্রচার করেন। কালক্রমে অনেকেই তাঁহাদের নিজ নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের মত যে ভ্রমসঙ্কুল, সগুণ সাকার ঈশ্বরই যে সকলের উপাস্য, নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্ম আমাদের ধারণার অতীত সুতরাং উপাস্য নহেন, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিব।

* "পুরাতন প্রসঙ্গ"—ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৮।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## উপাস্য কে ?

### ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ।

শ্রুতি ব্রহ্মের দুইটি ভাব (aspect) বা রূপের বর্ণন করিয়াছেন। একটি নির্ব্বিশেষ ভাব অপরটি সবিশেষ ভাব। নির্ব্বিশেষ ভাবকে পরব্রহ্ম, নির্গুণব্রহ্ম, ব্রহ্ম, পরমাত্মা বলা হয়। সবিশেষ ভাবকে সগুণব্রহ্ম, পরমেশ্বর, মহেশ্বর, ঈশ্বর, ঈশান, ভগবান বলা হয়। নির্গুণব্রহ্ম বিষয়ক শ্রুতি বাক্য এই :—

ব্রহ্মের দুইটি ভাব-সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ

নির্গুণব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি

"অশব্দমস্পর্শম রূপমব্যয়ং
তথাঽরসন্নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তন্মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যু মুখাৎ প্রমুচ্যতে॥—কঠোপনিষৎ।

যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, নিত্য অরস, গন্ধহীন এবং অনাদি অনন্ত, মহত্তত্ব হইতে পৃথক্ ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া (সাধক) মৃত্যু-মুখ হইতে বিমুক্ত হন।

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥"—কঠোপনিষৎ।

ইঁহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না, কেহ তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে



পায় না। হৃদয় সংশয়-রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা ইঁহাকে জানেন তাঁহারা অমর হয়েন।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"—কঠোপনিষৎ।

তাঁহাকে বাক্য মন বা চক্ষু দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যাঁহারা "তিনি আছেন" এইরূপ বলেন তাঁহারা ব্যতীত অন্যেরা কিরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিবে ?

"নতত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্ গচ্ছতি নো মনো
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাৎ"—কেন

তিনি (ব্রহ্ম) চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন, মনেরও গম্য নহেন, আমরা তাঁহাকে জানি না, কিরূপে তাঁহার উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্। ন বিভেতি কদাচনেতি॥"—তৈত্তিরীয়

মনের সহিত বাক্য (যাঁহাকে) না পাইয়া—যাহা হইতে ফিরিয়া আইসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন তিনি কদাচ ভয়প্রাপ্ত হয়েন না ইতি।

"অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম
প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতম্"—মাণ্ডুক্য।

যিনি দর্শনের অবিষয়, যিনি ব্যবহারের অতীত, কোন লক্ষণ দ্বারা যাঁহার লক্ষ্য করা যায় না, যিনি চিন্তার অতীত, যিনি অনির্ব্বচনীয়, যিনি জাগ্রদাদি অবস্থায় একই আত্মারূপে প্রত্যয়গম্য, রূপ রসাদি প্রপঞ্চের অতীত, অনন্ত, শিব ও অদ্বৈত।

"স হোবাচৈতদ্ বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি
অস্থূলমনন্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমাচ্ছয়মতমোঽ
বায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগ—
মনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহ্যং
ন তদশ্নাতি কিঞ্চন ন তদশ্নাতি কশ্চন"—বৃহদারণ্যক

যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে বলিলেন—হে গার্গি! ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা সেই আত্মা (ব্রহ্ম) কে এইরূপ বলিয়াছেন,—তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিতবর্ণ নহেন—(অর্থাৎ তাঁহার কোন বর্ণ নাই), স্নেহযুক্ত (তৈলাদিবৎ) নহেন, ছায়াযুক্ত নহেন, তমোময় নহেন,—তাহাতে বায়ু নাই, আকাশ নাই, গন্ধ নাই, রস নাই, চক্ষু নাই, শ্রোত্র নাই, বাক্ নাই, মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, তাহার মাত্রা বা পরিমাণ নাই, তাঁহার ভিতর বাহির নাই, তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না কেহ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না।

"অথাত আদেশো নেতি, নেতি, ন হ্যেতস্মাদন্যৎপরমস্তি"—বৃহদারণ্যক

সেই আত্মার সম্বন্ধে আদেশ এই—তিনি ইহা নহেন—তিনি ইহা নহেন, তাঁহার পর আর কেহ নাই।

পরব্রহ্ম সম্বন্ধে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা হইল, ইহাতে তাঁহাকে একটিমাত্র লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা হইতেছে। তিনি ইহা নহেন—তিনি ইহা নহেন এই সকল negative-attributes (অভাবাত্মক বিশেষণ) ভিন্ন তাঁহার স্বরূপ কেহ জানিতে বা বলিতে পারে না। শ্রুতি এই কথাই বারম্বার বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাধ্ব ঋষি বাস্কলি কর্ত্তৃক "ব্রহ্ম কিরূপ" জিজ্ঞাসিত হইয়া মৌন অবলম্বন করিয়া তাহার উত্তর দিয়াছিলেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম আমাদের বাক্য মনের অগোচর। ইহাই ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাব।



এতদ্ভিন্ন তাঁহার আর একটি সবিশেষ ভাব আছে। সবিশেষ ভাবের অর্থ সৃষ্ট জগতের সহিত তাঁহার মিলিতভাব, কারণ—

"তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ"—শ্রুতি অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছেন।

মানুষ সেই জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট ভাবে ভিন্ন তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না। এ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে যত প্রকার জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে তাহা এই তিনটি ভাবে সীমাবদ্ধ—তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা ও তিনি জগতের সংহার কর্ত্তা। শ্রুতি সেই জন্য ব্রহ্মের সবিশেষ ভাব বুঝাইবার জন্য তাঁহার জগতের সহিত সম্বন্ধ দ্বারাই বুঝাইয়াছেন।

সগুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি

"অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ"—কঠোপনিষৎ

যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া (দাহ্য বস্তুর রূপ ভেদে) তৎ তৎ রূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনি এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানা বস্তু ভেদে তৎ তৎ বস্তুর রূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং (সমুদায় পদার্থের) বাহিরেও আছেন।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।

তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥"—কঠোপনিষৎ

সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্র—তারকা কিরণ দেয় না (অর্থাৎ চন্দ্র সূর্য্য তারকা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না), এই বিদ্যুৎসমূহও সেখানে প্রকাশ পায় না, সেখানে অগ্নিই বা কোথায়? চন্দ্রসূর্য্যাদি সেই দীপ্যমানের প্রকাশেই অনুপ্রকাশিত হয়। তাঁহারই দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তি পাইতেছে।

"য সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যৈষ মহিমা ভুবি
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হ্যেষ ব্যোম্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণ-শরীর-নেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ
আনন্দরূপম মৃতং যদ্বিভাতি ॥"—মুণ্ডক

যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাঁহার এই মহিমা প্রকাশিত রহিয়াছে, সেই আত্মা দীপ্ত ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ হৃদয়ে এবং হৃদয়াভ্যন্তরস্থিত দহরাকাশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি মনোময়, প্রাণ ও শরীরের নেতা, তিনি অন্ন মধ্যে বুদ্ধিকে স্থাপন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—তিনি আনন্দ ও অমৃত রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। জ্ঞানিগণ বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করেন।

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদংবরিষ্ঠম্ ॥" মুণ্ডক

সেই অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মই অগ্রে, ব্রহ্ম পশ্চাতে, ব্রহ্ম দক্ষিণে এবং ব্রহ্ম উত্তরে। তিনি অধ এবং উর্দ্ধে বিস্তৃত হইয়া আছেন। এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন।



"একোহি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু
র্য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যঙ্ জনাং স্তিষ্ঠতে সঙ্কোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বাভুবনানি গোপাঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতর

সেই একমাত্র রুদ্র, যাঁহার দ্বিতীয় নাই, তিনি এই লোকসকল নিজ শক্তি দ্বারা নিয়মিত করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজনের পশ্চাতে বর্ত্তমান আছেন। তিনি সমুদয় বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া পালন করেন এবং অন্তকালে সংহার করেন।

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ
সংবাহুভ্যাং ধমতি সম্পতত্রৈ
র্দ্যাবা ভূমী জনয়ন্ দেব একঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতর।

সর্ব্বত্র যাঁহার চক্ষু, সর্ব্বত্র যাঁহার মুখ, সর্ব্বত্র যাঁহার বাহু এবং সর্ব্বত্র যাঁহার পাদ, সেই একমাত্র দেবতা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া মনুষ্যাদিতে বাহু এবং (পক্ষ্যাদিতে) পক্ষ সংযোগ করেন।"

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্"—শ্বেতাশ্বতর

সেই সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, ও সহস্রপাদ পুরুষ পৃথিবীকে সমুদয় দিকে বেষ্টন করিয়া (নাভির) দশাঙ্গুল পরিমাণ উপরে (হৃদয়ে) অবস্থান করিতেছেন।

"যো দেবানাং প্রভব শ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥"—শ্বেতাশ্বতর।

তিনি দেবতাদিগের জন্ম ও শক্তির হেতু, যিনি বিশ্বাধিপ সর্ব্বজ্ঞ রুদ্র, যিনি হিরণ্যগর্ভরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন।

"যো দেবোঽগ্নৌ যোঽপ্সু যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ।
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু তস্মৈ দেবায় নমো নমঃ॥"—শ্বেতাশ্বতর

যে দেবতা অগ্নিতে ও জলে আছেন যিনি সমস্ত বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি ওষধি ও বৃক্ষে আছেন, সেই দেবতাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার।

এই সকল শ্রুতি ব্রহ্মের সগুণ ভাবদ্যোতক, অর্থাৎ তিনি বিশ্বস্রষ্ঠা, বিশ্বাধিপতি, বিশ্বরূপ। মহর্ষি বাদরায়ণ তাঁহার ব্রহ্ম-সূত্রে "অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" এই সূত্রে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিয়া, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় তিনিই ব্রহ্ম, এইরূপে সগুণ ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্ম সূত্র ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

এ বিষয়ে মহর্ষি বাদরায়ণের ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মত

"দ্বিরূপং হি ব্রহ্ম অবগম্যতে, নাম রূপ-ভেদোপাধি-
বিশিষ্টং তদ্বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিতম্।"

অর্থাৎ ব্রহ্মের দুইটি রূপ জানা যায়, একটি নামরূপভেদযুক্ত উপাধি বিশিষ্ট, অন্যটি তাহার বিপরীত সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিত।

"অস্তি উভয়লিঙ্গা শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিষয়াঃ। সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরস ইত্যেবমাদ্যাঃ সবিশেষলিঙ্গাঃ॥ অস্থূলমনণু—অহ্রস্বমদীর্ঘমিত্যেবমাদ্যাশ্চ নির্ব্বিশেষলিঙ্গাঃ।"

ব্রহ্মবিষয়িণী শ্রুতি সকল ব্রহ্মের সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ এই উভয়-



ভাবদ্যোতক। ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস ইত্যাদি শ্রুতিসকল ব্রহ্মের সবিশেষ ভাবদ্যোতক। আর ব্রহ্ম স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন ইত্যাদি শ্রুতিসকল তাঁহার নির্ব্বিশেষ ভাবপ্রকাশ করেন।

এখন কথা হইতেছে, ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবই সত্য না সবিশেষ ভাব সত্য? এবিষয়ে সাম্প্রদায়িক মতভেদ আছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য "ন স্থানতোঽপিপরস্যো ভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" এই ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষ ভাবই সত্য এই মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। অন্য পক্ষে রামানুজাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্য-কারগণ সগুণ ব্রহ্মই শ্রুতিস্মৃতির প্রতিপাদ্য এই মত প্রচার করিয়াছেন। তবে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, মূলে যে একই বস্তু, এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাইবে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

"বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জ্ঞান মদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

তত্ত্ববিদগণ সেই জ্ঞানস্বরূপ অদ্বৈততত্ত্ব এইরূপ বলেন—তিনি ব্রহ্ম, তিনি পরমাত্মা এবং তিনি ভগবান্। অর্থাৎ তিনি মূলতঃ একই বস্তু—জ্ঞানীর নিকট ব্রহ্ম, যোগীর নিকট পরমাত্মা এবং ভক্তের নিকট ভগবানরূপে পরিচিত বা কথিত হন।

ব্রহ্মের চারিরূপে অভিব্যক্তি।

ব্রহ্মের এই নির্গুণ ও সগুণভাব বেদান্তশাস্ত্রে আরও বিস্তারিত-

রূপে বর্ণিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মা বা ব্রহ্মের চারিটি পাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথম পাদে তিনি আমাদের জাগ্রদবস্থার অধিষ্ঠাতা, তখন তাঁহার নাম "বৈশ্বানর"। দ্বিতীয় পাদে তিনি আমাদের স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা, তাঁহার নাম "তৈজস।" তৃতীয় পাদে তিনি আমাদের সুষুপ্তি অবস্থার অধিষ্ঠাতা, তাঁহার নাম "প্রাজ্ঞ"। চতুর্থ পাদে তিনি "প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবং অদ্বৈতম্." অথবা "তুরীয়" ব্রহ্ম। এই তুরীয় ব্রহ্মই নির্গুণব্রহ্ম, আর তিন পাদে সগুণব্রহ্ম অভিব্যক্ত হইয়াছেন।

শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মের চাটরি পাদ বা অভিব্যক্তি ধারা

ব্রহ্মের এই চতুর্ব্বিধ অভিব্যক্তি যেমন জীবদেহে তেমন বিশ্বে। কথায় বলে যাহা আছে ঘটে, তাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে। তাঁহার ব্যষ্টিতে যে অভিব্যক্তি, তাহা সমষ্টিগত অভিব্যক্তির অন্তর্গত। Individual self is part and parcel of the universal self. চতুর্থ পাদের তুরীয় ব্রহ্ম বা পরমাত্মা যখন মায়ারদ্বারা তৃতীয় পাদে অভিব্যক্ত হয়েন তখন তিনি সমষ্টিভাবে সগুণব্রহ্ম, মায়াধীশ, ঈশ্বর—ব্যষ্টিভাবে "প্রাজ্ঞ"। দ্বিতীয় পাদে, সমষ্টিভাবে যিনি "সূত্রাত্মা" বা "হিরণ্যগর্ভ" ব্যষ্টিরূপে, তিনি "তৈজস"। প্রথম পাদে সমষ্টিভাবে যিনি "বিরাট", ব্যষ্টিষ্টভাবে তিনি "বৈশ্বানর"।*

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ব্রহ্মের এই প্রকারের অভিব্যক্তি অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এবচ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥



আমরা এইরূপে দেখিলাম আমাদের জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার সমসূত্র ( parallel ) ভাবে আমরা ব্রহ্মের তিনটি অবস্থার ধারণা করিতে পারি। আমরা জাগ্রদবস্থায় দেখি, তাঁহার বিশ্বাশ্রিত স্থূল বিরাটরূপ। আমাদের স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার সূক্ষ্মদেহাশ্রিত কূটস্থ

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে য প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

ক্ষর ও অক্ষর নামে দুইটি পুরুষ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার মধ্যে ক্ষর পুরুষ ভূতসমষ্টি, আর অক্ষর পুরুষ কূটস্থ ব্রহ্ম। এই ক্ষর ও অক্ষর পুরুষ হইতে অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন, তিনি ত্রিভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা পালন করিতেছেন, যেহেতু আমি সেই ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে আমি ( ভগবান্ ) লোকে ও বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছি।

( ১ ) শ্রুতির সঙ্গে মিলাইলে আমরা বুঝিতে পারি, এই "পুরুষোত্তম" হইতেছেন—সগুণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর বা মহেশ্বর। তিনি মায়োপহিত চৈতন্য, মায়ার অধীশ্বর। শ্রুতি বলেন –

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥"

—শ্বেতাশ্বতর—

মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। তাঁহার অঙ্গসমূহ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

"ক্ষরং প্রধান মমৃতাক্ষরং হরঃ
ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ॥"—শ্বেতাশ্বতর—

ক্ষর হইতেছেন প্রকৃতি, আর অক্ষর অমৃতস্বরূপ হর বা কূটস্থ ব্রহ্ম, সেই ক্ষর ও অক্ষর রূপী আত্মাকে আর একদেবতা নিয়মিত করেন, তিনি ঈশ্বর।

আমাদের ধারণা হইতে পারে।
চৈতন্য বা অক্ষররূপ আমাদের ধারণা হইতে পারে।
আমাদের সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় তাঁহার কারণ-
দেহধারী অর্থাৎ মায়োপহিত চৈতন্যরূপ বা ঈশ্বর রূপের ধারণা
হয়। ইহার পরে তাঁহার যে নির্গুণ তুরীয়াবস্থা বা শুদ্ধ

---

"ক্ষরন্তু বিদ্যা হ্যমৃতং তু বিদ্যা—
বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যস্তু সোঽন্যঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতর—

ক্ষর হইতেছেন অবিদ্যা, আর অমৃত (অক্ষর) হইতেছেন—বিদ্যা। যিনি এই ক্ষর ও অক্ষর, বিদ্যাও অবিদ্যাকে নিয়মিত করেন, তিনি অন্য অর্থাৎ পরমেশ্বর।

ইনিই সুষুপ্তিস্থানাধিষ্ঠাতা, কারণদেহী, সচ্চিদানন্দস্বরূপ—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্।" মাণ্ডূক্য।

ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি সমুদায়ের উৎপত্তিস্থান এবং ভূত সমূহের উদ্ভব ও প্রলয়ের স্থান, ইনি সুষুপ্তিস্থানবাসী, কারণদেহী বলিয়া জীবাত্মা যখন গাঢ় নিদ্রায় নিমগ্ন হয় অথবা যোগবলে সুষুপ্তিস্থানে নীত হয়, তখন ইঁহার সাক্ষাৎ লাভ করে।

(২) গীতার অক্ষর পুরুষ মনোবুদ্ধির অতীত অভিমানরূপী ব্যাপক আত্মা; ইনি কারণরূপী কূটস্থ ব্রহ্ম ও কার্য্যরূপী হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা; ইনিই ব্যষ্টিভাবে স্বপ্নস্থানাধিষ্ঠিত "তৈজস" বা সূক্ষ্মদেহধারী জীবাত্মা (Individual Self).

"স্বপ্নস্থানোঽন্তঃ-প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ
প্রবিবিক্তভুক্ তৈজসো দ্বিতীয়-পাদঃ।"

—মাণ্ডূক্য—

স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা অন্তঃপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষ মনোমাত্রগ্রাহ্য বিষয়ের জ্ঞাতা) সপ্তাঙ্গ (অর্থাৎ স্বর্গ মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, অন্নজল উদর, আকাশ মধ্যদেশ, পৃথিবী পাদদ্বয় যাঁহার) একোনবিংশতি মুখ, (পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাপানাদি পঞ্চবায়ু, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই ঊনবিংশতি মুখ যাঁহার) সূক্ষ্ম বিষয়ের ভোক্তা "তৈজস" দ্বিতীয় পাদ, এই অক্ষরপুরুষ সূক্ষ্মদেহী ও স্বপ্নাবস্থায় বোধগম্য, জীবাত্মা সূক্ষ্মদেহে স্বপ্নাবস্থায় ইঁহার দর্শনলাভ করিতে পারে।



চৈতন্যাবস্থা আছে তাহা আমাদের ধারণার অতীত। সেই অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ভাব তিরোহিত হয়, Subject and Object ভাব থাকে না, তখন তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ং", তখন তিনি

"নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্
অমৃতস্য পারং সেতু দগ্ধেন্ধনমিবানলম্ ॥"

নিষ্কলং (অংশরহিত) ক্রিয়ারহিত, শান্ত অর্থাৎ পূর্ণ, অনির্ব্বচনীয় নিরঞ্জন, তিনি অমৃতের পরবর্ত্তী সেতুস্বরূপ, অগ্নি কাষ্ঠ দগ্ধ করিবার পরে যেরূপ একাকী অবস্থান করে, তিনিও তখন সেইরূপ দ্বৈত রহিত।

ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা কেন হইল?

ব্রহ্মের এই চারিটি অবস্থা হওয়ার কারণ কি? ইহার কারণ তাঁহার সৃষ্টিলীলা, তিনি আদিতে এক অদ্বিতীয় রূপে বিরাজমান ছিলেন।

"আত্মা বা ইদম্ এক অগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ।
স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি।
স ইঁমাল্লোকানসৃজত।"—ঐতরেয়।

---

(৩) ক্ষরপুরুষ স্থূলসূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন, সোপাধি, ব্যাপকআত্মা, কারণরূপী কূটস্থো চৈতন্য এবং কার্য্যরূপী হিরণ্যগর্ভের (=অক্ষর পুরুষের) সবিশেষ (differentiated) মূর্ত্তি। সমষ্টিভাবে ইনি সর্ব্বভূতাধিষ্ঠিত বিরাট পুরুষ, ব্যষ্টিভাবে স্থূলসূক্ষ্মদেহধারী জীব (Individual Self)।

"জাগরিত-স্থানো বহিঃ-প্রজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি-
মুখঃ স্থূলভুগ্ বৈশ্বানরঃ প্রথম-পাদঃ"—মাণ্ডূক্য,

ইনি জাগ্রদবস্থায় অধিষ্ঠাতা বহিঃপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ বহির্বিষয়ের জ্ঞাতা) সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতিমুখ, স্থূলভুক্ (অর্থাৎ শব্দাদি স্থূল বিষয় ভোগী) বৈশ্বানর (অর্থাৎ বিশ্বরূপপুরুষ) প্রথম পাদ।

পূর্ব্বে এক আত্মামাত্র ছিলেন। নিমেষক্রিয়াযুক্ত অপর কিছুই ছিল না, তিনি ভাবিলেন—"আমি কি লোকসকল সৃষ্টি করিব ?" তাঁহার ভাবনামাত্রেই এই সকল লোক সৃষ্ট হইল।

"স ঐক্ষত একোহহং বহুঃ স্যাম প্রজায়েয়"—ঋগ্‌বেদ। তাঁহার ইচ্ছা হইল আমি এক বহু হইব, এইরূপে তিনি সিসৃক্ষু হইয়া মায়োপহিত চৈতন্যরূপ ধারণপূর্ব্বক মহেশ্বর বা ঈশ্বর হইলেন; পরে তিনি মহত্তত্ত্ব উপাধিযুক্ত হইয়া ঈক্ষা বা অধ্যাবসায় করিলেন, ("সঐক্ষত") পরে তিনি অহঙ্কারযুক্ত হইয়া "বহুস্যাম" এই অভিমান স্বীকার করিলেন—পরে যথাক্রমে আকাশ প্রভৃতি সূক্ষ্মভূতের উৎপত্তি হইল।* ইহাই সংক্ষেপে তাঁহার সৃষ্টিলীলা।

ব্রহ্মের অনুলোম গতি ও জীবের প্রতিলোম গতি

ব্রহ্মের বিশ্বসৃষ্টি ও বিরাটরূপে অভিব্যক্তি এইরূপে প্রদর্শিত হইল। ইহা তাঁহার অনুলোম গতি, কিন্তু জীবের তাঁহাকে পাইতে হইলে, জীবকে প্রতিলোম গতিতে অর্থাৎ বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে হইবে। জীবের পক্ষে প্রথম জাগ্রদবস্থা, পরে স্বপ্নাবস্থা, পরে সুষুপ্তির অবস্থা। ইহা জীবের দৈনন্দিন স্বাভাবিক অবস্থা। এই স্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের যে কিছু জ্ঞান তাহা জাগ্রদবস্থায়ই হইয়া থাকে; স্বপ্নাবস্থায়ও জ্ঞান হয়, কিন্তু

ইনিই অবতাররূপী, দ্বিভুজ চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তিধারী ঈশ্বর (Personal God)। জাগ্রদবস্থায় স্থিত মনুষ্যের ইনিই উপাস্য।

* এই ব্যাখ্যাটি শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের "উপনিষৎ" গ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। এই অধ্যায় লিখিতে তাঁহার গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।



তাহা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে, অথবা সেই জ্ঞানের সাহায্যে আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতে পারি না। গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় যে জ্ঞান হয় তাহাদ্বারাও ঈশ্বরোপাসনা সম্ভবপর নয়, সেই অবস্থায় স্মৃতিমাত্র আমরা জাগ্রদবস্থায় উপলব্ধি করিতে পারি। সুতরাং আমাদের জাগ্রদবস্থায়ই ঈশ্বরোপাসনা করিতে হয়। তবে যদি কেহ নিজের ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা সজাগ থাকিয়া জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নাবস্থায় যাইতে পারেন, অথবা স্বপ্নাবস্থা হইতে সুষুপ্তি অবস্থায় যাইতে পারেন, একমাত্র তিনিই ঈশ্বরের সেই সেই অবস্থার সাক্ষী সূক্ষ্মরূপের দর্শনলাভ করেন। যে ক্রিয়াদ্বারা তাহা সম্ভবপর হয় তাহাকে অধ্যাত্মযোগ জ্ঞানযোগ বা যোগ বলে, সেই যোগপ্রণালী ইহার পরে ব্যাখ্যাত হইবে।

এই যে আমাদের প্রতিলোম গতিতে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার লাভ তাহা একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। পৃথিবীতে এরূপ দেশ আছে, যেখানে একসঙ্গে অনেকদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যের মুখ দেখা যায় না, সূর্য্য দিনরাত্রি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। সেই দেশের লোকের নিকট সূর্য্য কিরূপ? না একটি মেঘাচ্ছন্ন স্বল্পালোক গোলাকার পদার্থ, তাহা প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকে অস্ত যায়, সুতরাং তাহা সচল। যদি এরূপ কল্পনা করা যায় যে, সেই ব্যক্তি সূর্য্য দেখিবার জন্য নভোযানের (aeroplane) সাহায্যে মেঘের উপরে উঠিল, তখন সে কি দেখিবে? তখন সে

দেখিবে সূর্য্য মেঘমুক্ত জ্যোতির্ম্ময় গোলাকার পদার্থ,—তাহা তখনও পৃথিবীর পূর্ব্বদিক হইতে উদিত হইয়া পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। সেই ব্যক্তি যদি এইরূপ উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে সূর্য্যলোকে গিয়া উপস্থিত হয় তখন সে কি দেখিবে? তখন সে দেখিবে সূর্য্য আকারবিহীন জ্যোতিঃস্বরূপ পদার্থ, নিশ্চল, নিথর, নিরবলম্ব—সেখানে দিনরাত্রি বলিয়া কিছু নাই, পৃথিবী তাহার চতুর্দ্দিক ঘুরিতেছে।

আমাদের জাগ্রদবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান, আমাদের মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের জ্ঞানের ন্যায়। আমরা তখন ব্রহ্মে রূপ, গুণ, আকার, গতি দর্শন করি,—তখন তাঁহার স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অতীত। তখন আমরা জগতের ( phenomenal world ) সহিত মিলিত ভাবে তাঁহাকে দেখি বলিয়া, সেই অনন্ত, অসীমকে আমরা সান্ত সসীম ভাবে দেখি। আমাদের স্বপ্নাবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান পৃথিবীর উর্দ্ধে মেঘমুক্ত সূর্য্যের জ্ঞানের সহিত তুলনীয়। তখন অজ্ঞানের ঘোর অনেকটা কাটিয়াছে, কিন্তু সম্পূর্ণ কাটে নাই। তখন সূর্য্যের পূর্ব্ব-পশ্চিমে গতি দর্শনের ন্যায়, ব্রহ্মকেও আমরা সক্রিয় সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা রূপে দেখি। ইহার পরে সূর্য্যলোকে গমন করিলে, সূর্য্যের যে জ্ঞান হয়, তাহার সঙ্গে সুষুপ্তি অবস্থার কারণদেহাশ্রিত সিসৃক্ষু ব্রহ্মের তুলনা হইতে পারে; তন্ত্রে তাঁহাকে "পরম শিব" বলা হইয়াছে। তখন তিনি সম্পূর্ণরূপে মায়িক জগতের ( phenomenal world এর ) অতীতরূপে অভিব্যক্ত, তখন তাঁহার



কিছুমাত্র গতি বা ক্রিয়া নাই, তবে তখন তাঁহার সৃষ্টির ইচ্ছামাত্র উদ্রিক্ত হইয়াছে, সুষুপ্তির অবস্থায় আত্মা জাগ্রত হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। কিন্তু মানুষ যেরূপ সূর্য্যলোকে পেঁৗছিয়া বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না, সূর্য্যের উত্তাপে গলিয়া যায়, সেইরূপ জীবও সেই জ্যোতিঃস্বরূপ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। স্বর্গীয় রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব আর একটি উপমা দ্বারা এই তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। একটি নুনের পুতুল সমুদ্র মাপিতে গিয়াছিল, সে সমুদ্রের মধ্যে ডুবিয়া গলিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিতে পারিল না। কিন্তু জীবের ব্রহ্মে লীন হওয়া অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত, ইহা সকল সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। তবে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভে যে মুক্তি ইহা সকলেই স্বীকার করেন। সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের জন্য উপাসনা একান্ত প্রয়োজন ইহাও সর্ব্ববাদিসম্মত।

## আমাদের উপাস্য সগুণ ব্রহ্ম।

এইরূপে আমরা ব্রহ্মের প্রথমতঃ নির্গুণ ভাব ও পরে সগুণ ভাবে অভিব্যক্তি দেখিলাম। আমাদের উপাস্য কে? আমাদের নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই আমাদের উপাস্য।

আমাদের উপাস্য নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সগুণ ব্রহ্ম

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, আমাদের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহেন। কোন বস্তুকে আমরা জানি কিরূপে? হয় চক্ষু, কর্ণ,

নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা কিম্বা মন বা বুদ্ধির দ্বারা। যাহা যে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর তাহাকে তদ্দ্বারা জানা যায়। চক্ষু দ্বারা রূপ জানা যায়, কর্ণ দ্বারা শব্দ জানা যায়, নাসিকা দ্বারা গন্ধ জানা যায়, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করা যায়, ত্বকের দ্বারা স্পর্শ করা যায়—কিন্তু যাহার রূপ নাই, রস নাই, গন্ধ নাই, স্পর্শ নাই, শব্দ নাই—( "যিনি অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্" ) তাঁহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা জানিব কিরূপে ?

"মনকে অন্তঃকরণ বলে, ইহা ষষ্ঠেন্দ্রিয়, চক্ষু দ্বারা যেমন বাহ্যিক বিষয়ের জ্ঞানলাভ হয়, মনের দ্বারা সেইরূপ আন্তরিক বিষয়ের ( সুখদুঃখ প্রভৃতির ) উপলব্ধি হয়। পরব্রহ্ম সুখদুঃখ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির অতীত; সেইজন্য মনের দ্বারা তাঁহার কখনও উপলব্ধি হইতে পারে না—"

"মনের উপর বুদ্ধি, নিশ্চয় জ্ঞান বা বোধ বুদ্ধির ধর্ম্ম, বুদ্ধির স্বভাব এই যে, যে বস্তুর ছায়া বুদ্ধিতে পতিত হয়, বুদ্ধি তদাকারে আকারিত হয়। বুদ্ধি সান্ত সগুণ পদার্থ, সে অনন্ত, নির্গুণ পরব্রহ্মের আকারে কিরূপে আকারিত হইবে ? তা'ছাড়া যাহা সাপেক্ষ ( relative ), সম্বন্ধযুক্ত, সোপাধিক তাহাই জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে ( Spencer's *First principles* p. p. 73—74 )—পরব্রহ্ম নিরুপাধিক, নিরপেক্ষ (absolute) বস্তু, দেশকালনিমিত্ত-সম্বন্ধবিবর্জ্জিত ; তিনি কিরূপে জ্ঞানের বিষয় হইবেন ?" "জানা অর্থে জ্ঞানের বিষয় হওয়া, তিনি বিষয় ( object ) এবং বিষয়ী ( subject ) উভয়েরই উপরে, তিনি কিরূপে মন, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের বিষয় ( object ) হইবেন ? এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—

"বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—বৃহদারণ্যক।



বিজ্ঞাতা কিরূপে বিজ্ঞাত ( object ) হইবেন, তাঁহার সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে——"অস্তি"—তিনি আছেন। তাহার অতিরিক্ত কিছু বলাও যায় না, জানাও যায় না।

"অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে।"—কঠোপনিষৎ।

জ্ঞানের উপর প্রজ্ঞান, বোধের উপর প্রতিবোধ, ইহাকে সমাধি বা যোগজ মতি বলা যায়। সে অবস্থায় ব্রহ্মকে জানা যায় কি না ? অধ্যাত্মযোগ বা সমাধি দ্বারা তাঁহাকে জানা যায়, তিনিও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন, তিনি সবিশেষ ব্রহ্ম।

এই সমাধি দ্বিবিধ ; সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে ; কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অনন্ত ভেদবুদ্ধি, সমস্ত দ্বৈতদর্শন তিরোহিত হয়, তখন দ্রষ্টা ও দৃশ্য, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, বিষয়ী ও বিষয় একাকার হইয়া বিলুপ্ত হইয়া যায়।" *

এই নির্গুণ ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন—

এ সম্বন্ধে শ্রুতির মত

"যস্যামতং তস্যমতং মতংযস্য নবেদসঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম।"

—কেন—

যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারি নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন এবং যিনি মনে করেন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি তিনি ব্রহ্মকে জানেন না। তিনি বিজ্ঞানবানদিগের অবিজ্ঞাত এবং যাঁহারা বিজ্ঞানবান নহেন তাঁহাদের নিকট বিজ্ঞাত, ( অর্থাৎ যাঁহাদের মন ও বুদ্ধি লয় হওয়াতে, মনন ও বিজ্ঞান ক্রিয়া হয় না, তাঁহাদের নিকটই তিনি যথার্থরূপে

---

* শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত বেদান্তরত্ন কৃত—"উপনিষৎ"—

বিজ্ঞাত। যাঁহাদের মনন ও বিজ্ঞান ক্রিয়া হয়, তাঁহারা ব্রহ্মকে জানিতে পারেন না।)

এই প্রসঙ্গেই শ্রুতি বলিয়াছেন—

"যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্মনোমতম্।
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

ইত্যাদি—কঠোপনিষৎ।

যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হয়েন না, যাঁহা হইতে বাগিন্দ্রিয় নিজ শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান; যাঁহাকে উপাসনা করা হয় তিনি ব্রহ্ম নহেন। যাঁহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না, যাঁহা হইতে মন তাহার মনন শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জান; যাঁহাকে উপাসনা করা হয় তিনি ব্রহ্ম নহেন।

"নেদং যদিদমুপাসতে" এই শ্রুতি বাক্যের ব্যাখ্যা

এই শ্রুতি হইতে পাওয়া যায়, ব্রহ্ম যেমন বাক্য, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অতীত, সেইরূপ তিনি উপাসনারও বিষয় হইতে পারেন না। কারণ যাঁহাকে জানিতে পারি না, বুঝিতে পারি না, ধ্যান করিতে পারি না, তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিব?

"নেদং যদিদমুপাসতে," এই মন্ত্রাংশের ব্যাখ্যা লইয়া আমাকে অনেক প্রতিবাদ সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি ইহার অর্থ করিয়াছিলাম, ব্রহ্ম উপাস্য নহেন। অর্থাৎ যাঁহাকে উপাসনা করা যায় তিনি ব্রহ্ম নহেন বলা যে কথা, ব্রহ্ম উপাস্য নহেন



বলাও সেই একই কথা। সাধারণতঃ নিরাকারবাদিগণ ইহার অর্থ করেন—লোকে যে পরিমিত পদার্থের উপাসনা করে (যেমন কালী, দুর্গা, শিব, বিষ্ণু) তাহা ব্রহ্ম নহেন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ইহার অর্থ করিয়াছেন "(লোকে) এই যে [পরিমিত) বস্তুর উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে।" এখানে পরিমিত শব্দটি তাঁহার নিজের মনগড়া। ভগবান শঙ্করাচার্য্য

শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্যের মত

ইহার এইরূপ ভাষ্য করিয়াছেনঃ—"নেদং ব্রহ্ম যদিদমিত্যুপাধি-ভেদবিশিষ্টং অনাত্মেশ্বরাদি উপাসতে ধ্যায়ন্তি।" অর্থাৎ লোকে যে উপাধিভেদবিশিষ্ট আত্মা হইতে ভিন্ন পদার্থ—যেমন ঈশ্বরাদি, উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। শঙ্করাচার্য্যের মতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত ব্রহ্মসংজ্ঞা হইতে বাদ পড়িলেন, অর্থাৎ উপাস্য বস্তুমাত্রেই ব্রহ্ম নহেন। শঙ্করাচার্য্য অন্যত্র আরও স্পষ্টাক্ষরে এইমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

"তত্তু সমন্বয়াৎ" (১।১।৪) এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন, ব্রহ্মকে উপাসনা বিধির অঙ্গ বলা যাইতে পারে কি না? তাঁহার সিদ্ধান্ত এই, মোক্ষ যদি ক্রিয়ার সাধ্য বা উৎপাদ্য হয় তবে তাহা অনিত্য। ব্রহ্ম ও ক্রিয়াবিধির অঙ্গ নহেন। আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি জন্মে না, মুক্তি আছেই, অজ্ঞান তাহা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, আত্মজ্ঞান সেই আবরণ বিদূরিত করিলে মুক্তি আপনা আপনিই প্রকাশ পায়। "অতো ন পুরুষ-ব্যাপারতন্ত্রা ব্রহ্মবিদ্যা," ব্রহ্মবিদ্যা পুরুষের কর্ম্মাধীন নহেন। সেইজন্য ব্রহ্ম বিদি-ক্রিয়া বা উপাস্তি ক্রিয়ার বিষয় নহেন। ইহার

প্রমাণ স্বরূপ তিনি "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে," এই শ্রুতিই উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যদি বল শ্রুতিতে "আত্মাকে দেখিবে—আপনাকে জানিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্য কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তরে শঙ্করাচার্য্য বলেন, শাস্ত্র পুরুষদিগকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে বিমুখ করাইবার জন্যই এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এস্থলে পৃথিবীবাসী লোকের সূর্য্যলোকে গিয়া সূর্য্য দর্শনের দৃষ্টান্তটি স্মরণ করিলে শঙ্করাচার্য্যের যুক্তি আরও স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। সূর্য্য স্বভাবতঃ অচল মেঘনির্মুক্ত, জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ রহিয়াছেন। তাঁহার সেই স্বরূপদর্শনাভিলাষী ব্যক্তির সাধ্য কোন ক্রিয়াবিশেষের উপর তাঁহার থাকা না থাকা নির্ভর করে না। অগ্নির অস্তিত্ব বা উৎপাদন ক্রিয়াসাধ্য, কিন্তু যে অগ্নি ক্রিয়াদ্বারা উৎপাদিত হয়, তাহা নিত্য নহে, তাহা আবার নিবিয়া যায়। মুক্তি সেরূপ ক্রিয়াসাধ্য হইলে আবার তাহা বিনষ্ট হইত। সূর্য্যের অস্তিত্বটা দর্শনাভিলাষী পুরুষের ক্রিয়াসাধ্য নহে, কিন্তু সূর্য্যের নিকটে পৌঁছান ক্রিয়াসাধ্য ব্যাপার। সে ক্রিয়া হইতেছে, সূর্য্যের অস্তিত্বটা সম্বন্ধে (আপেক্ষিক) জ্ঞান লাভ। কি উপায়ে মেঘের আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারা যাইবে তাহার উপায় অবলম্বন, পরে সেই উপায়ে অর্থাৎ নভোযানের সাহায্যে উর্দ্ধে গমন ইত্যাদি। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও শ্রুতি সেইরূপ উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্য,,"

—বৃহদারণ্যক—



"তদ্ ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত ব্রহ্মবান্ ভবতি"—তৈত্তিরীয়—
"তদ্ধ তদবনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং।"—কেন—
"মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত"—ছান্দোগ্য।

এই সকল উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য পুরুষকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিয়া ব্রহ্মমুখীন করা, এবং অজ্ঞান তমোনাশের দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ প্রতিষ্ঠা করা।

আর একথাও প্রণিধানযোগ্য যে, উপনিষৎ সমূহে নির্গুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি ও সগুণ ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতি প্রায়ই মিশ্রিত ভাবে আছে। এমন কি একই শ্রুতি বাক্যের কতকাংশ নির্গুণপ্রতিপাদক, কতকাংশ সগুণপ্রতিপাদক। ইহার কারণ নির্গুণ ব্রহ্ম ও সগুণ ব্রহ্ম একই বস্তু, মূলতঃ ভিন্ন নহেন, কেবল আমাদের বুঝিবার সুবিধার জন্য পৃথগ্‌ভাবে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং যে যে শ্রুতিতে ব্রহ্মকে উপাসনা করিতে বলা হইয়াছে, সে স্থলে সগুণ ব্রহ্মই শ্রুতির অভিপ্রেত বুঝিতে হইবে। নচেৎ পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। ভাষ্যকারগণও সেইভাবে তাহার সমাধান করিয়াছেন। মাণ্ডূক্যোপনিষদের গৌড়পাদ কারিকার ৩য় প্রকরণের ১ম শ্লোকের ভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

"যত উপাসনাশ্রিত উপাসনা আত্মনো মোক্ষসাধনত্বেন গত উপাসকোঽহং মমোপাস্যং ব্রহ্ম। তদুপাসনং কৃত্বা জাতে ব্রহ্মণি ইদানীং বর্ত্তমানো অজং ব্রহ্ম শরীরপাতাদূর্দ্ধং প্রতিপৎসে প্রাগুৎপত্তেশ্চ অজমিদং সর্ব্বমহঞ্চ যদাত্মকোঽহং প্রাগুৎপত্তেরিদানীং জাতো, জাতে ব্রহ্মণি চ

বর্ত্তমানে উপাসনয়া পুনস্তদেব প্রতিপৎসে ইত্যুপাসনাশ্রিতো ধর্ম্মঃ। সাধকো যেনৈবং ক্ষুদ্রব্রহ্মবিৎ, তেনাসৌ কারণেন কৃপণো দীনোঽল্পকঃস্মৃতো নিত্যাজ-ব্রহ্মদর্শিভিঃ মহাত্মভি রিত্যভিপ্রায়ঃ। যদ্ বাচাভ্যুদিতং................. তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ইত্যাদি শ্রুতে স্তবলকারাণাম্।"

অর্থাৎ যিনি এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলেও উপাস্য উপাসক ভাব বর্ত্তমান থাকে, অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানিয়াও মনে করেন যে "এই ব্রহ্ম আমার উপাস্য এবং আমি ইঁহার উপাসক, অতএব ইঁহার উপাসনা করিয়া ব্রহ্মবিজ্ঞান হইয়াছে, এবং এক্ষণে আমি বর্ত্তমান আছি, যখন এই দেহের পতন হইবে তখন সর্ব্বময় সনাতন ব্রহ্মকে পাইব"—তাঁহাকে ব্রহ্মবিৎ মহাত্মা যোগিগণ কৃপণ বলিয়া থাকেন, সে কখনও ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে নাই। তাহাকে ক্ষুদ্রব্রহ্মজ্ঞানী বলা যায়।

*নিরাকারবাদিগণও নিগুর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে চাহেন না, তাঁহাদের মতেও সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য*

যাহা হউক নির্গুণ ব্রহ্ম উপাস্য কি না এই তর্ক সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন, কারণ নিরাকারবাদিগণ তর্কের খাতিরে যাহাই বলুন না, তাঁহারা কেহই নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে চাহেন না বা করেন না, তাঁহারা সকলেই সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসক।

## নিরাকারবাদিগণের মত।

*রাজা রামমোহন রায়ের মত*

রাজা রামমোহন রায় তাঁহার "অনুষ্ঠান" পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"প্রশ্ন। কে উপাস্য? উঃ,—অনন্তপ্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত



অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট যে এই জগৎ— — — —ইহার কারণ ও নির্ব্বাহ-কর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য হন।"

প্রঃ।—"কোন উপায়ে তাঁহার স্বরূপের নির্ণয় হয় কি না?"

উঃ।—তাঁহার স্বরূপকে কি মনেতে কি বাক্যেতে নিরূপণ করা যায় না, ইহা শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে বারংবার কহিয়াছেন।"

*মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদের নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপ্রতিপাদক মন্ত্র সকল যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া কয়েকটি সগুণ প্রতিপাদক মন্ত্র ইচ্ছা-নুরূপ সংশোধন করিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র সঙ্কলন করিয়া-ছিলেন, তদনুসারে অদ্যাবধি ব্রাহ্মগণ উপাসনা করিয়া থাকেন, সে মন্ত্রটি এই :—

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রমাসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি একস্য তস্যৈবোপসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভং ভবতি। তস্মিন্ প্রীতি স্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

*ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মত*

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার গীতোপনিষৎ পুস্তকে লিখিয়াছেন —

"নির্গুণ সাধন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহে। এই অন্ধকার সাধন দ্বারা মনকে নির্গুণের নিকট উপস্থিত করা যায়। কেবল সত্তামাত্র উপলব্ধি ইহাকেই বলে নির্গুণ সাধন। "আমি আছি" এই উপাধিধারী যিনি তিনি নির্গুণ। নির্গুণের অর্থ গুণশূন্য? না, নির্গুণের অর্থ কি কখনও গুণশূন্য? না। তিনি গুণাকর, কখনও তাঁহার গুণের অভাব হইতে পারে না। তবে নির্গুণ কেন বলি?

যাঁহার গুণ এখনও সাধকের ধারণ করিবার সময় হয় নাই। সত্তামাত্র ধারণ করা যোগের আরম্ভ.........এই নিগুর্ণ সত্তা সাধকের মনের উপরে আপনার রাজ্য স্থাপন করিবার পর ঈশ্বরের গুণসম্পন্ন স্বরূপ প্রকাশিত হইবে।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের মত

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞান পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

এই পরমাত্মা অদ্বিতীয় হইলেও মানুষের সহিত তাঁহার চিরন্তন দ্বৈত ভাব বর্ত্তমান। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে। জ্ঞান বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই বিষয়ের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে, বিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন বিশুদ্ধ জ্ঞান অসম্ভব। সেইরূপ মানবাত্মা চিরন্তনভাবে পরমাত্মার সহিত ভিন্নভাবে অবস্থিত। এইরূপ দ্বৈতাদ্বৈত ভাব ভিন্ন উপাসনা হইতে পারে না। সেই উপাসনা দ্বারা আমাদের ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপ হয়? "যখন আমাদের চিন্তা, ভাব ও ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হইয়া যায়। যখন অপ্রেম ও অপবিত্রতার লেশমাত্র আমাদের হৃদয়ে থাকে না, যখন আত্মা পবিত্রতার সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়, হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইয়া সমগ্র জগৎকে আলিঙ্গন করে, যখন প্রেম পবিত্রতা আমাদের পক্ষে বাহিরের বস্তু থাকে না, সম্পূর্ণরূপে ভিতরের বস্তু হইয়া যায়। এরূপ দুর্লভ সময়ে আমাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় একটী পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা সমন্বিত জ্ঞান বস্তুই?"

তিনি আরও বলেন—"যদি কেহ বলেন এই অবস্থায় আমরা কেবল আমাদের আত্মারই একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র জ্ঞাত হই," ইহার উত্তর এই যে, কেবল বিজ্ঞান বলিয়া কোন বিষয় নাই, বিজ্ঞান সমন্বিত আত্মাই সমস্ত বিষয়টা। তেমনি কেবল অবস্থা, পূর্ণ প্রেম পবিত্রতার কেবল অবস্থা বলিয়া কোন বিষয় নাই,—আমরা এক মুহূর্ত্তে যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা একটা অবস্থা মাত্র নহে—তাহা একটা জীবন্ত আত্মা—পূর্ণ প্রেম-সমন্বিত একটি পরম পুরুষ।"



যাহা হউক এইপ্রকার ব্রহ্মোপাসনা করিয়া যাঁহারা বলেন আমাদের ব্রহ্ম বিজ্ঞান হইয়াছে, আমরা ব্রহ্মকে জানিয়াছি, দেহান্তে আমরা সর্ব্বময় সনাতন ব্রহ্মকে পাইব, ভাষ্যকারের মতে তাঁহারা "ক্ষুদ্র ব্রহ্মজ্ঞানী।" তবে ভাষ্যকারের এই মত সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় এইমত গ্রাহ্য করেন না। কিন্তু দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় আবার একথাও বলেন না যে তাঁহাদের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, বা তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য লালায়িত। তাঁহারা চান সগুণ সাকার ভগবানের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার লীলামৃত আস্বাদন করিতে। তাঁহাদের মতে ভক্তিই পরম বস্তু, "মুক্তি তার দাসী।" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কতকটা এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিয়াছেন ঃ—

ব্রাহ্মমত ও বৈষ্ণব মতের পার্থক্য

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দ ময়—
লভিব মুক্তির স্বাদ। * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার,
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝ খানে।
মোহ মোর মূর্ত্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে দলিয়া।"

এইরূপে আমরা দেখিলাম, নির্গুণব্রহ্ম আমাদের জ্ঞানের অতীত, অজ্ঞেয়, তিনি আমাদের উপাস্য নহেন, সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরই আমাদের উপাস্য, ইহা শ্রুতিস্মৃতিসম্মত। নিরাকার-বাদিগণও সগুণব্রহ্মের উপাসক।

সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম-জ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের মত

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, সগুণব্রহ্ম হইতে নির্গুণব্রহ্মের কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই, সগুণব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহা পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত। এখন দেখা যাক,—

পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্ত কিরূপ ?

পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে ম্যানসেল ( Mansel ) বলেন—

ম্যানসেলের মত

"Our conception of the Diety is bounded by the conditions which bound all human knowledge and therefore we cannot represent the Diety as He is but as he appears to us."

অর্থাৎ মনুষ্যের জ্ঞান মাত্রই যে দেশকালাদি উপাধি ( conditions ) দ্বারা সীমাবদ্ধ, ঈশ্বরের সম্বন্ধীয় জ্ঞানও তদ্রূপ সীমাবদ্ধ। সে জন্য ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অতীত। তাঁহার প্রকাশমান অর্থাৎ সগুণ ভাবই আমরা জানিতে পারি।

আমার উদ্ধৃত ম্যানসেলের এইমত খণ্ডন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত



ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তাঁহার "সাকার বাদের অদ্ভুত সমর্থন" প্রবন্ধে বলেন,—

আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান, জীবব্রহ্মের এই মৌলিক একত্ব প্রতিপাদক বৈদান্তিক অধ্যাত্ম বাদই ম্যানসেলের অজ্ঞেয়তাবাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্ব-প্রধান প্রতিবাদ। ম্যানসেল যে condition এর কথা বলিতেছেন তাহা এখানে খাটিতেছে না। আমাদের আত্মজ্ঞান কোন condition এর ভিতর দিয়া হয় না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ ; সুতরাং ব্রহ্মকে জানিলেই যে তিনি conditioned হইয়া পড়িবেন এ আশঙ্কার কোন ভিত্তি নাই।

আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান একথা অবশ্য সত্য। এই সত্য বলেই ত মানুষ "সোঽহম্," "অহং ব্রহ্মাস্মি" বলিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া সকলেই এরূপ বলিতে পারে না। যাঁহার অজ্ঞানান্ধকার কাটিয়া জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে তিনিই এই-রূপ বলিতে পারেন। সেই জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশের পূর্ব্বেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকার ব্রহ্মজ্ঞান হয় সন্দেহ নাই, কারণ আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এবং আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার জ্ঞানও হইয়া থাকে। কিন্তু সে কিরূপ আত্মজ্ঞান ? না মেঘাচ্ছন্ন দিবসে সূর্য্যের জ্ঞানের ন্যায়। আমরা পৃথিবীর লোকে যেমন সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন দেখি ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে যাইতে দেখি, এ সেইরূপ মায়িক জ্ঞান ( phenomenal knowledge ),। যিনি সূর্য্যের এই প্রকার জ্ঞানেই পরিতৃপ্ত থাকিতে চান তিনি ইহাকেই প্রকৃত সূর্য্যের জ্ঞান বলুন তাহাতে ক্ষতি নাই। তবে যাঁহারা ব্রহ্মের এইরূপ সগুণ জ্ঞান লাভ

করিয়া মনে করেন, প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলাম—শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী তাঁহাদিগকে "ক্ষুদ্রব্রহ্মজ্ঞানী" বলিবেন, শঙ্করাচার্য্যের মতেও আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু আমাদের ন্যায় প্রাকৃতজনকে মনের স্বাভাবিক অজ্ঞান তিমির ভেদ করিয়া সেখানে পৌঁছিতে হয়, নচেৎ মানুষ মাত্রেই জন্মাবধি পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানী হইত।

জনষ্টুয়ার্ট মিলের মত

ধীরেন্দ্র বাবু আরও বলেন—জনষ্টুয়ার্টমিল ম্যানসেলের এই যুক্তি খণ্ডন করিয়া বলেন, সাকার ও নিরাকার সকলই আমরা conditionএর ভিতর দিয়া জানি, সেইজন্য নিরাকার যদি অজ্ঞেয় হয়, তবে সাকার আরও অজ্ঞেয়, কেননা সাকারকে জানার condition আরও বেশী, বস্তু নিজে যে কি তাহা ঈশ্বর সম্বন্ধেও জানি না, জড় সম্বন্ধেও জানি না—অসীম সম্বন্ধেও জানি না, সসীম সম্বন্ধেও জানি না, আমাদের নিকট যাহা যে ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা সেই ভাবেই জানি। মিলের এই কথার কোন জবাব ম্যানসেল দিতে পারেন নাই।

ক্যাণ্টের মত

কেবল ম্যানসেল কেন, কেহই দিতে পারিবেন না। মহামতি ক্যাণ্ট ( Kant ) মিলের বহুপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার যুক্তি তর্ক তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহার মত পরিশিষ্টে বিস্তারিত রূপে আলোচিত হইল, এখানে সংক্ষেপে বলা যাইতেছে।

আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান দুইটি জিনিষের উপর নির্ভর করে—জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, জ্ঞেয় বস্তু বাহ্য জগৎ হইতে আসে,



জ্ঞাতা অর্থাৎ মন ( mind ) জ্ঞানের অবয়বগুলি প্রদান করে। বাহ্যজগৎ না থাকিলে জ্ঞাতব্য পদার্থের অভাব হইত, আর মন না থাকিলে সেই পদার্থগুলি এলোমেলো ভাবে গৃহীত হইয়া কোনপ্রকার বস্তুজ্ঞান জন্মাইত না—কিন্তু বাহ্য জগতের স্বরূপ জ্ঞান আমাদের হয় না, তাহার কারণ মনের মধ্যে প্রবেশের পথেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপরসাদি, দেশ ও কাল ( space and time ) দ্বারা আকারিত হয়, পরে বুদ্ধির ( understanding ) কোঠায় গিয়া পড়িলে সেখানে যেসব categories ( জ্ঞানের অবয়ব যেমন একত্ব, বহুত্ব, কার্য্যকারণ ইত্যাদি দ্বাদশটি ) তাহাদের ছাঁচের মধ্যে ঢালা হইয়া যায়। যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন কতকগুলি impression পায়; যথা শ্বেতবর্ণ, মিষ্টস্বাদ, কঠিন স্পর্শ ইত্যাদি, এই impression গুলি যখন বুদ্ধির কোঠায় পৌঁছিয়া তাহার মধ্যস্থ unity ( একত্ব ) নামক ছাঁচে পড়ে, তখন সেগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া "চিনি"র আকার ধারণ করে। তখন বাহিরের যে বস্তুটি হইতে এই সকল impression মনের উপর ক্রিয়া করিতেছিল আমরা তাহাকে "চিনি" বলিয়া জানি, কিন্তু "চিনি" মূলতঃ কি বস্তু তাহা আমরা জানি না; কারণ সেই মূল বস্তুটি নানাপ্রকর রূপান্তরিত হইয়া আমার জ্ঞানগম্য হইয়াছে। *

* All cognition is the product of two factors—the cognising subject and the cognised object. The one factor the external object, contributes the material, the emperical material of knowledge; the other

উক্ত কারণে ক্যাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞান এই তিনটি নিয়মের অধীন।

(১) আমরা কেবল বস্তুর ছায়া দেখি কায়া দেখি না—

"We know only appearance and not things-in-themselves."

(২) কেবল বহির্জ্জগতের জ্ঞানের উপরেই আমাদের সমস্ত জ্ঞান নির্ভর করে; বহির্জ্জগতের অতীত, উপাধিবিহীন বস্তুর সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান অসম্ভব,—

"Experience alone is our field of knowledge, and any science of the unconditioned does not exist."

(৩) কিন্তু ইহা সত্বেও মানুষের মন যদি বহির্জ্জগতের জ্ঞানরাজ্যের সীমা ছাড়াইয়া উঠিতে চেষ্টা করে, তবে সে নিশ্চয়ই কুতর্কজালে জড়িত হইয়া পড়িবে।

"If nevertheless, human cognition will overstep the limits of experience assigned to it, then it can only involve itself in the greatest contradictions."

---

factor, the subject, contributes the form—those notions, namely by virtue of which alone any connected knowledge, any synthesis of individual perceptions into a whole of experience is possible. Were there no external world, there were no perceptions; and were there no a *priori* notions these perceptions were an indefinite plurality and *maniness* without mutual conbination and without connections in the unity of an understood *whole*. In that case there would not *be* any such thing as experience.......... Nevertheless, we do not know things as they are in themselves.—

Schwegler's History of Philosoply
P. 210—11



এই কারণে ক্যাণ্টের মতে আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও বহির্জ্জগতের অখণ্ড সত্তা প্রমাণের দ্বারা অসিদ্ধ। তবে সংসারে চলিতে হইলে আমাদিগকে এগুলি স্বীকার করিয়া লইতে হয়, নচেৎ ধর্ম্ম ও নীতি টিঁকিতে পারে না—

"It is impossible, therefore, in the theoritical sphere, and with perfect stringency in all respects to prove and comprehend the existence of the soul as a real subject, the existence of the world as a single system and the existence of God as a supreme being, the metaphysical problems proper lie beyond the limits of philosophical knowledge." (Ibid—p 214)

কিন্তু যদি আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগতের অখণ্ড সত্তা প্রমাণের বিষয় না হইল, তবে এভাবগুলি কোথা হইতে আসিল? তাহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন—এগুলি আমাদের মনের মধ্যে না আসিয়া পারে না, এগুলি আমাদের মনের নৈতিক বিশ্বাস ("moral conviction").

"This conviction is not logical, but moral certainty .........That is to say, belief in God and another world is so interwoven with my moral feeling, that as little as I run risk of losing the latter, so little am I apprehensive of being deprived of the former". (Ibid—p. 232)

অর্থাৎ এই ধর্ম্ম বিশ্বাস ন্যায়ের যুক্তিদ্বারা প্রমাণিত না হইলেও আমার নৈতিক সত্তার সহিত ইহা এরূপ অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত যে ইহা না হইলে আমি বাঁচি না।

মানুষ কেবল ন্যায়ের যুক্তি ও বাহ্যজগতের মায়িকজ্ঞান লইয়াই বাঁচিয়া থাকে না, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কার্য্যকরী ক্ষমতা আছে, যদিও আমাদের সমস্তজ্ঞান ও তাহার প্রমাণ মায়িক জগতে সীমাবদ্ধ, তবুও "যাহা দেখা যাইতেছে" ইহার অন্তরালে "যাহা আছে" ও "যাহা হওয়া উচিত"—এরূপ জ্ঞানের আভাস আমরা পাই। আমাদের ইচ্ছাশক্তি "যাহা দেখা যাইতেছে" তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া "যাহা হওয়া উচিত" এরূপ বিষয়ের জন্য লালায়িত। সেইজন্য আমরা বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানলাভে বঞ্চিত থাকিলেও আমাদের নৈতিকজীবনের সার্থকতা লাভের জন্য আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং আত্মার অমরত্ব এই সকল ভাব বিনাপ্রমাণে মানিয়া লইতে বাধ্য হই। *

এতদ্দ্বারা ক্যাণ্টের মত মোটামুটি বুঝা গেল। আমরা

* "All knowing and all demonstration is limited to phenomena or possible experience. But the boundary of that which can be experienced is not the boundary of that which is, still less of that, which ought to be; the boundary of theoritical reason is not the boundary of practical reason,...............If we were merely theoritical, merely experimental beings, we should lack all occasion to suppose a second, intelligible world behind and above the world of phenomena; but we are volitional and active beings under laws of reason, and though we are unable to know things in themselves, yet we may and must *postulate* them—our freedom, god and immortality. For not only that which is a condition of experience is true and necessary, but that also which is a condition of morality. The discovery of the laws and conditions of morality is the mission of practical philosophy.————Falckenberg's *History of modern philosophy*. P. 383.



দেখিলাম ক্যাণ্টের যে মত, জনষ্টুয়ার্ট মিলেরও সেইমত অর্থাৎ ঈশ্বরই বল আর জড় জগৎই বল কোন বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। আমাদের জ্ঞান মায়িক জগতে ( phenomenal world এ ) সীমাবদ্ধ। ম্যানসেল্‌ও ঈশ্বর সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়াছিলেন।

তবে এখানে তর্ক উঠিতে পারে, phenomenon ও noümenon, একবস্তুরই দুইদিক্। আমরা যখন phenomenon জানি সেই সঙ্গে সঙ্গে noümenonও জানি, এই দুইটির মধ্যে এক গভীর খাত কাটিবার প্রয়োজন কি? সুধীশ্রেষ্ঠ হিগেল ( Higel ) এই তর্ক তুলিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহার মতও এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

হিগেলের মত

হিগেলের মতে যাহাকে আমরা মায়িকজগৎ ( phenomenal world ) বলি তাহা ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ( reason ) হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে; ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিই ( will ) বহির্জ্জগতের আকারে আকারিত হইয়াছে, সুতরাং বাহ্যবস্তু ও ইচ্ছা একই পদার্থ। * knowable এবং unknowable ( জ্ঞেয় ও অজ্ঞেয় ),—phenomena এবং noümena ( মায়িক জগৎ ও বাস্তব সত্তা ) ইহাদের

* "All being is thought realised, all becoming a development of thought"..............."If all that is real is manifestation of reason, and each thing a stage, a modification of thought, then thought and being are identical-"...................The rational is real and the real is rational—( Falckenberg's *History of modern Philosophy* —PP. 498-90 )

মধ্যে ক্যাণ্ট যে খাত কাটিয়াছিলেন হিগেল তাহার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে প্রাচীর ছিল তাহা তিনি ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। তিনি আত্মা বা ব্রহ্ম (absolute) হইতে জীব জগতের পরিণতি দেখাইয়াছেন, তাঁহার মতে "Pure being is equivalent to nothing"—অর্থাৎ নামরূপ বিবর্জ্জিত বিশুদ্ধ সত্তা বলিলে যাহা বুঝায় কিছু নয় বলিলেও তাহাই বুঝায়। কিন্তু তাঁহার "nothing" মানে শূন্য নহে, nothing মানে no-thing। কিছু নয় ভাবিতে গেলে আমরা কিছু না ভাবিয়া পারি না। কি নয়? কিছু নয়, অতএব কিছু অবশ্য ছিল যাহা এখন নাই। "nothing exists as something thought" কিছু হইতে কিছু না আবার কিছু না হইতে কিছু কি করিয়া হইবে। ইহা যে

"না সতো বিদ্যতে ভাবো
না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

গীতার এই উক্তির বিপরীত কথা। হিগেল বলেন, ইহা অসম্ভব নয়। বালক যখন বালক থাকে, তখন সে বৃদ্ধ থাকে না। আবার বালক যখন বৃদ্ধ হয় তখন সে বালক থাকে না, অথচ বালক ও বৃদ্ধের মধ্যে একটা সংযোগ রহিয়াছে, সেই সংযোগের নাম ক্রমপরিণতি (becoming); একই বস্তু-সত্তা বালকত্ব হইতে বৃদ্ধত্বে পরিণত হইয়াছে।—বালকত্ব ও বৃদ্ধত্ব সেই একই বস্তুর প্রকাশ (phenomenon) মাত্র—সেইবস্তু-সত্তা মূলে একই রহিয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের



সত্তাই জগৎরূপে পরিণত, জীবজগৎ ব্রহ্মের বহিঃপ্রকাশ ("The idea externalises itself and so we get nature")।

ক্যাণ্ট ঈশ্বরকে মায়িক জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া স্থাপন করিয়া বলিয়াছিলেন, মায়িক জগৎ ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন সংযোগ সেতু নাই। আমাদের জ্ঞান মায়িক জগতে সীমাবদ্ধ, সুতরাং ঈশ্বর আমাদের নিকট অজ্ঞেয়। হিগেল বলিলেন, তা নয়; এই মায়িক জগৎইত ঈশ্বরের প্রকাশ, ঈশ্বর এই মায়িক জগতেই পরিণত হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞান অসম্ভব হইবে কেন? এই মায়িক জগতের মধ্যেই তাঁহার জ্ঞান হইতে পারে। এই মায়িক জগতের জ্ঞানই তাঁহার জ্ঞান। হিগেল অখণ্ড সত্তাকে জগৎ হইতে এতদূরে স্থাপন করেন না যে, তাঁহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না, তিনি আত্মাকে মায়িক জগতের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেও চান না, তিনি মায়িক জগতের মধ্যে তাঁহাকে প্রকটভাবে দেখাইতে চান। তিনি অখণ্ড সত্তাকে ব্যক্তিত্বের মধ্যে—সমষ্টিকে ব্যষ্টির মধ্যে দেখাইতে চান। *

তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, ক্যাণ্ট যে সূর্য্যের জ্যোতী-রেখা (flash) স্বীয় প্রতিভাবলে ধরিতে

* "Hegel seeks out the universal not without the particular, but in it. It should not find the infinite beyond the finite, nor the absolute at an unattainable distance above the world, nor the essence hidden behind the phenomena but manifesting therein."—(Falckenberg)

পারিয়াছিলেন, হিগেল তাহা পারেন নাই। তিনি মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য-কেই সূর্য্যের যথার্থরূপ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। ক্যাণ্টের "synthetic unity of apperception." আত্ম-স্বরূপের কাছাকাছি পোঁছিয়াছে। হিগেল নির্গুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, তাঁহার absolute বেদান্তের ঈশ্বর। হিগেলের absolute নিজকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া তাঁহার উপরে ও মধ্যে অবস্থান করিতেছেন—সেই তিনটি বিভাগ হইতেছে self, not-self and absolute Idea, অর্থাৎ আত্মা, অনাত্মা ও অখণ্ড জ্ঞান বা সত্তা। তাঁহার মতে absolute বা universal spirit (পরমাত্মা) প্রথমতঃ world spirit (বিশ্বাত্মা) এবং Individual consciousness (জীবাত্মা) রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন; সেই Individual consciousness or subject spirit, object spirit এর মধ্যদিয়া ও তাহার সাহায্যে আবার absolute spirit এর সহিত মিলিত হয়।*

* "Reason becomes nature in order to become spirit." The idea goes forth from itself in order—enriched to become spirit-"

"Nature and mind are not isolable from each other. Neither the mind nor the so-called external world are either of them selfsubsistent existences, issuing at once and ready-made out of nothing. The mind and the world—the so-called subject and object are equally the results of a process. As the one side or aspect of the process gathers feature and form, so does the other. If the depth and intensity of intellect increases the limits of the external world extend also. The subjective world—the mind of man—is really constituted by the same force as the objective world of nature. Hegel came to prove the real scope of philosophy was God, ——That the absolute is the "original synthetic unity" from which the external world and the ego have issued by differentiation and in which they return to unity" *The logic of Hegel* by W. Wallace.



কিন্তু হিগেল যে প্রণালীতে তাঁহার absolute হইতে জীব জগতের অভিব্যক্তি দেখাইয়াছেন তাহা দোষশূন্য নহে। হিগেলের মতে এইরূপ অভিব্যক্ত অবস্থা ভিন্ন ঈশ্বরের আমরা আদৌ কল্পনা করিতে পারি না। হিগেল নির্গুণ ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের তুরীয় অবস্থা স্বীকার করেন না, কিন্তু ঈশ্বর এক হইতে বহু কিরূপে হইলেন? তিনি যদি দেশ কালের অতীত পূর্ণ অখণ্ড সত্তা হন তবে তিনি কিপ্রকারে জীব ও জগতে পরিণত হইলেন? যাহা প্রথমে ছিল না তাহা যদি হয় তবে তাহা কালের সাহায্যে পরিবর্ত্তন দ্বারা হইবে, আজ যে ব্যক্তি যুবা আছে কয়েক বৎসর পরে সে বৃদ্ধ হইবে, অথচ সে একই ব্যক্তি রহিল, তাহার স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন হইল না, কালের সাহায্যে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়, কিন্তু ঈশ্বর কালাতীত এবং তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন নাই।* বেদান্ত বলেন ব্রহ্মের কোন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় না, তিনি জীব-জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন—মায়ার দ্বারা। ইহাকে বিবর্ত্ত বলে। বস্তুর স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্যরূপে প্রতীত হওয়ার নাম বিবর্ত্ত, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। আর

* "we are not to suppose, however, that the evolution of the absolute reality into subject and object, and thereby into concrete spirit is a process beginning and ending in time. Rather the absolute consciousness is realised at every moment."——*The Problems of metaphysics.*

Prof. H. stephen, P. 100

বস্তুর স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ধারণ করাকে বিকার বলে, যেমন দুগ্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া দধির আকার ধারণ করে। এই দুইপ্রকার ভিন্ন বস্তুর পরিবর্ত্তন অসম্ভব। হিগেল বিবর্ত্ত স্বীকার করেন না, সুতরাং তাঁহার ঈশ্বর যদি জীবজগৎরূপে পরিবর্ত্তিত হন, তবে তাঁহার স্বরূপ ঠিক থাকিবে কিপ্রকারে? হিগেলকে কেহ কেহ pantheistic বলেন কারণ তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বজগৎরূপে পরিণত করিয়া পরে আবার স্ব-স্বরূপে পুনরাবর্ত্তিত করান, কিন্তু সেই দোষ খণ্ডনের জন্য কেহ কেহ তাঁহার মতের pan-entheism এই সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। ইহার অর্থ হিগেল ঈশ্বরকে জগতের আধার বলিলেও তিনি জগতের বাস্তবসত্তা স্বীকার করেন এবং তাঁহার মতে জগৎ ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়রূপে নিত্য অবস্থিত। * কিন্তু তাহা কিরূপে সম্ভব, একথা কেহ বুঝাইতে পারেন না। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও সান্তজীবের জীবনে কিরূপে অল্পজ্ঞরূপে প্রকাশিত হন ইহার কোন মীমাংসা নাই।

* "It is accused of being pantheistic, because making God to be at first merely abstract power or being, it makes the world of concrete things to be the system of intermediate means, through which the absolute raises itself into self-conscious spirit ; and makes finite mind to be individualised factors of the one self-realising energy of God—which is like making God to be *pan*, all.........But for this same reason, it is not really pantheism, which in order to make God to be all, takes away all reality from finite things. It is rather *pan-entheism*, because though it makes all things to be in God, it gives them relative reality and independence as factors in the life of God and materials of God's thought—Ibid P. 100



হিগেলের মতে মানুষের আত্মজ্ঞান হইলেও, আত্মা স্বরূপে অবস্থান করেন না, তাঁহার আত্মজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়—subject and object ভেদ থাকে। কিন্তু ক্যান্ট ইহাকে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বলেন না। তিনি বলেন "self is presupposition of all knowledge", so "to know is to synthetise, how can you synthetise synthesis ?"—জ্ঞান মাত্রই জ্ঞাতার কার্য্য, সুতরাং জ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে? শ্রুতিও সেই কথা বলেন:—

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, ইতর ইতরং পশ্যতি, তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং মনুতে, ইতর ইতরং বিজানাতি। যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং জিঘ্রেৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ, তৎ কেন কং শৃণুয়াৎ, তৎ কেন কমভিবদেৎ, তৎ কেন কং মন্বীত, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ। যেনেদং সর্ব্বংবিজানাতি তৎ কেন বিজানীয়াৎ,—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি"—বৃহদারণ্যক।—

যেখানে দ্বৈতজ্ঞান আছে সেখানে একটি আর একটিকে আঘ্রাণ করে, একটি আর একটিকে দেখে, একটি আর একটিকে শোনে, একটি আর একটিকে বলে, একটি আর একটি মনন করে, একটি আর একটিকে জানে। যেখানে সবই আত্মা হইয়া গিয়াছে, তখন কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে বলিবে, কে কাহাকে মনন করিবে, কে কাহাকে জানিবে?

যাহা দ্বারা সব জানা যায় তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানিবে ? বিজ্ঞাতাকে কাহার দ্বারা জানিবে ?

## নিরাকারবাদিগণ হিগেলের মতাবলম্বী।

আধুনিক নিরাকার বাদিগণের হিগেলের অনুবর্ত্তন

আধুনিক নিরাকারবাদিগণ শ্রুতি প্রতিপাদিত এই অদ্বৈতবাদ গ্রহণ না করিয়া হিগেলের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়াছেন, এইজন্য ধীরেন্দ্র বাবু বলেন noümena and phenomena, নির্গুণ ও সগুণ ইহারা একই বস্তুর দুইদিক—নির্গুণকে ছাড়িয়া সগুণ, সগুণকে ছাড়িয়া নির্গুণের কোন অর্থ নাই। একটিকে জানিতে হইলেই অপরটিকে জানিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁহার ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা পুস্তকে লিখিয়াছেন—

"ঈশ্বর পূর্ণ প্রেম ও পবিত্রতা স্বরূপ। পাশ্চাত্য ব্রহ্মবিদ্যার ভাষায় তাঁহার দার্শনিক স্বরূপ ( metaphysical attributes ) যথা—তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্য্যামী, অনন্তরূপ, দেশকালের আধার, তিনি অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অথচ চিরন্তন-দ্বৈত-ভাবাপন্ন।"

"এই পরমাত্মা অদ্বিতীয় হইলেও মানুষের সহিত তাঁহার চিরন্তন দ্বৈতভাব বর্ত্তমান। ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলে। জ্ঞানবস্তুর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদাই বিষয়ের জ্ঞান সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। বিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন বিশুদ্ধ জ্ঞান অসম্ভব।"

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের মায়াবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি ও তাহার খণ্ডন,—

সীতানাথ বাবু তাঁহার ইংরেজী ব্রহ্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের মায়াবাদ এইরূপে বিবৃত করিয়া তাহা খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—



"The *mayabad* of *Sankar* does not admit the permanent existence of the world inseparable from the self. The sensible world is nowhere when the senses cease to work. Even the world does not exist in memory, a memory like percept is only a transient state of self. In dreamless sleep the self is conscious only of itself and not of any object. Self-knowledge is the basis of the knowledge of *Brahma* and so there is no proof of a supreme self or *Brahma* with a differentiated content of knowledge. It is the undifferentiated self which is the seed of the world ; it becomes differentiated through its *maya* and appears as the world but this differentiation is not its permanent nature. Its essence is pure conciousness—*Nirgun*. It is not a knower or subject of knowledge but knowledge itself"........

অর্থাৎ শঙ্করের মায়াবাদ আত্মা হইতে পৃথক ভাবে জগতের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। ইন্দ্রিয়গণ ক্রিয়াশূন্য হইলে এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ অন্তর্হিত হইয়া যায়। এমন কি স্মৃতিতেও জগতের অস্তিত্ব থাকে না, কারণ স্মৃতি অনুভূতির ন্যায় আত্মার একটি ক্ষণস্থায়ী ভাব মাত্র। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা কেবল নিজেকে জানেন অন্য কোন বস্তুকে জানেন না, আত্মার জ্ঞান হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। সেইজন্য ব্যাকৃত-নামরূপ-জ্ঞান সহকৃত ব্রহ্ম-স্বরূপের প্রমাণ নাই। অব্যাকৃতনাম-রূপ-ব্রহ্মই বিশ্বের বীজ।

সেই ব্রহ্মই মায়ার দ্বারা ব্যাকৃত-নামরূপ হইয়া জগদাকার ধারণ করেন। কিন্তু এই নামরূপ বিশিষ্ট জগৎ তাঁহার স্থায়িরূপ নহে, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ, নির্গুণ। ইনি জ্ঞাতা নহেন, জ্ঞেয় নহেন—ইনি জ্ঞান-স্বরূপ।

এইরূপে মায়াবাদ বিবৃত করিয়া সীতানাথবাবু তাহা খণ্ডনের জন্য যে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহার অনুবাদ নিম্নে দিতেছি—

(১) আত্মা নিজেকে না জানিয়া কোন বস্তু জানিতে পারেন না, সুতরাং আত্মা অন্য কোন বস্তুকে না জানিয়া নিজেকেও জানিতে পারেন না।

এই প্রকার যুক্তি বিচার-সহ নহে। object বলিতে subject ও সঙ্গে সঙ্গে বুঝায়, আবার subject বলিতে object ও তাহার সঙ্গে আসে, একথা স্বীকার করি। জ্ঞান যখন relative থাকে তখন একথা খাটে, কিন্তু সমাধি অবস্থায় আত্মা যখন স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় থাকে না। উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিই ত বলিয়াছেন "যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ ......তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ?" নিরাকারবাদিগণ "অধ্যাত্ম যোগ", "নির্ব্বিকল্প সমাধি", এসকল জানেন না, মানেন না, সেই জন্যই তাঁহারা আত্মার এরূপ অবস্থা বুঝিতে পারেন না। এই জ্ঞান সাধন সাপেক্ষ, তাঁহাদের সে সাধনা নাই। এই জন্যই সীতানাথবাবু ইহাকে "It is of the nature of those absurdities accepted by popular belief and philosophical theories.", বলিয়াছেন। ইহা কেবল "theory" নহে, যাঁহারা সাধনা করেন, তাঁহাদের নিকট প্রত্যক্ষ সত্য।



(২) subject (জ্ঞাতা) বলিতেই object (বিষয়) বুঝায়। জ্ঞাতা এক, বিষয় অনেক; জ্ঞাতা নিত্য, বিষয় অনিত্য; জ্ঞাতা দেশকালাতীত, বিষয় দেশকালসীমাবদ্ধ। জ্ঞাতা বা আত্মায় এই সকল গুণ (attributes) অর্থশূন্য হইবে, যদি জ্ঞাতব্য বিষয় কিছু না থাকে।

কিন্তু আত্মার এই সকল গুণ নিত্য কে বলিল? যতক্ষণ মায়িক জগতে দ্বৈতভাব থাকে তখনই সেই দ্বৈতভাবের তুলনায় এই সকল বিশেষণ আত্মায় আরোপ করা হয়, আত্মার অদ্বৈত-সিদ্ধি হইলে এ সকল গুণও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

(৩) আত্মা জ্ঞানময়, সত্যবস্তু (a conscious reality), জ্ঞান ভিন্ন আত্মা স্ববিরোধী (self-contradiction)। অতএব জ্ঞান না থাকিলে আত্মা কিরূপে থাকিতে পারে?

কিন্তু আত্মা জ্ঞানময় নহেন, জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞান তাহার গুণবিশেষ নহে; যেমন সূর্য্য ও আলোক একই বস্তু, আলোক সূর্য্যের গুণ নহে।

(৪) যদি মায়াবাদী মনে করেন যে সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মা তাঁহার জ্ঞান হারান এবং পুনর্ব্বার জাগ্রত অবস্থায় তাহা প্রাপ্ত হন, তবে তিনি ভ্রান্ত। মায়াবাদীর নিকট জ্ঞান নিত্য নহে, জ্ঞান ইন্দ্রিয়-জন্য, অনিত্য বস্তু, বিষয় ইন্দ্রিয় সংযোগে উৎপন্ন হইতেছে, আবার বিলুপ্ত হইতেছে। নিদ্রিতাবস্থায়

যদি তাহা লুপ্ত হইয়া যায়, তবে পুনর্ব্বার জাগ্রৎ অবস্থায় সেই একইপ্রকার জ্ঞান কোথা হইতে আসে? ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে সুষুপ্তি অবস্থায়ও আত্মা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানের বিষয় ( Sensation and ideas ) শূন্য হয় না, সুতরাং আত্মার সহিত বিষয়জ্ঞানের নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

ইহার উত্তরে মায়াবাদী বলিবেন, সুষুপ্তি অবস্থায় Sensation and ideas ( জ্ঞানের বিষয় ) আত্মায় থাকে না, কিন্তু তখন আত্মায় জ্ঞানের সংস্কার থাকে।

"Now what is the direct consciousness of the absence of knowledge and disquiet during deep sleep? It can only be the undifferenced knowledge and bliss set over against negation. The mind or emperical consciousness lapses here altogether; we have pure consciousness against a dark ground—pure consciousness of a 'blank objectivity' or 'object in general' ( Kant). All sensation and all concrete images then lapse into a blank homogeneity. Through a right understanding of this *shushupti* state, we reach the conception of *chaitanya* or the pure self and of *avidya* or the primal blank which is rendered definite by the self; so that to say that the pure selfis immediately conscious of itself in deep sleep is only to state a verbal proposition" *

* "*Studies in Vedantism* P. 8, by Prof. Krishna chandra Bhattacharya M. A.



অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার যে বিষয়জ্ঞান থাকে না সে কি প্রকার অনুভূতি? তখন সর্ব্বপ্রকার sensation ( ইন্দ্রিয় জ্ঞান ), image (বিষয়ের চিত্র) মুছিয়া গিয়া, অব্যাকৃত-নামরূপ অবিদ্যামাত্র শুদ্ধচৈতন্যে ভাসিতে থাকে, তাহার অভ্যন্তরে পূর্ব্বজ্ঞানের সংস্কার বীজরূপে লুক্কায়িত থাকে। *

আমরা এইরূপে দেখিলাম সীতানাথ বাবু মায়াবাদ খণ্ডনের জন্য যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন তাহা বিচারে টিকিতে পারে না।

* Now what is the difference between *Shushupti* and *Savikolpa samadhi?*............In both, the consciousness of duality lapses; in both, the self enjoys undifferenced bliss; in both, the timeless seeds of knowledge and action ( *vidya karma* ) persist, accounting for the recognition of the past in awaking from them. Bnt whereas on awaking from *shushupti*, the self remembers that it was in the attitude of knowing object though the object was there a blank, on rising frnm *Samadhi* it ought to remember it was the blank in that state and not in the object-knowing attitude at all. In the former the self as always limited was simply isolated; in the latter, it burst its bonds, destroyed the barrier between subject and object and became the absolute." ( *Ibid*—P. 15 )

সুষুপ্তি ও সবিকল্প সমাধিতে প্রভেদ কি? উভয় ক্ষেত্রেই দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয়, আত্মা অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করেন, এবং বিদ্যা-কর্ম্ম-সংস্কার বীজভাবে অবস্থান করে, যাহা হইতে পরে জাগ্রৎ ও ব্যুত্থান অবস্থায় পুনর্ব্বার পূর্ব্ববর্ত্তী জ্ঞানের বিষয় সকল অন্তঃকরণে ভাসিয়া উঠে। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিলে আত্মা স্মরণ করেন, যে তিনি জ্ঞাতৃভাবাপন্ন ছিলেন যদিও তখন জ্ঞানের বিষয় কেবল শূন্যরূপে বিদ্যমান ছিল। সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুত্থিত হইলে আত্মার এরূপ কোন স্মৃতি হয় না, তখন জ্ঞাতৃভাবের কোন স্মৃতি আদৌ থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় আত্মার পৃথক ভাব থাকে, সবিকল্প সমাধি অবস্থায় আত্মার জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাব

এই বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম, নিরাকার-বাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন না, তাঁহারাও সগুণ ব্রহ্মোপাসক। তাঁহারা শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্মবিদ্যা সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া পাশ্চাত্য দার্শনিক হিগেলের মতের অনুবর্ত্তন

---

তিরোহিত হইয়া ত্রিপুটীভেদ হয় এবং এক অখণ্ড অদ্বৈতজ্ঞান জন্মে। সবিকল্প সমাধির উচ্চতম অবস্থা কিরূপ ও তাহা কিপ্রকার নির্ব্বিকল্প সমাধিতে পরিণত হইয়া পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের উদয় হয় তাহা কৃষ্ণবাবু অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন,—

"From the ecstatic intuition of all other determinate objects, there is waking but there is no waking from the ecstatic intuition of God, for the simple reason that so long as there is limitation or the slightest trace of individuality, there can be no intuition of this Infinite Determination, no becoming infinite. This is the highest stage of *Sabikalpa Samadhi.* The mind capsule of the self persisting in all such *Samadhi* and ever expanding reaches here its utmost tension, and utmost tenacity. This perfectly transparent envelop still constitutes the determinateness of God as *Ishwara.* He is the actualised "Ideal of Pure Reason" of Kant, the 'Absolute Idea' of Hegel, self realised not in thought but in ecstasy. Although, said Kant, this is the most adequate reason picture of the thing-in-itself, the thing-in-itself is the real, negating even this picture ; of the thing-in-itself, as Spencer would put it, there is only an indeterminate consciousness, an 'indefinable sense.' Vedanta's addition to this is the suggestion that both the reason picture and the indeterminate consciousness are capable of being isolated and actualised in the concrete states *Sabikalpa Samadhi* ( intuition of determinate noumena ) and *Nirbikalpa Samadhi* ( intuition of reality transcending all determinateness ) The latter is undifferenced not only in the sense that the consciousness of duality is absent, as it is even in *Sushupti* not only in the sense that the uncon-scious ring of the unknown constituting the limitation of all noumena lower than God is removed as it may be in *Sabikalpa Samadhi*, but also in the sense that eve the consciousness of this removal is absent. This is the highest stage, this is the truth, this is *Brahman.*"—( *Ibid*—P. 10 )



করেন, এবং তাঁহাদের সেই ব্রহ্মবিদ্যার নাম দিয়াছেন Theism। তাঁহারা অদ্বৈতবাদ মানেন না, তাঁহারা "দ্বৈতাদ্বৈতবাদী"।

নিরাকারবাদিগণের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তির কারণ নাই। হিন্দুদিগের মধ্যেও বেদান্তের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যাদ্বারা নানাবিধ মতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই মাধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দ্বৈতবাদ, বিষ্ণুস্বামিপ্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধদ্বৈতবাদ, রামানুজা-চার্য্যপ্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, নিম্বার্কস্বামিপ্রবর্ত্তিত

---

অর্থাৎ অন্যান্য সগুণ পদার্থের আশ্রয়ে যে সমাধি হয় তাহা হইতে ব্যুত্থান বা জাগরণ স্বতঃই হয়, কিন্তু ঈশ্বরাশ্রয়ে যে সমাধি হয় তাহা হইতে আর জাগরণ হয় না। কারণ যতক্ষণ উপাধি বা ব্যক্তিত্বের লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকে, ততক্ষণ অনন্তসত্তার উপলব্ধি হয় না, ততক্ষণ অসীম হওয়া যায় না। এখানেই সবিকল্প সমাধির পরম পরিণতি। সবিকল্প সমাধির সমস্ত স্তরেই চিত্ত বিদ্যমান থাকিলেও এই স্তরে আসিয়া উহা পূর্ণ বিস্তৃতি লাভ করিয়া লয়োন্মুখ হয়। এই নিরতিশয় স্বচ্ছ আবরণই পুরুষোত্তমের উপাধি এবং ঈশ্বর সংজ্ঞার কারণ। ক্যাণ্টের "Ideal of pure reason "বাস্তবে পরিণত হইলেই বেদান্তের ঈশ্বর হইয়া পড়েন। হিগেলের Absolute idea এবং বেদান্তের ঈশ্বর একই পদার্থ ; তবে এইটুকু মাত্র প্রভেদ যে বেদান্তের ঈশ্বর সমাধিতে স্বয়ং প্রকাশিত, আর হিগেলের Absolute idea চিন্তা বা বুদ্ধির মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। ক্যাণ্টের মতে এই Ideal যুক্তি সাহায্যে গৃহীত, বস্তুস্বরূপের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিচ্ছবি হইলেও ইহা ছায়া-মাত্র। সত্যবস্তু বা বস্তুস্বরূপ এই ছবি হইতে পৃথক্। স্পেনসার বলেন আমরা বস্তুস্বরূপের একটু আভাস পাই মাত্র, সেই বস্তু কেমন তাহা অনির্ব্বচনীয়। বেদান্ত মতে এই যুক্তিগৃহীত প্রতিচ্ছবি এবং এই নিরুপাধি সত্তোপলব্ধি সবিকল্প সমাধি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থাতে বাস্তবরূপে অনুভূত এবং প্রত্যক্ষগোচর হয়, সবিকল্প সমাধিতে সগুণ এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নির্গুণ সত্তার অপরোক্ষানুভূতি হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কেবল যে সর্ব্বপ্রকার দ্বৈতজ্ঞান তিরোহিত হয় তাহা নহে ( কারণ ইহা সুষুপ্তি অবস্থাতেও হয় ), শুধু যে ঈশ্বর সংজ্ঞার নিম্নে সমস্ত বস্তুর উপাধিজ্ঞান লুপ্ত হয় তাহা নহে ( কারণ ইহা সবিকল্প সমাধিতেও হয় ) ; কিন্তু ইহা এক পরম নির্ব্বিশেষ অবস্থার অনুভব দিয়া যায়, যে স্তরে সমস্ত দ্বৈত তিরোধানের

দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রচলিত আছে ; শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মাধ্বিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার গৌড়ীয় মত প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

নিম্বার্কাচার্য্য প্রবর্ত্তিত দ্বৈতাদ্বৈতবাদের সহিত নিরাকারবাদিগণের দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রভেদ কি ? নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, তাঁহার নির্গুণ স্বরূপে জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার ভেদ থাকে না। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান

---

যে জ্ঞান তাহাও থাকে না, এই নির্ব্বিকল্প সমাধিই সর্ব্বোচ্চ অবস্থা, ইহাই সত্য, ইহাই ব্রহ্ম।

ফলকথা, ক্যান্টের মতে বস্তুস্বরূপ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর, বুদ্ধিবৃত্তি বস্তু স্বরূপের ছায়া মাত্র দান করিতে সমর্থ। হিগেলের মতে বস্তুস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তির ভিতর দিয়াই সর্ব্বদা প্রকাশিত। শেপেন্হারের মতে বস্তু স্বরূপের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র আমরা পাইতে পারি কিন্তু সেই বস্তু কেমন তাহা আমরা জানিতে পারি না। বেদান্ত মতে সবিকল্প সমাধি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে বস্তু স্বরূপ সগুণ এবং নির্গুণ ভাবে আমাদের অপরোক্ষানুভূতির গোচর হয়। এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্যহৃদিস্থিতাঃ
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"—কঠ

"যে সকল কামনা মর্ত্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়।"

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্॥—কঠ

"যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসকল ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়—শাস্ত্রের এই উপদেশ।—"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্।"—মুণ্ডক

যেমন প্রবহমাণ নদীসকল নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরম পুরুষে প্রবেশ করেন।



কারণ, জগৎ ব্রহ্মেই প্রতিষ্ঠিত। তিনি আবার জগৎ হইতে অতীতও আছেন ; সেজন্য জগতের সহিত তাঁহার ভেদ সম্বন্ধ। জীব ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন নহে, "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বেদবাক্যে তাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। অতএব জীব ও ব্রহ্মে অভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মে আবার ভেদও আছে। জীব ব্রহ্মের অংশ ; জীব অপূর্ণ, ব্রহ্ম পূর্ণ, সর্ব্বশক্তিমান্ ; জীব মুক্তাবস্থায়ও ব্রহ্মের ন্যায় সৃষ্টিস্থিতি লয় কার্য্য সাধন করিতে অক্ষম। পরম মোক্ষাবস্থায়ও জীব ব্রহ্মের অংশই থাকে।

নিরাকারবাদিগণও জীব ব্রহ্মের ঐক্য স্বীকার করেন না, তাঁহাদের মতেও জীব ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্ম পূর্ণ। কিন্তু তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের কোন নির্গুণ স্বরূপ অবস্থা নাই, ব্রহ্ম জগতের সহিত নিত্য-সম্বন্ধ।

যাহা হউক, বৈষ্ণবদ্বৈতাদ্বৈতবাদিগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় ভগবানের আকার ও অবতার স্বীকার করেন ও সেই রূপের তাঁহারা উপাসনা করেন। নিরাকারবাদিগণ সগুণ উপাসনা করেন, কিন্তু কোন অবতার বা মূর্ত্তি পূজা করেন না। আমরা ক্রমে দেখাইব, মূর্ত্তিপূজা না করিলেও বাস্তবিক পক্ষে সাকারবাদীর সাকার উপাসনায় এবং নিরাকারবাদীর সগুণ উপাসনায় বিশেষ কোন পার্থক্য নাই।

নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীর মধ্যে উপাস্যবিষয়ে প্রকৃত কোন ভেদ নাই

তাঁহাদের নির্গুণোপাসনাও বস্তুতঃ সাকারোপাসনার প্রকার ভেদ মাত্র।

আমরা এই অধ্যায়ে দেখিলাম ব্রহ্ম আদিতে এক ছিলেন, সৃষ্টিলীলার জন্য বহু হইয়াছেন। তিনি এক হইয়াও বহুরূপী। তিনি কখনও নির্গুণ, নিরুপাধি, শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। তিনি কখনও কারণ-দেহধারী মায়াধীশ পুরুষোত্তম মহেশ্বর। তিনি কখনও সূক্ষ্মদেহধারী অক্ষয় পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ। আবার কখনও বা তিনি স্থূলসূক্ষ্মদেহধারী, বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষ, অথবা তদন্তর্গত অবতাররূপী দ্বিভুজ-চতুর্ভুজধারী ভগবান বা ঈশ্বর। তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য, কিন্তু তাঁহার নির্গুণস্বরূপ আমাদের বাক্যমনের অগোচর সুতরাং আমাদের উপাস্য নহে। তাঁহার কারণদেহ ও সূক্ষ্মদেহাশ্রিত রূপ যোগিজনের ধ্যানগম্য। আর তাঁহার বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপ অথবা অবতাররূপই আমাদের ন্যায় স্থূলজগতে বিচরণশীল সাধারণ মানবের একমাত্র অধিগম্য এবং উপাস্য। তাহা হইলেও তিনি যখন এই চারিরূপে একই বস্তু, যখন তিনি অখণ্ড অব্যয় পরমপুরুষ, আমাদের নিজ নিজ অধিকারানুসারে তাঁহার যে রূপেরই উপাসনা করি না কেন, আমরা সেই এক পরমেশ্বরেরই উপাসনা করিয়া থাকি, সুতরাং তিনিই আমাদের উপাস্য।

---

# তৃতীয় অধ্যায়

## উপাসনা কাহাকে বলে ?

### শাস্ত্রোক্ত বিভিন্ন প্রকারের উপাসনা

উপাসনা শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন ধনের জন্য ধনীর উপাসনা করিবে, বিদ্যার জন্য গুরুর উপাসনা করিবে, মুক্তির জন্য ভগবানের উপাসনা করিবে। শ্রুতিতে উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেমন উদ্‌গীথ উপাসনা,—প্রণবের উপাসনা,—বিজ্ঞানের উপাসনা,—প্রাণরূপে ও মনরূপে উপাসনা,—আকাশরূপে উপাসনা ইত্যাদি। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে উপাসনার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—

শ্রুতিতে উল্লিখিত বিবিধ প্রকারের উপাসনা

"উপাসনং নাম উপাস্যার্থবাদে যথা দেবতাস্বরূপং শ্রুত্যা জ্ঞাপ্যতে তথা মনসোপগম্য আসনং চিন্তনং লৌকিকপ্রত্যয়াব্যবধানেন যাবৎ তদ্দেবাদি স্বরূপাত্মাভিমানাভিব্যক্তিরিতি লৌকিকাত্মাভিমানবৎ ; "দেবো ভূত্বা দেবানপ্যেতি", "কিং দেবতোঽস্যাং প্রাচ্যাং দিশ্যসি", ইত্যেবমাদি শ্রুতিভ্যঃ"—প্রথম অধ্যায়, ৩য় ব্রাহ্মণ, ১৮।৯ ভাষ্য—

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের মতে উপাসনা কাহাকে বলে ?

অর্থাৎ "উপাসনা শব্দের অর্থ এই যে, শ্রুতিতে উপাসনা-বিধির অর্থবাদবাক্যে ( প্রশংসাবাক্যে ) দেবতা প্রভৃতির যে স্বরূপ বর্ণিত আছে,

মনে মনে সেই রূপটির নিকট উপস্থিত হইয়া আসন, ( উপ + আসন = উপাসন ) চিন্তা করা। বলা বাহুল্য যে, উক্ত চিন্তার মধ্যে জাগতিক অন্য কোন চিন্তা উপস্থিত হইবে না,—যতক্ষণ লোক-সিদ্ধ অভিমানের ন্যায় সেই উপাস্য দেবতাদি স্বরূপে তাহার আত্মাভিমান অভিব্যক্ত না হয় ( ততকাল এইরূপে ধ্যান করিতে হইবে ), কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন 'দেবতা হইয়া দেবতার উপাসনা করিবে,' 'তুমি এই পূর্ব্ব দিকে কোন দেবতারূপে বর্ত্তমান আছ' ? ইত্যাদি।"

ভাষ্যকার ছান্দোগ্য ভাষ্য-ভূমিকায় উপাসনার অর্থরূপ এই বলিয়াছেন:—

"উপাসনং তু যথাশাস্ত্রসমর্পিতং কিঞ্চিদালম্বনমুপাদায় তস্মিন্ সমানচিত্তবৃত্তিসন্তানকরণং তদ্বিলক্ষণ-প্রত্যয়ান্তরিতমিতি বিশেষঃ"।

অর্থাৎ "উপাসনা হইতেছে শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থিত কোন একটী অবলম্বন ( ধ্যানের বিষয় ) অবলম্বন করিয়া, তাহাতেই এমন ভাবে চিত্তবৃত্তির একাকার প্রবাহ সমুৎপাদন করিতে হইবে যে তাহার মধ্যে আর অন্য বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া তাহার ব্যবধান জন্মাইতে না পারে।"

আমরা এতদ্দ্বারা পাইতেছি,—

( ১ ) উপাসনাতে দেবতার কোন একটি বিশেষরূপ বা মূর্ত্তি বা শাস্ত্রসঙ্গত অবলম্বন আবশ্যক।

( ২ ) সেই অবলম্বনটিকে একাগ্রচিত্তে চিন্তা বা ধ্যান করিতে হইবে, যেন চিত্তের অন্য দিকে বিক্ষেপ না হয়।

( ৩ ) সেইরূপ ধ্যান করিতে করিতে উপাস্য দেবতাকে নিজের আত্মার সহিত একীভূত ( identified ) করিতে হইবে।



উপাসনায় অবলম্বন আবশ্যক।

উপাসনায় অবলম্বনের প্রয়োজন

সেই শাস্ত্রসম্মত অবলম্বন কি ? ইষ্টদেবতার শাস্ত্রে বর্ণিত রূপ ( প্রতিমা নহে ), অথবা কোন "প্রতীক"। বেদে ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ প্রভৃতি দেবোপসনার উল্লেখ আছে, বলা বাহুল্য, সেগুলি এক ব্রহ্মেরই রূপভেদ বলিয়া পূজিত হইতেন—"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি" ( ঋগ্‌বেদ ), এক অদ্বিতীয় সদ্ বস্তুকেই বিপ্রেরা বিবিধ নামে অভিহিত করেন। ক্রমে ব্রহ্মের নানাবিধ অবতাররূপে অভিব্যক্ত হওয়ায়, পরে পুরাণ-তন্ত্রাদিতে তাঁহার শিব-কৃষ্ণ-রাম-কালী-দুর্গাদিরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এবং সেই সেই রূপের পূজা প্রচলিত হইয়াছে।

প্রতীকোপসনার অর্থ—

অধ্যাস জনিত উপাসনা—"অন্যত্রদৃষ্ট পরত্রাবভাষঃ অধ্যাসঃ"—অর্থাৎ একস্থলে যে বস্তু দেখা গিয়াছে, অন্যত্র তাহার আরোপকে অধ্যাস বলে। নিজের আত্মার মধ্যে ব্রহ্মের যে প্রকাশ অনুভূত হইতেছে, তাঁহাকে কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি অর্থাৎ যেখানে তাঁহার স্বতঃ প্রকাশ দেখা যায় না, সেখানে আরোপ করিয়া,—তাহার সাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনাকে প্রতীকোপাসনা বলে, যেমন নারায়ণ শিলায় অথবা শিবলিঙ্গে ব্রহ্মোপাসনা।

এতদ্ভিন্ন শ্রুতিতে আর এক প্রকার উপাসনার উল্লেখ আছে,

তাহার নাম সম্পদুপাসনা। দুই বস্তুর মধ্যে সামান্য ধর্ম্ম দেখিয়া ক্ষুদ্রতর ও সহজে আয়ত্তাধীন যে বস্তু তাহার সাহায্যে বৃহত্তর ও সহজে যাহাকে আয়ত্ত করিতে পারা যায় না সেই বস্তুর যে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় তাহাকে সম্পদ্ জ্ঞান বলে। এই সম্পদ্ জ্ঞানের সাহায্যে যে উপাসনা তাহার নাম সম্পদুপাসনা। ব্রহ্ম ও সূর্য্যের মধ্যে প্রকাশকত্ব এই সাধারণ ধর্ম্ম দেখিয়া সেই ধর্ম্ম অবলম্বনে সূর্য্যের সাহায্যে ব্রহ্মের উপাসনাকে সম্পদুপাসনা বলা যায়। এইরূপে সূর্য্যাবলম্বনে ব্রহ্মোপসনা এখনও সাকার উপাসনার অঙ্গ বলিয়া প্রচলিত আছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রুতিতে আর কতকগুলি ব্রহ্মোপাসনা বা বিদ্যার উল্লেখ আছে—যেমন শাণ্ডিল্যবিদ্যা, ভূমবিদ্যা, সদ্বিদ্যা, দহরবিদ্যা, উপকোশল বিদ্যা, বৈশ্বানর বিদ্যা, আনন্দময় বিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা, উকথ্‌বিদ্যা—তাহা এখন অপ্রচলিত ( obsolete ) হইয়াছে।

"জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসা ত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্ত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ" —১।১।৩২ এই বেদান্ত সূত্রে আর এক প্রকার ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ আছে। ইহাতে ব্রহ্মকে চেতনা-

বেদান্তসূত্রের মত

চেতন সকলের অন্তর্য্যামিরূপে ও নিয়ন্তারূপে চিন্তন প্রথমাঙ্গ, সর্ব্বাত্মকরূপে চিন্তন দ্বিতীয়াঙ্গ, এবং তদুভয়াতীতরূপে চিন্তন তৃতীয়াঙ্গ; এই তিন অঙ্গে উপাসনা করার বিধি আছে। যেমন সূর্য্যোপাসনাতে সূর্য্যকে জ্যোতির্ম্ময় পিণ্ড ও প্রকাশাদি শক্তি এবং তন্নিহিত জীব চৈতন্যে এবং তদুভয় হইতে



অতীত সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মরূপ এই তিনরূপে ব্রহ্ম বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। এই প্রকার উপাসনাও এখন প্রচলিত দেখা যায় না।

ইতিপূর্ব্বে প্রতীকোপাসনার কথা বলা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বেদান্তসূত্রের উল্লেখ করিয়া নিরাকারবাদিগণ বলেন, প্রতীকোপাসনায় মুক্তি হইতে পারে না, সুতরাং তাহা পরিত্যাজ্য।

"ন প্রতীকেন হি সঃ"—৪।১।৪

কিন্তু দুঃখের বিষয় বিরুদ্ধবাদিগণ এই সূত্রের পূর্ব্বাপর ( context ) না দেখিয়া এই প্রকার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার পূর্ব্বসূত্র এই :—

"আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ।"—৪।১।৪

অর্থাৎ "ব্রহ্ম আমার আত্মা এইরূপ বুদ্ধিতে ধ্যান করিবে, শিষ্যদিগকেও সেইরূপ উপদেশ দিবে।" ইহার পরে বলিতেছেন "ন প্রতীকে নহি সঃ" :—"মুমুক্ষুর পক্ষে প্রতীকে অর্থাৎ মনঃ, আদিত্য, নাম ইত্যাদি প্রতীকে ব্রহ্মবুদ্ধি করিয়া ধ্যান কর্ত্তব্য নহে, কারণ প্রতীক উপাসকের আত্মা নহে।" ইহার পরের সূত্রে বলিতেছেন—

"ব্রহ্ম দৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ"—৪।১।৫

অর্থাৎ "মন প্রভৃতি প্রতীককে ব্রহ্মরূপে দর্শন, যাহা উপাসনা প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, তাহা যুক্ত। পরন্তু ব্রহ্মকে মনঃ প্রভৃতি রূপে চিন্তা করা যুক্ত নহে, কারণ ব্রহ্ম মনঃ প্রভৃতি প্রতীক হইতে উৎকৃষ্ট।"

ইহার ফলিতার্থ এই—ব্রহ্ম মনঃ প্রভৃতি প্রতীক হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তাঁহাকে মনঃ প্রভৃতিরূপে দৃষ্টি না করিয়া মনঃ প্রভৃতিকে ব্রহ্মরূপে দৃষ্টি করিলে মনঃ প্রভৃতি বিশুদ্ধ হয়। সাধক এইরূপে আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা করিবেন, ব্রহ্মকে জীবরূপে ভাবনা করিবেন না।

আমাদের প্রচলিত সাকার উপাসনায় শিবলিঙ্গ শালগ্রাম-শিলা প্রভৃতি প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মেরই পূজা হয়, ব্রহ্মকে প্রতীক কল্পনা করা হয় না। সুতরাং নিরাকারবাদীর আশঙ্কা অমূলক।

প্রতিমাদি প্রতীক একান্ত আবশ্যক নহে।

উপাসনায় প্রতিমাদি প্রতীক একান্ত আবশ্যক নহে

যাহা হউক আমাদের উপাসনায় প্রতিমাদি প্রতীকের সাহায্য একান্ত আবশ্যক নহে। শালগ্রাম শিলা, শিবলিঙ্গ বা দেবদেবীর প্রতিমা সম্মুখে না রাখিয়াও উপাসনা করা চলে। দেবদেবীর প্রতিমা দেবতার ধ্যানের সাহায্য করে মাত্র, যেমন ম্যাপ দেখিয়া ভূগোল শিক্ষা। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পরে করা হইবে।

মনে মনে দেবতার মূর্ত্তি চিন্তা বা ধ্যান উপাসকের চিত্ত-স্থৈর্য্যের জন্য একান্ত আবশ্যক। তবে মূর্ত্তিচিন্তা ব্যতিরেকেও উপাসনা হইতে পারে, যেমন নাম বা মন্ত্র জপাদি দ্বারা। কোন কোন সম্প্রদায় কেবল নামজপ ও নাম কীর্ত্তনাদিদ্বারাই উপাসনা করিয়া থাকেন।



ব্রহ্মের রূপ কল্পনার অর্থ কি ?

ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ মানুষের কল্পনা কিনা ?

কিন্তু ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ কোথা হইতে আসিল ? রূপ কি কেবল মানুষের কল্পনা-প্রসূত। এসম্বন্ধে সচরাচর তন্ত্রের একটা বচনের উল্লেখ করা হয়,—

"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

ইহার অর্থ কেহ কেহ করেন যে সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা বা উদ্ভাবন করা হইয়াছে। কে করিল ? তাহার উত্তরে বলা হয় ঋষিগণ বা শাস্ত্রকারগণ। কিন্তু আমি ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা দেখিয়াছি। "ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—ব্রহ্মণঃ কর্ত্তায় ষষ্ঠী—ব্রহ্ম নিজেই নিজের রূপ কল্পনা করেন বা রূপ ধারণ করেন।* এই ব্যাখ্যাই শ্রুতিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

"অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথঃ" – বেদান্ত সূত্র ১।২।৩০

ঈশ্বরের বিভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভাব সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ

ইহার অর্থ "অশ্মরথ মুনি বলেন অনন্যমতি উপাসকদিগের অনুগ্রহের নিমিত্ত পরমাত্মা অনন্ত হইলেও বিশেষ বিশেষ রূপে প্রকাশিত হয়েন, অতএব প্রাদেশ মাত্র হৃদয়ে তিনি প্রাদেশ মাত্র রূপে প্রকাশিত হন।"

"অনুস্মৃতের্বাদরিঃ" ঃ—১।২।৩

বাদরিমুনি বলেন অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যানের নিমিত্ত পরমেশ্বর

---

* মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত ফেলোসিপের লেকচার ২য় খণ্ড—৪০ পৃষ্ঠ।

কখন প্রাদেশ পরিমাণ কখন শিরশ্চরণাদি অবয়ব বিশিষ্টরূপে আবির্ভূত হন, এরূপ শ্রুতি আদেশ করিয়াছেন।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।"—৩।২।২৪

ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে তিনি প্রকাশিত হয়েন, শ্রুতি ও স্মৃতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ।"—৩।২।২৫

যেমন সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তত্তদুপযোগী সাধন দ্বারা (দর্পণ, কাষ্ঠদ্বয়ঘর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা) আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হয়েন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারাই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষীভূত হয়েন।

"স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ।"—৩।২।৩৪

আকাশ আলোক প্রভৃতি যেমন স্থান বিশেষ প্রাপ্তিহেতু তৎ-স্থানে পরিমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনার নিমিত্ত প্রতীকাদি স্বরূপে চিন্তিত হয়েন। তন্নিমিত্ত তাঁহার অপরিমিতত্বের অপ-লাপ হয় না।

ব্রহ্মের বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ কারণে মূর্ত্তি ধারণ-পূর্ব্বক আবির্ভাবের কথা পুরাণাদিতে বিস্তাররূপে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও দুই একবার এরূপ আবির্ভাবের উল্লেখ আছে। ঋগ্বেদে আছে তিনি অম্ভৃণ ঋষির বাক্‌নাম্নী কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়া "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই উক্তি দেবীসূক্ত নামে পরিচিত এবং চণ্ডীর তাহাই মূলমন্ত্র।



কেনোপনিষদে আছে দেবতাদিগের অসুর জয়ে গর্ব্ব উপস্থিত হইলে, ব্রহ্ম প্রথমে তাঁহাদের নিকট যক্ষরূপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিলেন, পরে "উমা হৈমবতী" রূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে সেই যক্ষের পরিচয় প্রদান করিলেন।

"স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং
হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্ যক্ষমিতি।
"ব্রহ্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে মহীয়ধ্বমিতি
ততো হৈব বিদাঞ্চকার ব্রহ্মেতি।"—কেনোপনিষৎ

সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার এইরূপ মূর্ত্তি ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে ঃ—

"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে
হিরণ্য-শ্মশ্রু-হিরণ্য-কেশ—আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।"

আদিত্যের অভ্যন্তরে যে দেব দৃষ্ট হন তাঁহাকে আদিত্য দেব কহে। তিনি জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ, তাঁহার নখাগ্র হইতে সমস্ত শরীর শ্মশ্রু, কেশ পর্য্যন্ত সমস্তই হিরণ্ময় অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়।

পরের শ্রুতিতে দেখান হইয়াছে, এই আদিত্যদেব ও অক্ষি-মধ্যস্থ যে পুরুষ দৃষ্ট হন উভয়েই এক ব্রহ্ম।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায়ও আছে—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

"জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিকে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়াদ্বারা প্রকাশিত হই।"

ঈশ্বরের মূর্ত্তি ধারণ সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা ইহার পরে করা যাইবে।

ঈশ্বরের মূর্ত্তিচিন্তা স্বাভাবিক।

উপাসনার জন্য ঈশ্বরের এইরূপ কোন মূর্ত্তি চিন্তা অত্যন্ত স্বাভাবিক, কারণ মানুষের মন এরূপভাবে গঠিত যে তাহা এইরূপ একটি সাকার অবলম্বন চায়। এ সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা পরে করা যাইতেছে। যে সকল ধর্ম্মে এরূপ সাকার অবলম্বন ( symbol ) এর ব্যবস্থা নাই, সেখানে মানুষ একটা সাকার অবলম্বন কল্পনা করিয়া লয়। রাজা রামমোহন রায় লিখিয়াছেন :—

উপাসনার জন্য ঈশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা স্বাভাবিক

"এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেক কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন।" অনুষ্ঠান ১৫—১৬ পৃষ্ঠা।

নিরাকারবাদিগণের আপত্তি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "সাকার ও নিরাকার" প্রবন্ধে ( এই পুস্তকের সমালোচনায় ) লিখিয়াছেন,—

"মুসলমানেরা মূর্ত্তি পূজা করে না, অথচ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভক্ত কেহ নাই, বা কখনও জন্মেন নাই এ কথা বিশ্বাস্য নহে। কি করিয়া যে তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় তাহা যতীন্দ্রমোহন বাবু না বুঝিতে পারেন, কিন্তু মূর্ত্তি পূজা করিয়া নহে এ কথা নিশ্চয়।



"নানক যে জগতের ভক্তশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন নহেন তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিবেন না। তিনি যে সোঽহং ব্রহ্মবাদী ছিলেন না ইহাও নিঃসন্দেহ। তিনি যে প্রচলিত মূর্ত্তি-উপাসনা বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ইহার একটি বই কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিশ্চয় তিনি নিরাকার উপাসনায় চরিতার্থতা লাভ করিতেন এবং মূর্ত্তি উপাসনায় তাঁহার ব্যাঘাত করিয়াছিল।"—আধুনিক সাহিত্য।

বুদ্ধদেব মহম্মদ নানক প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণের নিজ নিজ সাধনের জন্য মূর্ত্তির ন্যায় কোন অবলম্বনের আবশ্যকতা না থাকিতে পারে, সম্ভবতঃ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের জন্য যে যে উপাসনা প্রণালীর ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাদ্বারা তাহাদের হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হয় কিনা সন্দেহ। অনেক সিদ্ধ মহাত্মা ত তাঁহাদের উপাসনারই আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে ঈশ্বরোপাসনার কোন উপদেশ দিয়া যান নাই। অথচ তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিগণ তাঁহাকেই ঈশ্বরের স্থানে বসাইয়া তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্টও ঈশ্বরের মূর্ত্তিপূজা নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মাবলম্বিদিগের মধ্যে অন্ততঃ একটি বৃহৎ সম্প্রদায় ( রোম্যাণ ক্যাথোলিক ) যীশু ও তাঁহার মাতা মেরীর মূর্ত্তি অথবা চিত্রের যে প্রকার পূজা করেন, তাহা হিন্দুদিগের দেবমন্দিরে মূর্ত্তিপূজা অপেক্ষা কোন অংশে কম "পৌত্তলিক" নহে। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা উচ্চাধি-

আপত্তি খণ্ডন

কারী “সুফী” সম্প্রদায়ভুক্ত, শুনিতে পাই তাঁহাদের সঙ্গে হিন্দু-
সন্ন্যাসিদিগের সাধনার অনেক সাদৃশ্য আছে। মুসলমানগণ
ঈশ্বরের বাহিরের মূর্ত্তিকে ঘৃণা করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু উপাসনার
সময় তাঁহারা ঈশ্বরকে যখন ব্যক্তিভাবে ( Personal God )
উপাসনা করেন, তখন মনে মনে তাঁহার অনন্ত মহিমা ও গুণের চিন্তা
অবশ্যই করিতে হয়; আর তিনি যে ভক্তের সঙ্গে কথা বলেন
ও ভক্তকে দেখা দেন ইহা কোরাণেও আছে।* সুতরাং
ঈশ্বরের আকার কল্পনার বাকী থাকিল কি? মুসলমান সাধকগণ
হিন্দুদের ন্যায় মালাজপাদি করিয়া থাকেন, এবং কোন
কোন সাধক হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন। আবার সাধারণ
শ্রেণীর মুসলমান কোন কোন প্রদেশে হিন্দুদের দেবতার স্থানে পূজা দিয়া থাকেন এরূপ দেখা যায়। মানব মাত্রেরই

ঈশ্বরকে মূর্ত্তরূপে দেখিবার জন্য মানবচিত্তের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা চাপিয়া রাখা যায় না

ভগবানকে মূর্ত্ত রূপে ( concrete form )এ দেখিবার যে একটা
স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা জোর করিয়া চাপিয়া রাখিলে
অন্য ভাবে ফুটিয়া উঠে, এই সত্যটিও ইহাদ্বারা প্রমাণিত

* "When Moses arrived near it ( fire ) a Voice came from the right xtremity of the valley, at a holy place, from the tree, which said—O Moses, verily I am the Allah, the Lord of both the worlds. When Moses arrived according to promise, and his Lord spoke to him, lhe prayed,—'O lord, show me your vision, so that I may see you.'—Allah replied—'you cannot see me ( with your external eyes ); but eook at this mountain, if it can stand at its place. You shall be able to see me.' When Lord manifested Himself on the mountain, it was shattered to pieces, and Moses fell down senseless."——*What is man?* by Sha Mohammad Badi-ul-alam. PP. 208—9.



হইতেছে। গুরু নানক হয়ত একজন উচ্চাঙ্গের সাধক ছিলেন
বলিয়া কোন সাকার অবলম্বনের আবশ্য-
কতা স্বীকার করিতেন না, ( আবার কেহ
কেহ বলেন তিনি অদ্বৈতবাদী ছিলেন,

তাহার প্রমাণ শিখদের গুরুদ্বারে পৌত্তলিকতা

সেজন্য উপাসনার আবশ্যকতা তাঁহার ছিল না ) কিন্তু তাঁহার
প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বিগণ কিরূপে তাঁহার উপদেশ পালন করিতে-
ছেন, তাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনচরিতে দেখা
যায়।

“শিখদের এই মন্দিরে ( গুরুদ্বার-অমৃতসর ) কোন প্রতিমা নাই।
নানক বলিয়া গিয়াছেন যে ‘থাপিয়া না যাই, কীতা না হোই, আপি আপ
নিরঞ্জন সোই।’—তাঁহাকে কোথায়ও স্থাপন করা যায় না, কেহ তাঁহাকে
নির্ম্মাণ করিতে পারে না, তিনিই সেই স্বয়ম্ভূনিরঞ্জন। কিন্তু আশ্চর্য্যের
বিষয় এই যে, নানকের সেই সমস্ত মহৎ উপদেশ পাইয়াও, শিখেরা
নিরাকার ব্রহ্মোপাসক হইয়াও, সেই গুরুদ্বারার সীমানার মধ্যে,
এক প্রান্তে শিবমন্দির স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছে। ইহারা কালী দেবীকেও
মানিয়া থাকে। ‘পরব্রহ্ম জ্ঞান করিয়া সৃষ্ট কোন বস্তুর আরাধনা
করিব না’ এই ব্রাহ্ম প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা কাহারও পক্ষে বড়
সহজ নহে। দোলের সময় এই মন্দিরের মধ্যে বড় উৎসব হয়।”*
গুরুদ্বার মন্দিরে কোন দেবতার প্রতিমূর্ত্তি নাই বটে, কিন্তু শিখ-
দিগের “গ্রন্থ সাহেব” সেই দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছেন
যথা——

“একটা সেতু দিয়া সেই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম তাহার সম্মুখে
একটা বিচিত্রবর্ণ রেশমের বস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ স্তূপাকৃতি হইয়া গ্রন্থ সকল

* মহর্ষির আত্মজীবন চরিত—১৫৩ পৃষ্ঠা।

রহিয়াছে। মন্দিরের একজন প্রধান শিখ তাহার উপর চামর ব্যজন করিতেছে।——আমি আবার সন্ধ্যার সময় মন্দিরে গেলাম। দেখি যে তখন আরতি হইতেছে, একজন শিখ পঞ্চ প্রদীপ লইয়া গ্রন্থের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আরতি করিতেছে। অন্য সকল শিখেরা দাঁড়াইয়া যোড়করে তাহার সঙ্গে গম্ভীর স্বরে পড়িতেছে—"গগন মে থালরবি চন্দ্রদীপক বনে, তারকা মণ্ডলো জোঁকো মোতি" ইত্যাদি—

গুরু নানক হয়ত কখনও স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই যে তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে এইরূপ পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিবে। মানব-মন যে স্বভাবতঃ পৌত্তলিকতা-প্রবণ এ সত্যটি বোধ হয় তাঁহার জানা ছিল না।

রাজা রামমোহন রায়ের মতে নিম্নাধিকারীর জন্য প্রতিমা পূজার আবশ্যকতা।

রাজা রামমোহন রায় কিন্তু নিম্নাধিকারীর জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কবিতাকারের সহিত বিচারে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন—"নিত্য উপাধিশূন্য সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরেতে মনকে স্থাপন করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ হয় সে শব্দের দ্বারা কিম্বা অবয়বের কল্পনা দ্বারা অথবা প্রতিমা দ্বারা যথাক্রমে উপাসনা করিবেক" (মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভাষ্যধৃত বচনের অনুবাদ)। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে রাজা নিজে হরিহরাচার্য্য ব্রহ্মচারীর নিকট তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তদনুরূপ সাধন করিতেন। একবার রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরীর হলে তাঁহার স্মৃতিসভায় মাননীয় হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত স্যর জন উড্‌রফ্ সাহেব সভাপতি রূপে এই কথা



ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সেই সভাস্থ ব্রাহ্মগণ কেহ সে কথার প্রতিবাদ করেন নাই। তবে তাঁহার জীবনচরিতকার ৺নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় এ কথার উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করেন নাই।

রাজা রামমোহন রায় নিম্নাধিকারীর জন্য সাকার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল ইহা স্বীকার করেন না। তিনি তাঁহার "বাঙ্গালীর দুর্গোৎসব" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পালের মতে উচ্চাধিকারীরও আবশ্যকতা

"সমাধিভঙ্গে সাধকের বহিরিন্দ্রিয় চেষ্টার পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে সমাধিতে তিনি যে তত্ত্ববস্তুর সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন, তাহার আমেজ মাত্র প্রাণে থাকে, কিন্তু আর সে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অপ্রতিহত ভাবে উজ্জ্বল রহে না। এ অবস্থায় সাধক, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধরা যায় না, তাহাকেই ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠেন। সমাধিতে যে বিশ্ববিমোহন রূপ দেখিয়া তাঁহার অন্তরের রসসিন্ধু উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই অলখ নিরঞ্জন রূপকেই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন। ইহাই সাধকের বিরহের অবস্থা। আর এই ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের ব্যবধান নষ্ট করিয়া যাঁহার রূপ চোখ দিয়া দেখা যায় না, তাঁহাকেই চোখ দিয়া ধরিয়া মনপ্রাণের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য, অরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহার রূপ কল্পিত হইয়া থাকে। ইহাই "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা"—সাধকদিগের হিতের জন্য অরূপ ব্রহ্মের রূপ কল্পিত হয়, এই প্রচলিত শ্লোকের প্রকৃত অর্থ বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই আমাদের প্রতিমাপূজা নিম্ন অধিকারীর জন্য বিহিত হইয়াছে একথা

স্বীকার করিতে পারি না। যে তাহাকে জানে না সে তাহার রূপের কল্পনা করিবে কিরূপে ?"*

শ্রীযুক্ত বিপিন বাবু বলিতেছেন উচ্চতম সাধক তাঁহার সমাধি ভঙ্গে "সেই অলখ নিরঞ্জন রূপকেই সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠেন।" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের কবিতায় পৌত্তলিকভাব

সমাধি দ্বারা অরূপ, অরস, অগন্ধ, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন কিনা জানি না, কিন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতায় ঈশ্বরকে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভোগ করিবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা স্পষ্টরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে :——

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ। * * * *
* * * * * ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ র'বে তার মাঝ খানে।
মোহ মোর মূর্ত্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে দলিয়া।"

---

"তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে
এস গন্ধবরণে, এস গানে।

* "সাহিত্য"—আশ্বিন ১৩২৯



এস অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এস চিত্তে সুধাময় হরষে
এস মুগ্ধ মুদিত দুনয়নে।
তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে।"—গীতাঞ্জলি

---

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।
কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয়পুর
আমার মধ্যে তোমার শোভা,
এমন সুমধুর।"—গীতাঞ্জলি

রবীন্দ্র নাথ চিরজীবন "অশব্দ-মস্পর্শ-মরূপ-মব্যয়ম্"এর সাধনা করিতে করিতে বিবেক-বৈরাগ্য-লব্ধ নির্ব্বাণ-মুক্তির পথ যে তাঁহার জন্য নহে, ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া, অরূপের রূপ সাধনার রাগিণীতে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী বাঁধিয়া তাহার সুরে জগৎ মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায় রূপের আকাঙ্ক্ষা মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। এ দেশের সাধকগণ আর্টের সাহায্যে সেই আকাঙ্ক্ষার পুষ্টিসাধন করিয়া ভগবদারাধনার এক উৎকৃষ্ট পথ আবিষ্কার করিয়াছেন। নিরাকারবাদিগণ তাহার প্রকৃত অর্থ না

বুঝিয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অনুকরণে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। বড়ই সুখের বিষয় এখন তাঁহারা আবার ক্রমে পথে আসিতেছেন। এবার নিরাকারবাদিগণের উপাসনা কি প্রকার তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

## নিরাকারবাদীর উপাসনা কিরূপ ?

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, নিরাকারবাদিগণ নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। রাজা রামমোহন রায় তাঁহার "অনুষ্ঠান" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

রাজা রামমোহন রায়ের কৃত উপাসনা-প্রণালী

"১ শিষ্যের প্রশ্ন।—কাহাকে উপাসনা কহেন ?

১ আচার্য্যের প্রত্যুত্তর।—তুষ্টির উদ্দেশে যত্নকে উপাসনা কহা যায়, কিন্তু পরব্রহ্ম বিষয়ে জ্ঞানের আবৃত্তিকে উপাসনা কহে।

২ প্রশ্ন।—কে উপাস্য ?

২ উত্তর।—অনন্ত প্রকার বস্তু ও ব্যক্তি সম্বলিত অচিন্তনীয় রচনাবিশিষ্ট এই জগৎ ও ঘটিকা-যন্ত্র অপেক্ষাকৃত অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত রাশিচক্রে বেগে ধাবমান চন্দ্রসূর্য্যগ্রহনক্ষত্রাদি যুক্ত এই যে জগৎ, ও নানাবিধ স্থাবর জঙ্গম যাহার কোন এক অঙ্গ নিষ্প্রয়োজন নহে সেই সকল শরীর ও শরীরীতে পরিপূর্ণ যে এই জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা যিনি তিনি উপাস্য।

* * * * * * * *



৬ প্রশ্ন।—বেদে কোন স্থানে সেই পরমেশ্বরকে অগোচর অনির্দ্দেশ্য শব্দে কহিয়াছেন, এবং অন্যত্র জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহার সমাধান কি ?

৬ উত্তর।—যেস্থলে অগোচর অজ্ঞেয় শব্দ কহেন সেস্থলে তাঁহার স্বরূপ অভিপ্রেত হইয়াছে, এবং তাঁহার স্বরূপ কোন মতে জ্ঞেয় নহে। আর যে স্থলে জ্ঞেয় ইত্যাদি শব্দ কহেন সে স্থলে তাঁহার সত্তা অভিপ্রেত হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আছেন ইহা বিশ্বের অনির্ব্বচনীয় রচনা ও নিয়মের দ্বারা নিশ্চয় হইতেছে। যেমন শরীরের ব্যাপারের দ্বারা শরীরস্থ চৈতন্য যাঁহাকে জীব কহেন তিনি আছেন ইহা নিশ্চয় হয়, কিন্তু সেই সর্ব্বাঙ্গব্যাপী ও শরীরের নির্ব্বাহক জীবের স্বরূপ কি, অর্থাৎ সেই জীব কি প্রকার হন, ইহা কদাপি জানা যায় না।

* * * * * * * *

৯ প্রশ্ন।—কি প্রকারে এ উপাসনা কর্ত্তব্য হয় ?

৯ উত্তর।—এ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান যে জগৎ ইহার কারণ ও নির্ব্বাহকর্ত্তা পরমেশ্বর হন, শাস্ত্রত ও যুক্তিত এইরূপ যে চিন্তন তাহা পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। ইন্দ্রিয়-দমনে ও প্রণব-উপাসনাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করা এ উপাসনার আবশ্যক সাধন হয়।"

রাজা রামমোহন রায়ের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ অজ্ঞেয়, তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ও নির্ব্বাহকর্ত্তা, জগতে তাঁহার কার্য্য-চিন্তাই তাঁহার উপাসনা। তিনি পরমেশ্বরের ধ্যানাদির কথা কিছু বলেন নাই। ইন্দ্রিয়-দমন ও বেদাভ্যাস উপাসনার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান।

রাজা রামমোহন রায়ের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপনিষদ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম পুস্তক সঙ্কলন করেন। তিনি ব্রহ্মোপাসনায় যে মন্ত্র সংগঠন করেন তাহা পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। এইমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মের স্তব, ও তাঁহার গুণকীর্ত্তন ব্রহ্মোপাসনার প্রধান অঙ্গ বলিয়া স্বিরীকৃত হয়। পরে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন উপাসনার মধ্যে নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি প্রবর্ত্তিত করেন, যেমন—ঈশ্বরের চিন্তা, ধ্যান, যোগসাধন, অবলোকন, নিরীক্ষণ, বিশেষ দর্শন ইত্যাদি। তাঁহার কৃত "ব্রহ্মগীতোপনিষৎ" গ্রন্থে এই উপাসনা প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মত

"সাধন কি? নিরাকার যিনি তাঁহাকে কি প্রকারে ধারণ করিব? এখানে ধারণ করিবার বিষয় আছে—এই তিনি এখানে আছেন। নাই নহে—এখানে একজন আছেন এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ হয়। প্রথম তাঁহাকে শুষ্ক রংবর্জ্জিত আকাশের তুল্য গ্রহণ করিতে হয়। এইজন্য তিনি আকাশ নাম পাইয়াছেন—গুণ নাই, বর্ণ নাই, যতদূর আকাশ ততদূর আছেন—এই ভাবটিকে অধিকার করিতে হইবে।"

* * * * *

"আমি ছাড়া একজন ভিতরে চারিদিকে আছেন" এই শব্দ ক্রমান্বয়ে সাধনার্থে আবৃত্তি করিতে হইবে এবং ভাবগুণ বিবর্জ্জিত সত্তা ভাবিতে হইবে। ততবার উচ্চারণ করিবে যতবার ভাব ঠিক না হয়। সাধনের একটী সঙ্কেত এই, ক্ষুদ্র কখনও ব্যাপ্তভাব ধারণ করিতে পারে না,



সংকীর্ণভাবে আবার পৌত্তলিক হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাকাশে স্মরণ, অনন্ত সত্তা জ্ঞানে, ধারণ অন্তস্থানে।"

* * * * *

"সর্ব্বপ্রথমে ঘোরান্ধকার দেখিবে। চিন্তা বা কল্পনা দ্বারা কোন বস্তু নির্ম্মাণ করিবে না। বাহিরে কিছুই নাই—নেতি নেতি এই বলিয়া গাঢ়তম অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ করিবে, ইহা অভাব পক্ষের সাধন।—* * * * * * প্রথমে ঘন অন্ধকার দেখা আবশ্যক। প্রথমে ঘন কাল দ্বারা হৃদয় ছবিকে কাল কর, সেই কাল জমির উপর সত্যস্বরূপকে আঁকিবে। * * * * যোগরূপ তুলী দ্বারা এই অন্ধকারে ব্রহ্মের স্বভাব, ব্রহ্মের স্বরূপ, মূর্ত্তি আঁক—কিন্তু এই আঁকিলে আর চিহ্ন নাই। এই ঈশ্বরের অভিপ্রায়। অন্ধকারের ভিতর নিরাকার সাধন, তাহা না হইলে সাকার পূজা হয়, অতি সংকীর্ণ স্থানে ব্রহ্মের মূর্ত্তি, ঘোর অনন্ত অন্ধকারের এক ক্ষুদ্রতর স্থানে ব্রহ্মের স্বরূপ উদ্ভাসিত হইল আবার তাহা বুদ্বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।"

* * * * *

এই অন্ধকারের ভিতর ঈশ্বরকে ডাকিতে হয়, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর, এই বলিয়া ডাকিতে হয়। ডাকৃতে ডাকৃতে "আমি আছি" এই একটী গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিবে। * * * * সমুদয় অন্ধকার কথা কহিতেছে। * * * * যখন অন্ধকার ব্যক্তিতে পরিণত হইল, তখন সাধক সেই পুরাতন মন্ত্র বারবার পাঠ করিতে লাগিলেন 'তুমিই সত্য' 'তুমিই সত্য' 'তুমিই সত্য' * * * * আর মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতে লাগিল এই গম্ভীর ধ্বনি "আমি আছি", সমস্ত অন্ধকার জীবন্ত হইল, * * * * একটী প্রকাণ্ড অন্ধকার একটী প্রকাণ্ড পুরুষ হইল।"

এই অন্ধকারের সাধনা রূপক কি না বুঝিতে পারি না, যদি ইহা রূপক হয় তবে ইহা প্রকৃত ঈশ্বর দর্শন নহে, আর যদি

রূপক না হইয়া ইহা সত্যদর্শন ও অনুভূতি হয় তবে ইহা অবশ্যই সাকার চিন্তা। যে অন্ধকার জীবন্ত পুরুষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন ও কথা কহেন তিনি যদি সাকার না হইবেন, তবে সাকার মূর্ত্তির কোন অর্থ নাই।

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁহার "ব্রাহ্মধর্ম্ম শিক্ষা" পুস্তকে "উপাসনা কাহাকে বলে?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন,

শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের মত

"ঈশ্বরকে কাছে জানিয়া, তাঁহার সহিত কথা বলা, ইহাকেই উপাসনা বলে। উপাসনা করিতে গিয়া আমরা কি করি? প্রথমতঃ ঈশ্বর যে আমাদের কাছে আছেন, ইহা স্থিরভাবে অনুভব করিতে চেষ্টা করি, ইহাকে বলে ধ্যান। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বরকে গুণের কথা বলি। তিনি যে জগতের কর্ত্তা, তিনি যে সব জানেন, তিনি যে সকলকে ভালবাসেন, তিনি যে পবিত্র এই সকল কথা তাঁহাকে বলি। বলাতে মনে ভক্তির উদয় হয়। ইহাকে বলে আরাধনা। তৃতীয়তঃ আমরা তাঁহাকে বলি যে তিনি আমাদিগকে ভাল করুন, সত্যবাদী করুন, প্রেমিক করুন ইত্যাদি, এইরূপ তাঁহার কাছে কিছু চাওয়াকে বলে প্রার্থনা। ধ্যান, আরাধনা ও প্রার্থনা এই তিনটীকে উপাসনার অঙ্গ বলে।"

এরূপ উপাসনা অত্যন্ত সাধারণ ভাবের উপাসনা। আমাদের সাকার উপাসনায়ও এই কয়টি অঙ্গ আছে, ধ্যান আছে, গুণকীর্ত্তন বা স্তব আছে, প্রার্থনা আছে, এতদ্ভিন্ন জপাদি আছে। নিরাকার উপাসকের ধ্যান অর্থে—ঈশ্বর আমার কাছে আছেন এইরূপ চিন্তা, আমাদের ধ্যান অর্থে ঈশ্বরের মূর্ত্তিবিশেষের ধারাবাহিক রূপে চিন্তা, বলা বাহুল্য ইহা দ্বারাই চিত্তের



একাগ্রতা ও প্রেমভক্তি জন্মিয়া উপাসনার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। সেই মূর্ত্তিচিন্তার সাহায্যের জন্য প্রতিমাদির প্রয়োজন হয়, প্রতিমা না হইলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু নিরাকার উপাসক ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তি চিন্তা করেন না। সীতানাথ বাবু তাঁহার "ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা" পুস্তকে ঈশ্বরকে "পূর্ণ প্রেম ও পূর্ণ পবিত্রতা সমন্বিত জ্ঞানবস্তু" রূপে প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা লিখিয়াছেন। তাহা যে মানসিক অবস্থাবিশেষ নহে, ইহা বুঝাইতে গিয়া বলেন,—

যদি কেহ বলেন এই অবস্থায় আমরা কেবল আমাদের আত্মার একটা বিশেষ অবস্থা মাত্র জ্ঞাত হই, "ইহার উত্তর এই যে কেবল কৈবলবিজ্ঞান বলিয়া কোন বিষয় নাই, 'বিজ্ঞান-সমন্বিত' আত্মাই সমস্ত বিষয়টা, তেমনি 'কেবল অবস্থা', পূর্ণ প্রেমপবিত্রতার কেবল অবস্থা বলিয়া কোন বিষয় নাই, আমরা একমুহূর্ত্তে যাহা প্রত্যক্ষ করি, তাহা একটা অবস্থা মাত্র নহে, তাহা একটি জীবন্ত আত্মা পূর্ণপ্রেমপবিত্রতা-সমন্বিত একটি পরম পুরুষ।"

নিরাকারবাদীর পরমপুরুষের উপাসনা নিরাকার উপাসনা নহে, সাকার উপাসনা

আমি ইহার পরের অধ্যায়ে দেখাইব, 'প্রেম পবিত্রতাময় একটি পরম পুরুষ' চিন্তা করিতে হইলেই তাঁহাকে সাকাররূপে চিন্তা করিতে হইবে। আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই, যাহাদ্বারা আমরা নিরাকার পরম পুরুষের চিন্তা করিতে পারি।

---

# চতুর্থ অধ্যায়

## সগুণ উপাসনা ও সাকার উপাসনায় প্রভেদ কি ?

উপাসনায় অবলম্বনের প্রয়োজন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে নিরাকারবাদিগণের সগুণোপাসনা কি প্রকার তাহা কতকটা দেখিয়াছি। নিরাকারবাদিগণ সাকারবাদীর ন্যায় ঈশ্বরকে একজন ব্যক্তি ( Personal God ) বলিয়া উপাসনা করেন। আবার সেই উপাসনার জন্য একটা অবলম্বনের প্রয়োজন একথাও স্বীকার করেন। রাজা রামমোহন রায় "এই প্রত্যক্ষ পারিদৃশ্যমান জগৎ" অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন কখনও বাহিরের "আকাশ" কখনও অন্তরে "অন্ধকার" অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিতে বলেন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ সাধকের হৃদয়ে ঈশ্বরকে "পূর্ণ প্রেম পবিত্রতা সমন্বিত একটী পরম পুরুষ" রূপে ধ্যান করিতে বলেন। ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন—

*নিরাকারবাদিগণের মতে ও উপাসনায় অবলম্বনের প্রয়োজন*

"নিরাকারবাদীর কি অবলম্বন নাই। এ কথা কে বলে? সাকার-বাদীর অবলম্বন ক্ষুদ্র একটী প্রতিমূর্ত্তি, নিরাকারবাদীর অবলম্বন অখিল ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ। * * * * * শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী সতীর পবিত্র প্রেমে, ভক্তজনের ভক্তিরঞ্জিত



মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা দেখে নাই, সে কিছুই দেখে নাই। সকলই তাঁহার পূজার আয়োজন।" *

এখন কথা হইতেছে, ঈশ্বরকে যদি একজন ব্যক্তি ভাবিয়া উপাসনা করা হয় তবে তাঁহাকে নির্গুণ ভাবেই চিন্তা করিব না সগুণ ভাবে চিন্তা করিব? আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি নিরাকারবাদিগণও তাঁহাকে নির্গুণভাবে চিন্তা করিতে বলেন না, সগুণ ব্রহ্মই তাঁহাদের উপাস্য। তাঁহাকে যদি একজন সগুণ ব্যক্তি বলিয়া চিন্তা করিতে হয়, তবে তাঁহার কোন একটা আকার চিন্তা করা আবশ্যক কি না? সগুণ ব্রহ্ম সাকার কি না?

*সেই অবলম্বন ঈশ্বরের পুরুষরূপ (Personal God)*

নিরাকারবাদী বলিবেন, আমরা জগতে তাঁহার গুণ চিন্তা করিয়া তাঁহার উপাসনা করি—তাঁহাকে চিন্তা করি না। ঈশ্বরকে চিন্তা না করিয়া ঈশ্বরোপাসনা কিরূপ? সকলে এইমত সমর্থন করিবেন না, কারণ এইপ্রকার উপাসনা ধন্যবাদ দেওয়ার মত নিতান্ত বহিরঙ্গ উপাসনা—নিতান্ত বাহিরের বস্তু। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত অন্তরে অন্তরে মিলিত হইতে চান, তাঁহাদিগের ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতেই হইবে। এইজন্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে অন্তরে "অন্ধকার" রূপে চিন্তা করিতে করিতে সেই অন্ধকার হইতে

* সাকার ও নিরাকার উপাসনা—১১ পৃষ্ঠা।

প্রকাশিত "একটী প্রকাণ্ড পুরুষ" রূপে ধ্যান করিতেন। আবার সীতানাথ বাবুও তাঁহাকে হৃদয়ে "প্রেম পবিত্রতা সমন্বিত একটি জীবন্ত পরমপুরুষ" রূপে ধ্যান করিতে বলেন।

পুরুষরূপী ঈশ্বরের উপাসনা সাকারোপাসনা না নিরাকারোপাসনা ?

নিরাকারবাদী যদি ঈশ্বরকে এইরূপ একটি "পুরুষ" রূপে ধ্যান করেন, তবে তিনি ঈশ্বরের কোন সাকার মূর্ত্তি চিন্তা করেন কি না ? আর যাঁহারা বাহিরে ঈশ্বরকে "ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ" অবলম্বনে উপাসনা করেন, তাঁহারাও সাকার চিন্তা করেন কি না ?

সগুণ ঈশ্বরের চিন্তা সাকার চিন্তা।

আমি দর্শন শাস্ত্র সাহায্যে প্রমাণ করিব যে তাঁহারা সকলেই সাকার চিন্তা করেন, এবং মুখে স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের সগুণোপাসনা প্রকৃত পক্ষে সাকারোপাসনা।

## মানুষের জ্ঞান নিরাকার না সাকার ?

এই প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা দেখিতে পাই, জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আমরা কখন জীবাত্মার কল্পনাও করিতে পারি না। জন্মাবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত আত্মা জড় শরীরে আবদ্ধ ও চতুর্দ্দিকে জড়জগৎ দ্বারা বেষ্টিত থাকে, মৃত্যুর পরেও জীবাত্মা পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ করিবার জন্য সূক্ষ্মশরীরে আবদ্ধ থাকে। আর যদি নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, তবে সে আত্মা



আর মানুষের আত্মা থাকে না, ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। সুতরাং

মানুষের ঈশ্বর বিষয়ক জ্ঞান শুদ্ধ চৈতন্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে না, জগতের জ্ঞানের সহিত মিলিত ভাবে হইবে।

আমাদের জীবাত্মা জড়জগৎ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না থাকাতে, আমাদের যে জ্ঞান, তাহা কখনও জড়জগৎ সম্বন্ধীয় ভিন্ন শুদ্ধ চৈতন্য সম্বন্ধীয় হইতে পারে না, নিরাকারবাদী শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁহার ইংরেজী "ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা" পুস্তকে লিখিয়াছেন, এমন কি আমাদের আত্মার জ্ঞানও জগতের জ্ঞানের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে হইতে পারে না :—

"Self consciousness is impossible without object consciousness. Self cannot be known unless some object or other is known with it."

যাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট আত্মজ্ঞানের অর্থ অন্যরূপ হইলেও, আমাদের সাধারণ জ্ঞান এইরূপই বটে। জগৎ বাদ দিয়া কখনও আমাদের জ্ঞানের কার্য্য হইতে পারে না। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ( subject and object ) বুঝায়। প্রত্যেক জ্ঞানের ক্রিয়াতে জীবাত্মা অন্য আর একটি বস্তু জানে, আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজকেও জানে। সেই জ্ঞানের বস্তু কিরূপ সাকার না নিরাকার ?

পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে Emperical School বলেন আমাদের যত কিছু জ্ঞান হয় সকলই ভূয়োদর্শন ( ex-

perience ) দ্বারা। ইঁহাদের মতে জড়জগৎ হইতেই আমাদের জ্ঞানের আরম্ভ। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মন (mind) জড় জগতের চিত্র সকল (images) সংগ্রহ এবং আত্মসাৎ (assimilate) করে।

Emperical School এর মত

সেই সকল চিত্র কল্পনা (imagination), স্মৃতি (memory), বিচার (judgment), বুদ্ধি (reason) এই সকল মানসিক বৃত্তির সাহায্যে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান জন্মায়। ইঁহাদের মতে সূক্ষ্ম সাধারণভাব (general ideas) ও গুণবাচকভাব সকল (abstract ideas) আমাদের বস্তুবাচক ও ব্যক্তিবাচক (individual and concrete) জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। "সৌন্দর্য্য" একটি গুণ-বাচক ভাব। ইহার জ্ঞান আমাদের কি প্রকারে হইল? না, নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সাকার সুন্দর পদার্থ দেখিয়া বা শুনিয়া, যথা সুন্দর ফুল, সুন্দর ছবি, সুন্দর সঙ্গীত। "প্রেম" একটি সাধারণ ভাব (general idea)। ইহার জ্ঞান আমাদের কিরূপে হইল? কোন কোন বিশেষ বিশেষ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখিয়া বা শুনিয়া,—যেমন রামের প্রতি তাহার স্ত্রীর প্রেম, গোপালের প্রতি তাহার বন্ধুর প্রেম, শ্যামের ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, এই সকল ব্যক্তির বিভিন্ন রকম প্রেম, এক একটি ভিন্ন ভিন্ন বিশেষ বিশেষ সাকার ঘটনা (image or picture) দ্বারা জানা গিয়াছে। সুতরাং আমাদের সৌন্দর্য্য ও প্রেমের জ্ঞান ভূয়োদর্শন হইতে উৎপন্ন।



অন্য সম্প্রদায় (Intuitional School) বলেন, আমাদের সকল জ্ঞানই সাকার জড় জগৎ হইতে উৎপন্ন, কেবল কয়েকটি সাধারণ ভাব (Ideas) আমাদের সহজাত। তাহা এই, দেশ কাল ও কার্য্যকারণ ভাব (Ideas of space, time, cause and effect); গণিতের স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা সকল (axioms of mathematics); পাপ ও পুণ্যের ভাব (Ideas of right and wrong); ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ও আত্মার অবিনশ্বরত্ব সম্বন্ধীয় ভাব (Ideas of God and immortality of Soul); * ইঁহারা বলেন এই সকল ভাব আমরা জড়জগৎ হইতে পাই না, এবং জড়জগতে আমাদের এই সকল বিষয়ের জ্ঞান, আমাদের ইহাদের সম্বন্ধীয় সহজাত ভাব হইতে উৎপন্ন। হিন্দুরাও Intuitional School এর এই মত স্বীকার করিতে কোন আপত্তি করিতে পারেন না, কারণ তাঁহারা জীবাত্মার পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন। কিন্তু এ স্থলে ভাব (idea) ও জ্ঞান (knowledge) এই দুইটির পার্থক্য বুঝিতে হইবে। মনে কর "ঈশ্বর আছেন" এই একটি ভাব (idea) বা সংস্কার আমার

Intuitional School এর মত

---

* While the great mass of our Knowledge is obviously attained in the course of our experience of the world it is consented by some Philosophers that certain elements exist in the mind, at birth,as for example, our ideas of space and time and cause ; the axioms of mathematics ; the distinction of right and wrong ; the ideas of God and immortality"——*Bain's mental and moral Science*

মনে শৈশব হইতেই আছে, যখন আমার জ্ঞান হয় নাই, আমি অজ্ঞান শিশু ছিলাম, যখন আমি কোন বস্তুর বিচার করিতে পারি নাই, তখনও ইহা আমার মনে সংস্কার অবস্থায় ছিল। *

কিন্তু যখন আমার জ্ঞান হইল, যখন আমি এক বস্তু হইতে অন্যবস্তু চিনিতে পারিলাম, তখন এই সংস্কার জড়জগতের সাহায্যে পরিস্ফুট হইয়া, আমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানে পরিণত হইল।

সংস্কার ও জ্ঞানের পার্থক্য

অতএব ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কয়েকটি ভাব ( যেমন তাঁহার অস্তিত্ব প্রভৃতি ) যেন আমার স্বভাবজাত বলিয়া মানিলাম কিন্তু আমাদের এই সকল ভাবের যে জ্ঞানে বা ধারণায় পরিণতি, তাহা ভূয়োদর্শনের ( experience ) দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে তাহাতে কোন সংশয় নাই। এখন, ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব বা সংস্কার নিরাকার হইলেও,

* শৈশবে আমাদের কোনজ্ঞান জন্মে না, এ সম্বন্ধে Herbert Spencer বলেন,—"In brief, a true cognition is possible only through an accompanying recognition, and hence there can be no cognition proper; the reply is that cognition proper arises gradually, that during the first state of incipient intelligence, before the feelings produced by intercourse with the outer world have been put into order, there are no cognitions strictly so called; and that as every infant shows us, these slowly emerge out of the confusion of unfolding consciousness as fast as the experiences are arranged into groups—as fast as the most frequently repeated sensations and their relation to each other become familiar enough to admit of their recognition as such an such, whenever they occur."——*Frist Principles.* Vol. 1. Page 80.

এই কথায় বোধ হয় কোন Intuitionalist আপত্তি করিতে পারেন না।



ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান বা ধারণা যে নিরাকার তাহা কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি ভাব বা সংস্কার; তাহা নিরাকার যেন মানিলাম, কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব চিন্তা করিতে হইলে, যে আমি নিরাকার পদার্থের চিন্তা করি, তাহা কে বলিতে পারে?

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ভাব বা সংস্কার সকল ( Ideas ) আমাদের সহজাত হইলেও আমরা জগতে তাহাদের প্রকাশ দেখিয়া তাহাদের জ্ঞান লাভ করি। জগৎ বাদ দিয়া আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কোন জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। মনুষ্যদেহও অবশ্য জগতের অন্তর্গত বুঝিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধীয় ( অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ) জ্ঞান আমাদের হইতে পারে না। এ পর্য্যন্ত মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে যত জ্ঞান লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহা এই তিনটি ভাবে সীমাবদ্ধ—তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি জগতের পালনকর্ত্তা এবং তিনি জগতের সংহারকর্ত্তা। এই জগৎ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে মানুষ ঈশ্বরকে জানিতে পারে না, যদি পারে ও যখন পারে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না, তাহার তখনকার জ্ঞান আর মানুষের জ্ঞান নহে, তখন সে "অহং ব্রহ্মাঽস্মি" "আমি ব্রহ্ম" হইয়া যায়।

ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাকার জগতের জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত

ব্রহ্মকে যে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং" বলা হয়, তাহাও এই জগতের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া, এই জড়জগৎ হইতে তাঁহার রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, এই বাক্যদ্বারা ইহাই প্রকাশ পায়। জগৎ মিথ্যা—ব্রহ্ম "সত্যং"; জগৎ অজ্ঞান অর্থাৎ মায়াময়—

ব্রহ্ম "জ্ঞানং" অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ; জগৎ শান্ত, ক্ষুদ্র—তিনি "অনন্তম্" ; সুতরাং ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় আমাদের "সত্যংজ্ঞানমনন্তম্" জ্ঞানও জগৎমূলক। পুনশ্চ শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্ম—"অস্থূল মনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত মস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশ মসঙ্গ-মরসমগন্ধমচক্ষুষ্ক মশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্" —অর্থাৎ তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, তরল নহেন, ছায়াযুক্ত নহেন, তমোযুক্ত নহেন, বায়ুযুক্ত নহেন, আকাশযুক্ত নহেন, সঙ্গযুক্ত নহেন, রসযুক্ত নহেন, গন্ধযুক্ত নহেন, চক্ষুযুক্ত নহেন, কর্ণযুক্ত নহেন, বাক্‌যুক্ত নহেন ; তাঁহার মন নাই, তেজ নাই, প্রাণ নাই, মুখ নাই, তাঁহার পরিমাণ নাই। এস্থলেও ব্রহ্মস্বরূপ যে জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু, ইহা জগতের মধ্য দিয়া জগতের সাহায্যে দেখান হইয়াছে। *

* এই জগতে জ্ঞান আছে বলিয়াই আমরা যে ঈশ্বরকে "জ্ঞানময়" বলি, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" পুস্তকে একটা ঘড়ীর দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইয়াছেন। "আমরা তিনটী ঘড়ীর কল্পনা করিব, প্রথম ঘড়ী পৌত্তলিক, দ্বিতীয়টা একেশ্বরবাদী এবং তৃতীয়টা অজ্ঞেয়তাবাদী"। পৌত্তলিক ঘড়ী বলিল—আমাদের যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনি একটা বড় ঘড়ী ; আমাদের যেমন স্প্রিং, চক্র প্রভৃতি আছে, তাঁহারও সেইরূপ আছে। আমরা যেমন সর্ব্বদা টিক্‌টিক্ করিতেছি, তিনিও সেইরূপ করিতেছেন, আমরা যেমন দুইটী কাঁটা দ্বারা সময় ঠিক করিয়া দি, তিনিও সেইরূপ করেন।

"একেশ্বরবাদী ঘড়ী এ কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—এরূপ বলা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, আমাদের যিনি নির্ম্মাতা, তিনি আমাদের মতই ঘড়ী, এইরূপ স্প্রিং প্রভৃতি বিশিষ্ট, ইহা অতি অসঙ্গত কথা, তবে যখন দেখিতেছি যে আমাদের মধ্যে জটিল কৌশল বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন একথা বলিতে হইবে যে, আমাদের নির্ম্মাতার জ্ঞান আছে।



এইরূপে আমরা দেখিলাম, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান জগতের অবলম্বনে ভিন্ন হইতে পারে না, আমাদের জগতের জ্ঞান সাকার বলিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সাকার।

তবে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় একপ্রকার তার্কিক জ্ঞান (theoretical knowledge or speculative knowledge) হইতে পারে, যেমন পুস্তক পাঠে বা তর্ক শুনিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান জন্মে। তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, সে জ্ঞান লইয়া আমরা ঈশ্বরের উপাসনা, তাঁহার ধ্যান, ধারণা করিতে পারি না, ক্যাণ্ট (Kant) এইপ্রকার

কৌশলেই জ্ঞান প্রকাশ পায়, নির্ম্মাতা অবশ্যই জ্ঞানবিশিষ্ট।" আমাদের অজ্ঞেয়তাবাদী ঘড়ীর কথায় কাজ নাই। একেশ্বরবাদী ঘড়ী নিজের মধ্যে "জটিল কৌশল" দেখিয়া মনে করিতেছে "আমাদের নির্ম্মাতা জ্ঞানী।" রূপক ভাঙ্গিয়া বলিলে, আমরা মনুষ্য শরীর ও বহির্জ্জগতে জ্ঞানের কার্য্য দেখিয়া অনুমান করি "ঈশ্বর জ্ঞানময়।" এতদ্ভিন্ন ঈশ্বরের যে জ্ঞান আছে, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই, সুতরাং আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান জগতের উপর প্রতিষ্ঠিত।

আর একটি কথা, প্রকৃতপক্ষে "পৌত্তলিক ঘড়ী" ও "একেশ্বরবাদী ঘড়ী" উভয়েই একরকম যুক্তির আশ্রয় লইয়াছেন। "একেশ্বরবাদী ঘড়ী" মনে করিবেন না যে তিনি এই যুক্তিদ্বারা "পৌত্তলিক ঘড়ীকে" পরাস্ত করিলেন, পৌত্তলিক ঘড়ী যেমন তাহার নির্ম্মাতাতে নিজের স্প্রিং, চক্র, টিক্‌টিক্ শব্দ প্রভৃতি আরোপ করিতেছে, একেশ্বরবাদী ঘড়ীও তেমনই তাহার নির্ম্মাতাতে তাহার নিজের জ্ঞানশক্তির আরোপ করিতেছে। রূপক ভাঙ্গিয়া বলিলে ব্রহ্মস্বরূপে যেমন আকারাদি নাই, তেমন জ্ঞানও নাই, উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের যেমন চক্ষু নাই, কর্ণ নাই, মুখ নাই ইত্যাদি বলিয়াছেন তেমন মন নাই প্রাণ নাই বলিয়াছেন—যাঁহার মন নাই তাহার জ্ঞান কিরূপে থাকিতে পারে? বস্তুতঃ ব্রহ্ম জ্ঞানময় নহেন, জ্ঞানস্বরূপ। যতক্ষণ দ্বৈতজ্ঞান থাকে ততক্ষণ একজন আর একজনকে দেখে, শোনে, জানে। আত্মজ্ঞান হইলে কে কাহাকে দেখিবে, শুনিবে, জানিবে। (বৃহদারণ্যক শ্রুতি দেখ) সেই শ্রুতিবাক্যের অনুবাদ করিয়া পঞ্চদশীকার বলেন,—

জ্ঞানের নাম দিয়াছেন thinking ( ভাবনা ), কিন্তু ইহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাই তাঁহার মতে "Things-in-themselves may be thought, but they can never be known." ( Falckenberg's *History of modern Philosophy*—P—369 )—অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত সত্তা আমরা ভাবিতে পারি, কিন্তু জানিতে পারি না। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে ক্যাণ্টের মতে ব্রহ্মের স্বরূপ আমাদের জ্ঞানের অগোচর।

জগতের জ্ঞান সাকার বলিয়া ঈশ্বরের জ্ঞান সাকার হইবে কেন ?

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান জগতের সহিত মিলিত হইয়া, জগতের অবলম্বনে উৎপন্ন হয় যেন মানিলাম, কিন্তু জগৎ সাকার বলিয়া, জ্ঞান সাকার হইবে কেন ? আর ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞানও জগৎ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহা সাকার হইবে কেন ?

## জড়-জগতে ব্রহ্মজ্ঞান সাকার।

এ সম্বন্ধে nominalist দিগের মত

এক শ্রেণীর ইয়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিত ( nominalists ) বলেন, আমরা স্থূল জগতে জাতিবাচক ( concrete ) বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে অভ্যাস না করিলে, কখনই গুণবাচক ( abstract ) বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারি না। আমাদের

"ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটী দ্বৈত বর্জ্জনাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হিনো।"—১১।১৪

অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞানরূপ ত্রিপুটীবর্জ্জনহেতু কেবল ভূমামাত্র বিদ্যমান থাকেন, প্রলয়েও সেই ত্রিপুটী থাকে না, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপে আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি সেরূপ কিছু নাই, কিন্তু সগুণ ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের জ্ঞান আছে। যেমন জ্ঞান আছে, তেমন আকারও আছে।



গুণবাচক বস্তু চিন্তা করিতে হইলে, সেই জাতিবাচক বস্তুর চিন্তায় অভ্যস্ত না হইলে তাহা পারা যায় না। বৃক্ষত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবার পূর্ব্বে বৃক্ষের জ্ঞান জন্মা আবশ্যক। একটি বালকের জ্ঞান হওয়া অবধি সে বৃক্ষই দেখিতেছে, বৃক্ষত্ব কি সে তাহা প্রথমে বুঝিতে পারে না। যখন তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে, যখন সে নানারকম বৃক্ষ দেখিয়া, তাহাদের সাধারণ গুণ, ভাব বা ধর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, তখনই সে বৃক্ষত্ব কি, তাহা চিন্তা করিতে পারিবে, বৃক্ষত্ব সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান হইবে, এবং পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে হইলেই তাহাকে একটি বিশেষ বৃক্ষ ( individual tree ) চিন্তা করিতে হইবে, বৃক্ষ বাদ দিয়া কখনও সে বৃক্ষত্ব চিন্তা করিতে পারিবে না। * অতএব দেখা গেল, আমাদের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান জাতিবাচক পদার্থের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে, ও তাহা হইতে অভিন্নভাবে অনুভূত হয়, এখন এই জড়জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান, হয়

* "Hence abstraction does not properly consist in the mental separation of one property of a thing from the other properties,—as in thinking of the roundness of the moon apart from the luminosity and apparent magnitude. Such a separation is impracticable, no one can think of a circle without colour and a definite size........."Neither can we have a mental conception of any property abstracted from all others; we cannot conceive a circle except of some colour and some size; we cannot conceive justice except by thinking of just actions."—Bain's *Mental and Moral Science* PP. 177—80. এতদ্ভিন্ন Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Dugald Stewart, Thomas Brown, Hamilton, james, Mill প্রভৃতি অধিকাংশ দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মত সমর্থন করেন। বাহুল্যভয়ে তাঁহাদের মত উদ্ধৃত হইল না। Vide appendix to Bain's *Mental and Moral Science*."

জাতিবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে, না হয় গুণবাচক বস্তুর সহিত মিলিত হইয়া হইবে। এই উভয় প্রকার জ্ঞানই সাকার; সুতরাং জড়জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান সাকার হইবে।

Conceptualistদের মত

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিত (conceptualists) বলেন যে জাতিবাচক পদার্থ চিন্তা না করিয়াও আমরা গুণবাচক পদার্থের চিন্তা করিতে পারি। আমাদের মনে কোন বস্তুর জ্ঞান হওয়ার সময় আগে তাহার জাতি সম্বন্ধে একটা সূক্ষ্মভাব (abstract idea or concept) আমাদের মনে আসে, পরে সেই ভাবটার সাহায্যে আমরা সেই জাতীয় পদার্থ বিশেষকে জানিতে পারি, বৃক্ষত্ব আগে আমাদের মনে উদয় হওয়াতে বিশেষ বৃক্ষকে সেই জাতির অন্তর্গত বলিয়া জানিতে পারি। এই concept বা সূক্ষ্মভাব ক্যাণ্টের schemaর ন্যায়। * schema বিশেষ বিশেষ বস্তু, বিশেষ বিশেষ চিত্র হইতে নিষ্কাষিত একটা সাধারণ চিত্র, যেমন দেশী কুকুর ও নানাদেশীয় বিলাতী কুকুরের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি হইতে নিষ্কাষিত একটা কুকুর মূর্ত্তি। সুতরাং এই concept বা জাতিবাচক পদার্থের সূক্ষ্মভাব নিরাকার নহে, সাকার। তবে ক্যাণ্ট যে concept এর কথা বলিয়াছেন, যাহা বুদ্ধির (understanding) মধ্যে শূন্য অবস্থায় থাকে, এবং বহির্জ্জগতের চিত্র সকল আসিয়া যাহা পূরণ করে, ("Percept without concept is blind

* পরিশিষ্টে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মত বিবৃত হইয়াছে। ক্যাণ্ট, কি প্রকারে উভয় সম্প্রদায়ের মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন তাহা দেখুন।



and concept without percept is empty"), তাহা চিন্তা করা যায় না। হিগেলের মতেও concrete concept আমাদের জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইতেই বিচার (reason) দ্বারা আমরা অনন্ত ঈশ্বরের (absoluteএর) জ্ঞানলাভ করিতে পারি।

যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া লওয়া যায়, যে গুণবাচক পদার্থ সকল (abstract ideas)—যেমন সৌন্দর্য্য, প্রেম, দয়া প্রভৃতি আমরা যখন চিন্তা করি তখন কোন বিশেষ বিশেষ বস্তু চিন্তা না করিয়াও পারি, কিন্তু সেরূপ চিন্তা অতি অল্পলোকেরই সাধ্যায়ত্ত। অধিকাংশ লোকেই সেই সকল গুণবাচক পদার্থ চিন্তা করিতে গিয়া তাহা কোন একটি বিশেষ বস্তুর চিত্রের সহিত visualise (দৃষ্টিগোচর) করিয়া চিন্তা করিবে। "সৌন্দর্য্য" চিন্তা করিতে গিয়া কোন একটি বিশেষ সুন্দর বস্তু ভাবিবে। বালক, অশিক্ষিত লোক এই সকল ভাবের অর্থই বুঝিবে না, যতক্ষণ একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত না দিয়া তাহাদিগকে ইহা বুঝান যাইবে। অতি বড় শিক্ষিত লোকও আইনের ধারায় যে সকল abstract idea (সূক্ষ্মভাব) নিহিত রহিয়াছে, তাহা বিশেষ দৃষ্টান্ত (concrete example) দিয়া না বুঝাইলে বুঝিতে পারেন না।

আমার বক্তব্য বিষয়টি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। নিরাকারবাদিগণ "শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বীসতীর পবিত্রপ্রেমে, ভক্তজনের ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতা"

দেখিয়া তাঁহার পূজা করেন। এখন কথা হইতেছে, এই সকল পদার্থ সাকার না নিরাকার? ইহাদের চিন্তা করিলে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হয় তাহা সাকার না নিরাকার? ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তি বা বস্তুবাচক (concrete) পদার্থ, আর কতকগুলি গুণবাচক (abstract) পদার্থ। উপরে যেরূপ দেখান হইয়াছে তাহাতে এক শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতের মতে, ইহাদের সকল গুলি পদার্থ চিন্তা করিতে হইলেই আমাদের সাকার চিন্তা করিতে হইবে। আর একশ্রেণীর মতে অধিকাংশ লোকই, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুবাচক পদার্থ চিন্তা না করিয়া, গুণবাচক পদার্থ চিন্তা করিতে পারে না, তবে যাঁহাদের চিন্তাশক্তি খুব পরিণত তাঁহারা গুণবাচক পদার্থও মনে ধারণা করিতে পারেন।

এই জগতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মনোরম, যাহা কিছু তেজস্বী তাহাই বিশ্বপতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। তাহাদের মধ্যে অমরা সেই "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" পরমপুরুষের দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারি। কিন্তু তাহাদের মধ্যে তাহাকে দেখিতে হইলে আমরা কখনও তাহাদিগকে বাদ দিয়া কেবল তাঁহাকে দেখিতে পারিনা। তাঁহার সত্তা এই সকল জড় পদার্থের সহিত মিলিত ভাবে দেখিতে পাই। আমরা এই সকল পদার্থের সহিত মাখামাখিভাবে তাঁহার চিন্তা করিয়া থাকি। ইহাদের আকার, অবয়ব, বর্ণ প্রভৃতি গুণের সহিত মাখামাখিভাবে ঈশ্বরের সত্তা আমরা অনুভব করি। এই সৌন্দর্য্যসার জগতের সহিত



মাখামাখিভাবে অভেদরূপে, তাঁহাকে দর্শন করিয়া, আমরা বলি, "আহা তুমি কি সুন্দর!" এ জগতে প্রবাহিত দয়াস্রোতস্বতীর বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিয়া আমরা বলি "আহা তুমি কিরূপ দয়ালু!" এই জগতের সৌন্দর্য্য, জগতের দয়া, জগতের প্রেম, জগতের পবিত্রতার সহিত তাঁহাকে একীভূত (identified) ও মিলিত দেখেন বলিয়া ভক্তগণ তাঁহার সৌন্দর্য্য, দয়া, প্রেম ও পবিত্রতার জয় ঘোষণা করেন।

যদি বল, আমি এই সকল সাকার জড় পদার্থের সহিত মাখামাখি ভাবে ঈশ্বরকে দেখিনা, জড় জগতে তাঁহার সৃষ্টিকৌশল অবগত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। কিন্তু তাহা হইলেও তোমার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান জড়জগৎ হইতে উৎপন্ন হইল, জড় জগৎ আছে বলিয়া তুমি সিদ্ধান্ত করিলে, ইহার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আছেন। জড়জগতে সৃষ্টিকৌশল, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি দেখিয়া, তুমি অনুমান করিলে ইহা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন—যেমন ঘড়ীর জটিল কৌশল দেখিয়া ঘড়ী নির্ম্মাতাকে মনে পড়ে। জড় জগতের এই অদ্ভুত সৃষ্টিকৌশল অবগত হইয়া ঈশ্বরকে বল "তুমি জ্ঞানময়"। অবশ্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংস্কার (idea) বীজভাবে তোমার মনে পূর্ব্ব হইতেই ছিল, কিন্তু তাহার জ্ঞানে পরিণতি জড় জগতের উপর নির্ভর করিল। তোমার ঈশ্বরকে জ্ঞানময়রূপে চিন্তা করিতে হইলে এই সাকার সগুণ জড় জগতের সহিত চিন্তা করিতে হইল। আর হিগেলের মতে অনন্ত ঈশ্বরকে প্রকৃতরূপে জানিতে হইলে সান্ত পদার্থ হইতে

বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া তাহার সঙ্গে মাখামাখি ভাবেই দেখিতে হইবে। *

উপাসনা যদি কেবল ধন্যবাদ দেওয়া হয়, তবে হইবে না

আর একটি কথা। নিরাকার উপাসনার অর্থ যদি কেবল ধন্যবাদ দেওয়া হয়, আর এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের পদার্থ যদি কেবল ঈশ্বরের স্মারক চিহ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তবে সে উপাসনার দ্বারা একটা মৌখিক আড়ম্বর (formality) রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা হৃদয়ের তৃপ্তি হইবে কিরূপে ? ঐ সরোবরে প্রস্ফুটিত পদ্ম পুষ্পটি দেখিয়া তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, আমার ঈশ্বরের কথা মনে পড়িল, আমি তাঁহার উপাসনা করিলাম "হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য, কেননা তুমি এই পুষ্পটিকে সৃষ্টি করিয়াছ।" এখানে কেবল এই পুষ্পের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যকারণ সম্বন্ধই মনে পড়িল, আমি অনুমান দ্বারা বুঝিলাম ঈশ্বর ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা, এজন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলাম। ইহাতে মৌখিক উপাসনা হইল বটে, কিন্তু হৃদয়ের তৃপ্তি হইল কৈ ? এইরূপ মৌখিক উপাসনায় তাঁহাকে "হৃদয় মাঝারে" পাইলাম কৈ ? যতক্ষণ ঐ পদ্ম পুষ্পের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমি আত্মহারা না হইব—যতক্ষণ ঐ পদ্ম পুষ্পকে

* "A concrete concept would be one which sought the universal not without the particular but in it; which should not find the infinite beyond the finite, nor the absolute at an unattainable distance above the world, nor the essence hidden behind the phenomena, but manifesting itself there-in"—Falckenberg's *History of Modern Philosophy* (Hegel)—P. 492.



সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য প্রবাহের একটি তরঙ্গ বলিয়া না দেখিতে পারিব, যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ সুন্দর পদ্মপুষ্পে, সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর শ্রীশ্রীজগন্মাতার মুখশ্রী প্রত্যক্ষ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার হৃদয়ের পিপাসা মিটিবে কিরূপে ? এইরূপে একটি দিব্যকান্তি নারীমূর্ত্তি দেখিয়া, তুমি তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলে, তোমার ঈশ্বরের কথা মনে পড়িল, তুমি বলিয়া উঠিলে, "হে ঈশ্বর, তুমি ধন্য, ধন্য তোমার শিল্পনৈপুণ্য, যেহেতু এই অনুপম নারীমূর্ত্তি তোমার হস্তে নির্ম্মিত হইয়াছে!" এখানেও এই রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া, কার্য্যকারণ সম্বন্ধদ্বারা, তাহার কর্ত্তাকে তুমি অনুমান করিয়া ধন্যবাদ দিলে, কিন্তু এই ধন্যবাদ দেওয়ার পূর্ব্বে তোমার চিত্ত ঈশ্বর হইতে যতদূর ছিল, ধন্যবাদ দেওয়ার পরেও ততটুক দূরেই রহিল, এইভাবে রমণীমূর্ত্তি দর্শনদ্বারা তোমার চিত্তের বিশেষ কোন উন্নতি হইতে পারিল না। * তুমি এই রমণীমূর্ত্তিকে শুধু একটি রমণীমূর্ত্তি বলিয়া দেখিয়া মুগ্ধ হইলে, কিন্তু আমি তাহাতে আর একটি সত্তা দেখিতেছি। এই নারীমূর্ত্তি যাঁহার সত্তায় সত্তাবতী, যাঁহার অবলম্বনে অবস্থিতা, যাঁহার সৌন্দর্য্যচ্ছটার কণামাত্র পাইয়া ইহা সুন্দরী, এই রমণীমূর্ত্তি যাঁহার মাতৃভাবের

* ঈশ্বরকে জগতের সহিত মাখামাখি ভাবে দেখিতে অভ্যাস না করিলে, অর্থাৎ অন্য কথায়, জগতের রূপ ও গুণাদি ঈশ্বরে আরোপ করিয়া তাঁহাকে সাকার ও সগুণ-ভাবে উপাসনা করিতে অভ্যাস না করিলে যে ভক্তিলাভ হইতে পারে না তাহা নবম অধ্যায়ে, ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণে ব্যাখ্যা করা হইল।

স্থূল অভিব্যক্তি, যিনি এই রমণীর ছলে জগতে সাক্ষাৎ মাতৃরূপে বিরাজমানা, আমি সেই বিশ্বজননীকে এই রমণীতে অভেদরূপে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি,—দেখিয়া মাতাকে সম্মুখে পাইয়া প্রণাম করিতেছি,—

"যা দেবি সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ ॥

*  *  *  *

বিদ্যা সমস্তা স্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকল-জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কাতে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ ॥"—চণ্ডী।

যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে দেবি! সমস্ত বিদ্যাই তোমার মূর্ত্তি, এবং ত্রিভুবনে যত স্ত্রী, সমস্তই তোমার অংশবিশেষ, তুমি একাই এই বিশ্বব্যাপিয়া আছ; তুমি স্তব্যাগণের শ্রেষ্ঠা, তোমার স্তব আর কি প্রকারে হইতে পারে?

## আধ্যাত্মিক জগতে ব্রহ্মজ্ঞান সাকার

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, জড়জগতে আমাদের যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহা সাকার; এখন আধ্যাত্মিক জগতে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিরূপ জ্ঞান হয়, দেখা যাউক।

### মনের জ্ঞান সাকার

জড় জগতের গুণবাচক পদার্থের জ্ঞানের ন্যায়, আমাদের



মন ( mind ) ও মানসিক অবস্থা সকলের জ্ঞান ও বাহ্যজগতের সাকার জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। যদিও মনদ্বারা আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান লাভ করি, তথাচ মনসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, বাহ্যজগৎ আমাদিগকে সাহায্য করে। যদিও মন আমাদের সকলেরই আছে, মন লইয়া আমরা সর্ব্বদা ক্রিয়া করিতেছি, কিন্তু "মন কি?" এই প্রশ্নের উত্তর আজ পর্য্যন্ত কয়জন লোক দিতে পারিয়াছে! প্রথমতঃ মন যখন বাহ্যজগতের সংস্পর্শে না আসে আমাদের তাহার তখনকার অবস্থা জানিবার কোন উপায় নাই। তৎপরে আমরা যখন মনের কিছু কিছু অবস্থা জানিতে আরম্ভ করি, তখন সে আমাদিগকে তাহার আদি ও অকৃত্রিম অবস্থা জানিতে দেয় না, তখন সে বাহ্যজগতের যে সকল চিত্র ( image ) সংগ্রহ করিয়া নিজে সজ্জিত হইয়াছে, দেশ ( space ) ও কাল ( time ) রূপ পটের উপর ইন্দ্রিয়রূপ তুলিকাদ্বারা বাহ্যজগতের যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিয়াছে, আমাদিগকে তাহাই দেখিতে দেয়। তদ্ভিন্ন তাহার স্বরূপ অবস্থা আমাদিগকে কখনও দেখিতে দেয় না। তুমি সহস্রবার মনঃ-সংযোগ পূর্ব্বক চিন্তা বা ধ্যান ( introspection ) কর না কেন, কোন ক্রমেই মনের স্বরূপ জানিতে পারিবে না। ( অধ্যাত্ম-যোগদ্বারা আত্মার যে জ্ঞান হয়, তাহা স্বতন্ত্র কথা, পরে তাহা বিবৃত হইবে। ) তুমি বাহিরে দেখিতেছ—রূপ, রস, গন্ধ,

মানসিক অবস্থা সকলের শ্রেণীবিভাগ জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছা, তাহাদের জ্ঞান সাকার

স্পর্শ, শব্দ; আবার ভিতরেও দেখিতেছ—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দের পূর্ব্ব সঞ্চিত চিত্রসমূহ। এই সকল রূপ রসাদির চিত্রের তলে তোমার আসল মন ঢাকা পড়িয়াছে, তুমি কিছুতেই তাহা খুঁজিয়া পাইতেছ না। তুমি মনকে জানিবার জন্য চিন্তা করিতেছ, কিন্তু তোমার চিন্তার (thinking) অর্থ কি? না বহির্জ্জগতের চিত্রগুলিকে নূতন করিয়া সাজান, ("thinking means sorting and arranging the images of the external world,"—*Sully*) সুতরাং মনকে জানিতে গিয়া তুমি কেবল বহির্জ্জগতের প্রতিবিম্ব সকল লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছ। মনের স্বরূপ কি তাহা তোমার জানিবার কোন উপায় নাই। তবে মন সম্বন্ধে আমাদের কি কোনই জ্ঞান হয় না? হয়। যেমন বায়ু সংস্পর্শে স্থির জলরাশির উপর বুদ্‌বুদাদি বিকার উত্থিত হয়, অথবা সৌরকরস্পর্শে জলবিন্দুর উপর নানাবর্ণের চিত্র সকল শোভা পায়, সেইরূপ বহির্জ্জগতের সংস্পর্শে মনের (আত্মার) উপরে নানাবিধ বৃত্তি বা ভাবের (phenomena) স্ফুরণ হইয়া থাকে। আমরা কেবল সেই সকল বৃত্তি বা ভাব জানিতে পারি, যথা—কল্পনা বিচার চিন্তা; সুখ দুঃখ ক্ষুধা পিপাসা স্নেহ দয়া; প্রতিজ্ঞা কামনা চিত্তসংযম ইত্যাদি। ইয়ুরোপীয় মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এইসকল মানসিক ভাব (attributes) কে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—(১) জ্ঞান (thought or knowledge), (২) অনুভূতি (feeling) ও (৩) ইচ্ছা (willing)। এখন আমাদের



এইসকল মানসিক ভাবের জ্ঞান কিরূপ, তাহা দেখা যাউক।

### (১) জ্ঞান সাকারমূলক

আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় ইতিপূর্ব্বে তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইয়াছে। * আমরা দেখিয়াছি, মন চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বহির্জ্জগৎ হইতে রূপ রসাদি বিষয় গ্রহণ করে, তদনন্তর সেগুলি বুদ্ধিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বুদ্ধিবৃত্তির (categories) সাহায্যে নানাপ্রকার আকার ধারণ করে। চক্ষু দ্বারা আমি একটি পুষ্প দেখিলাম; মনের মধ্যে তাহার রূপ প্রবিষ্ট হইয়া একটি প্রতিবিম্ব পড়িল, তখন মন স্মরণ করিতে লাগিল, এরূপ ফুল আর কখনও দেখিয়াছি কি না, এবং পূর্ব্বসঞ্চিত ফুলের চিত্র সকল ঘাঁটিতে লাগিল, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এরূপ ফুলের আর একটি চিত্র পাওয়া গেল; তাহার সঙ্গে বিচার শক্তিদ্বারা এই ফুলের চিত্রটির মিল করিয়া মন সিদ্ধান্ত করিল—এটা গোলাপফুল, অবশ্য এতগুলি কার্য্য নিমেষ মধ্যে সম্পন্ন হইল। এইরূপে আমরা দেখিলাম, জ্ঞানের কার্য্যে যেমন নিরাকার বুদ্ধিবৃত্তির (functions of the understanding—categories) প্রয়োজন, তেমন বহির্জ্জগত হইতে সমাহৃত সাকার রূপ রসাদি বিষয়েরও প্রয়োজন। আর এই কার্য্যদ্বারা যে জ্ঞানের বস্তুটি গঠিত হইল তাহা দেশ কালাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া তাহা সাবয়ব ও সাকার।

* জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

ধ্যান ( introspection ) দ্বারা আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাও বহির্জ্জগৎ হইতে সংগৃহীত চিত্র সকলের সাহায্য ভিন্ন হইতে পারে না। আর যদি সে সকল চিত্রকে মন হইতে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করা যায়, তখন মনের কোন ক্রিয়া থাকে না, মন নির্ব্বিষয় নিস্পন্দ হয়; অথবা শরীরের মধ্যস্থিত ফুস্‌ফুস্, হৃৎপিণ্ডাদি প্রভৃতি ক্রিয়া হইতে একপ্রকার অনুভূতি হয়, এই সকল শারীরিক অনুভূতি "( muscular feelings"—*Bain* ) অবশ্য শরীরকে অবলম্বন করিয়া হয় এবং তাহাদের জ্ঞান শরীরের কোন বিশেষ স্থান অবলম্বনে হয়, ইহাকে realisation (ধারণা) বলে। শরীরকে দার্শনিক পণ্ডিতগণ মনের সহিত তুলনায়, বাহ্যজগতের অন্তর্গত বলেন ( "Our own body is a part of our object experience"—*Bain*)। সুতরাং এই সকল শারীরিক অনুভূতি সাকার বাহ্য জগতের অবলম্বনে হয়, সুতরাং সাকার।

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে জ্ঞানের ক্রিয়াতে যেমন object ( বিষয় ) এর জ্ঞান হয়, তেমন Subject ( জ্ঞাতা )র জ্ঞানও সঙ্গে সঙ্গে হয়। আমি একটা পদার্থ জানিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আমার নিজকে অর্থাৎ আত্মাকেও জানিতেছি। তাহা হইলেও যতক্ষণ বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান ( pure self-consciousness ) না হইবে, ততক্ষণ আমার সাকার বিষয়ের জ্ঞানই হইবে। আত্মার ধ্যান করিতে করিতে বিষয়ের জ্ঞান সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে কি প্রকার অবস্থা হয় তাহা অধ্যাত্ম যোগাধ্যায়ে বিবৃত হইবে।



৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একস্থলে লিখিয়াছেন,

"এস্থলে কেহ বলিতে পারেন, যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারাই নিরাকার ভাবিতে পারেন, অজ্ঞানলোকে পারে না। ইহা কি প্রকৃত কথা? সুখ, দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি মানসিক ভাব কি সকল মনুষ্যই অনুভব করে না? কৃষক কি রাজা, পণ্ডিত কি মূর্খ, ধনী কি দরিদ্র, আবাল বৃদ্ধ বণিতা সকলেই কি হর্ষ শোক প্রেম ঘৃণা প্রভৃতি ভাব অনুভব করে না?"*

এখানে "ভাবনা" ও "অনুভব" যে দুইটি পৃথক জিনিষ নগেন্দ্র বাবু তাহা অনুধাবন করেন নাই। দুঃখের ভাবনা ( thinking ) ও দুঃখের অনুভূতি ( feeling ) এক পদার্থ নহে। একটি লোক তাহার পুত্রের মৃত্যু সংবাদে দুঃখ অনুভব করিতেছে, আর আমি সেই দুঃখ দেখিতেছি। এস্থলে পুত্রশোকে তাহার হৃদয়ে এক তুমুল বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে; সে অন্তঃকরণে সহস্রবৃশ্চিক দংশন অনুভব করিতেছে, শরীর বজ্রাহতের ন্যায় নিস্পন্দ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া আছে, কোনই সুখ দুঃখ বোধ নাই, নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুপতন হইতেছে। আমি তাহার একজন নিঃসম্পর্কীয় দর্শক। আমার কিন্তু সেরূপ কোন অনুভূতি বা চিত্তবিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। অথচ আমি তাহার দুঃখ প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, আমি তাহার দুঃখের বিষয় চিন্তা করিতেছি। বড় জোর আমার মনে তাহার দুঃখে সমবেদনা জন্মিতে পারে। সুতরাং আমার "দুঃখ" সম্বন্ধে দুঃখিতের অবস্থা দর্শনে "ভাবনা" হইলেও আমার দুঃখের কোন অনুভূতি হইল

* ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড ১১১ পৃষ্ঠা।

না। অতএব "ভাবনা" ও "অনুভূতি" এক পদার্থ নহে।

সুখ দুঃখ প্রেম প্রভৃতি নিরাকার পদার্থ হইতে পারে কিন্তু আমাকে যখন তাহা ভাবিতে হয়, তাহা চিন্তা ( think ) করিতে হয়, তখন আমি কি চিন্তা করি? চিন্তা ( thinking ) মাত্রেই বহির্জ্জগতের চিত্র সকলকে মনে সজ্জিত করা। উক্ত শোকার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ দেখিয়া আমার মনে দুঃখের একটি বাহিরের চিত্র ( concrete image ) খোদিত হইয়া রহিয়াছে,—যথা তাহার ভূমিতে লুণ্ঠন, অজস্র অশ্রুবিসর্জ্জন, শিরে করাঘাত হাহাকার ধ্বনি ইত্যাদি। যখনই আমি পুত্র শোকাতুরের দুঃখ চিন্তা করিব, তখনই আমার সেই সাকার চিত্রটি মনে পড়িবে, এইরূপে আমার দুঃখের চিন্তা ও জ্ঞান সাকার হইল।

এইরূপ দুঃখের ন্যায় "দয়া" একটি বৃত্তি। "দয়া" পদার্থ নিরাকার হইতে পারে, কিন্তু আমার দয়ার জ্ঞান সাকার না নিরাকার? আমি যখন দয়ার বিষয় চিন্তা করি, তখন আমার মনে কি উদিত হয়? অবশ্য দয়ার কোন সাকার চিত্র। পূর্ব্বে বহির্জ্জগৎ হইতে আমি যে সকল দয়ার কার্য্য বা দৃষ্টান্ত দেখিয়া তাহার চিত্র মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছি, দয়া বলিলে আমার মনে তাহার একটি চিত্র আসিয়া পড়ে। যেমন রাম ভিক্ষুককে দেখিয়া একটি পয়সা দিতেছে, রামের সেই ভিক্ষুকের কাতরতা দেখিয়া চক্ষুদিয়া জল পড়িতেছে ইত্যাদি। এই সকল দয়ার চিত্র অবশ্যই সাকার। সুতরাং দয়ার বিষয় চিন্তা করিলে আমাকে সাকার চিন্তা করিতে হয়।



আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, দুঃখ, দয়া প্রভৃতি abstract idea ( গুণবাচক পদার্থ ) জানিতে হইলে অধিকাংশ লোককেই এইরূপ বিশেষ বিশেষ দুঃখ বা দয়ার চিত্র ( concrete image ) এর কল্পনা করিয়া এক কথায় visualise ( নয়ন গোচর ) করিয়া বুঝিতে হয়। আর এগুলিকে যদি concept বলিয়া মনে করা যায়, তবে তাহা percept এর. সাহায্যে ভিন্ন জ্ঞানের সীমায় আসিতে পারে না। তবে এরূপ লোকও আছেন যাঁহারা কোন বাস্তব চিত্রের ( concrete image ) এর কল্পনা না করিয়াও এ সকল ভাব চিন্তা করিতে পারেন। তাঁহারা নগেন্দ্র বাবুর কথিত "পণ্ডিত" ব্যক্তি।

## ( ২ ) অনুভূতি সাকার মূলক।

এখন আমরা দেখিলাম, দুঃখ দয়া প্রভৃতি অনুভূতি ( feeling, emotion ) সম্বন্ধীয় জ্ঞান ( knowledge ) আমাদের সাকার। যখন দুঃখ দয়া প্রভৃতি অনুভূতিকে চিন্তা করি, তখন আমরা সাকার চিন্তা করি। কিন্তু আমাদের দুঃখ, দয়া প্রভৃতি অনুভূতি ( feeling ) কি পদার্থ, সাকার না নিরাকার? অন্যে দুঃখ অনুভব করিতেছে, কিম্বা দয়া অনুভব করিতেছে, আর আমি তাহা দেখিতেছি, তাহা ভাবিতেছি। এ স্থলে আমার মনে দুঃখ ও দয়ার জ্ঞান সাকার হইল। কিন্তু আমি নিজে যখন দুঃখ অনুভব করি, কি দয়া অনুভব করি, তখন আমার মনে কিরূপ ভাব হয়? সাকার ভাব না নিরাকার ভাব? অর্থাৎ দুঃখ দয়া

প্রভৃতি ভাব সকলের জ্ঞান সাকার, কিন্তু তাহারা নিজে সাকার না নিরাকার ?

পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত এই, অনুভূতি ( feeling or emotion ) মাত্রেই কোন ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় বা শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবলম্বনে উৎপন্ন হয়। ইতিপূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে সাকার বহির্জ্জগৎ ভিন্ন ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান ( sensation ) জন্মিতে পারে না। আবার সাকার শরীর ভিন্নও শারীরিক অনুভূতি ( muscular feeling ) হইতে পারে না। সুতরাং সাকার বস্তুর সহিত অনুভূতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। অন্তরে কিম্বা বাহিরে সাকার বস্তুর সহিত মিলিতভাবে অনুভূতির স্ফুরণ হয়, অনুভূতির সহিত সাকার বস্তুর জ্ঞানের অভেদ সম্বন্ধ। রাম মিথ্যা কথা বলায় আমার তাহার উপর "রাগ" হইয়াছে। এই রাগের সহিত হয় রামের প্রতিমূর্ত্তির নতুবা তাহার মিথ্যা কথার বিষয় আমি চিন্তা করিতেছি। রামকে তুমি আমার নিকট হইতে ডাকিয়া লইয়া যাও, কিম্বা আমার মন অন্য বিষয়ের দিকে আকর্ষণ কর, অমনি সে রাগ থামিয়া যাইবে। একটি ভিক্ষুকের দুরবস্থা দেখিয়া আমার মনে "দয়ার" সঞ্চার হইতেছে ; যতক্ষণ আমি সেই ভিক্ষুকের বিষয় চিন্তা করিতেছি, ততক্ষণ আমার মনে দয়া আছে। সে যদি এখনই আমার নিকট হইতে চলিয়া যায়, ও আমার মন অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হয়, তখনই দয়া আমার মন হইতে অন্তর্হিত হইবে। বহুদিন পরে একটি বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে "সুখ" হইয়াছে, সেই বন্ধু আমার নিকট যতদিন



থাকিবে, আমি ততদিন তাহার বিষয় ভাবিব, আমার সুখও ততদিন থাকিবে। সে যখন চলিয়া যাইবে, তখন আমার সুখও তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইবে। আমি আমার সে বন্ধুকে "ভালবাসি" কেন ? অনেকদিন পর্য্যন্ত একসঙ্গে অবস্থিতি করাতে এবং তাহার মূর্ত্তি ও কার্য্যকলাপ আমার মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হওয়াতে তাহার প্রতি আমার ভালবাসা জন্মিয়াছে। যদি আমি তাহার কথা সর্ব্বদা চিন্তা না করিতাম, কিংবা তাহার সংসর্গে না থাকিতাম, তবে সেরূপ ভালবাসা জন্মিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। স্বামিস্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্যপ্রেম ও এইরূপে ঘনীভূত হয়। শিশু মাতাকে বেশী ভালবাসে কেন ? না, মাতার চিত্র, মাতার ব্যবহার, মাতার কার্য্যকলাপ সে যেরূপ সর্ব্বদাই দেখিতে পায়, আর কাহারও ততদূর পায় না। সেই শিশুকে যদি প্রতিপালনের জন্য অন্যের হস্তে দেওয়া হয়, তবে মাতার প্রতি তাহার ততদূর ভালবাসা জন্মিবে না। আমাদের জন্মভূমির প্রতি কিংবা গৃহের প্রতি এত মমতা কেন ? না, জন্মাবধি সেই স্থানের চিত্র সকল ( associations ) আমাদের মনে খোদিত হইয়া আছে। অধিক দৃষ্টান্ত আর বাড়াইব না, এইরূপে দেখা গেল, ক্রোধ দয়া সুখ ভালবাসা—প্রত্যেক অনুভূতিই এইরূপ কোন না কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানমূলক, বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞানের সহিত সম্পূর্ণরূপে গাঁথা। কোন বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান ভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক হইতে পারে না।* এই সকল বস্তু বা বিষয়ের চিত্র

* "Our emotions are more or less associated with objects, cir-

অবশ্য সাকার, সুতরাং অনুভূতিও সাকারবস্তুসংশ্লিষ্ট এবং সাকার।

### ( ৩ ) ইচ্ছাশক্তি সাকারমূলক।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন, আমাদের ইচ্ছা সুখ দুঃখের অনুভূতি দ্বারা পরিচালিত হয়, তদ্ভিন্ন ইচ্ছাশক্তির কার্য্য হইতে পারে না। বেন ( Bain ) বলেন,—

"Will or volition comprises all actions of human beings in so far as impelled or guided by feelings......... Actions not prompted by feelings are not voluntary." *

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, সাকার বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়ের অবলম্বন ভিন্ন অনুভূতি ( Feeling ) উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও সাকারমূলক ইহা প্রমাণিত হইল।

এইরূপে আমরা মানসিক ভাব ও বৃত্তি সকল বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলাম, তাহারা সাকারমূলক অথবা তাহাদের জ্ঞান সাকার বস্তুর জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন কি আমরা জানি না, আমরা জানি কেবল মনের বৃত্তিসকলকে, সুতরাং মন সম্বন্ধে আমাদের যে জ্ঞান, তাহা এই সকল বৃত্তির জ্ঞানে সীমাবদ্ধ। এই সকল বৃত্তির জ্ঞান সাকার বলিয়া আমাদের

cumstances and occasions, and spring up when these are present either in reality or in idea; affection is awakened, at the sight or thought of what is lovely or endeared to us; fear is apt to arise when perils are brought to view"——*Bain.*

* *Mental and moral science—p.3*



মনের জ্ঞানও সাকার, সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক জগৎ সম্বন্ধীয় জ্ঞানও সাকার।

### হিন্দুদর্শনের মত

এতক্ষণ আমরা পাশ্চাত্যদর্শনের মতের আলোচনা করিলাম, আমাদের হিন্দু দর্শনের মত কি একবার দেখা যাক। আমাদের হিন্দুদর্শনের মতেও "মন" সাকার। তাহা আত্মার বৃত্তি-বিশেষ ( a function of the mind or Soul ); হিন্দু দর্শন মতে সুখ দুঃখ প্রেম দয়া প্রভৃতি ভাব মন বা চিত্তের রূপান্তর মাত্র। মন সূক্ষ্ম জড় পদার্থ, সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতে রচিত। জড় পদার্থ বলিয়াই তাহা সাকার। মনের যদি ছবি ( Photograph ) তোলা যায়, তবে এই সকল বৃত্তিরও ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে। থিওসফিক্যাল গ্রন্থে প্রমাণিত হইয়াছে যে আমাদের কাম-ক্রোধাদি মনোবৃত্তি সকলের পৃথক পৃথক বর্ণ আছে। সংবাদ পত্রে পড়িয়াছি ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ-পণ্ডিত Dr. Baraduc চিন্তিত বিষয়ের ফটোগ্রাফ তুলিয়াছিলেন। Daily Graphic নামক সংবাদ পত্রের কোন লেখক সেই ঘটনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন, ইউরোপের অনেক সুবিখ্যাত বিজ্ঞান-তত্ত্ববিৎ মনীষী অকপটরূপে একবাক্যে বিশ্বাস করেন যে আমরা মনে যাহা চিন্তা করি, বাহিরে তাহার ফটোগ্রাফ তোলা যায়।*

হিন্দুদর্শনের মতেও মন এবং মানসিক অবস্থা সকল সাকার

* "The important and startling point is that sincere and profoundly

এমেরিকার কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত সূক্ষ্মদেহের ফটোগ্রাফ তুলিতে পারেন, তাহাকে Spirit Photograph বলে। মন সূক্ষ্মদেহের অন্তর্গত, সূক্ষ্মপঞ্চমহাভূতে রচিত, বলিয়া সেই সূক্ষ্মদেহের মধ্যে মনের ও ফটোগ্রাফ তোলা হয়। অতএব মন সাকার।

## সিদ্ধান্তের বিবৃতি

উপরের বিস্তৃত আলোচনা দ্বারা আমরা কি পাইলাম তাহা এখন দেখা যাউক। আমরা পাইলাম নিরাকারবাদী যে "ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক পদার্থ" অবলম্বনে,—"শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বী-সতীর পবিত্র-প্রেমে, ভক্তজনের ভক্তি-রঞ্জিত মুখশ্রীতে, সাধু মহাত্মার নিষ্কাম ধর্ম্মানুষ্ঠানে," ঈশ্বর চিন্তা করিয়া বহিরঙ্গ সাধনা করেন তাহা সাকার চিন্তা ও সাকার উপাসনা। তিনি যে আপন হৃদয়ে ঈশ্বরকে "পূর্ণপ্রেম পবিত্রতা সমন্বিত একটি পরমপুরুষরূপে" চিন্তা করেন অথবা ধ্যান করেন, তাহাও সাকার চিন্তা ও সাকার উপাসনা। মনে করুন, ব্রাহ্ম-সমাজে সমুপস্থিত বালকবৃন্দকে আচার্য্য এইরূপে

এইরূপে দেখা গেল জড়জগৎ ও মানসিক অবস্থা সকল অবলম্বনে ঈশ্বরের চিন্তা করিলে তাহা সাকার চিন্তা, ইহার দৃষ্টান্ত।

convinced *Savants* agree that human thought or Psychical force—the name does not matter—put in presence of a photographic plate can imprint on it the trace fo its passage. Is the soul to be laid bare experimentally ?"—Vide Reprint of "Photographing thought," in the Amrita Bazar Patrika of 8th August—1896.



উপদেশ দিতেছেন :—"তোমরা ভাব ঈশ্বর দয়াময়। এই দেখ, তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে প্রত্যহ আহার দিতেছেন, আমাদের পীড়া হইলে তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করেন, আমরা যখন শিশু ছিলাম, তিনি দয়া করিয়া মাতৃস্তনে দুগ্ধ দিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ইত্যাদি।" বালকদিগের মধ্যে যাহার কল্পনাশক্তি এখনও পরিপুষ্ট হয় নাই, সে "দয়াময় ঈশ্বর" ভাবিতে গিয়া কেবল শূন্য দেখিল। একটি ভোজনপ্রিয় বালক আহার যোগানের কথা শুনিয়া লুচি কচুরির কথা ভাবিতে লাগিল। অন্য একটি বালক পুস্তকে পড়িয়াছিল—ভিক্ষুককে দান করা দয়ার কার্য্য ও সে একদিন একজন ভিক্ষুককে একটা পয়সা দিয়াছিল। "ঈশ্বর দয়াময়" ভাবিতে গিয়া সে সেদিনকার ঘটনা স্মরণ করিল, কিন্তু সে যেমন ভিক্ষুককে পয়সা দিয়াছিল, কই ঈশ্বর ত সেরূপ কাহাকেও কিছু দেন না, সুতরাং সে ভাবিয়া কোন কূল কিনারা পাইল না। তাহাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল, সে আহার দানের কথা শুনিয়া তাহার মাতাকে স্মরণ করিল, কারণ তাহার মাতা প্রত্যহ তাহাকে খাইতে দেন ; পীড়ার কথা শুনিয়া তাহাদের বাড়ীর ডাক্তারকে ভাবিতে লাগিল, কারণ তাহার যখন কলেরা হইয়াছিল তখন সেই ডাক্তার তাহাকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন ; মাতৃস্তন্যের কথা শুনিয়া তাহার ছোটভাই খোকা কি রকম তাহার মাতার স্তন পান করে ইহাই ভাবিতে লাগিল,—কিন্তু এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ইহাতে ঈশ্বরের কি কার্য্য সে তাহা খুঁজিয়া পাইল না। শ্রোতৃবর্গের

মধ্যে যদি কোন জ্ঞানী, চিন্তাশীল ব্যক্তি থাকেন, তবে আচার্য্য কথিত প্রত্যেক কার্য্যে কিম্বা ঘটনায় তিনি ঈশ্বরকে চিন্তা করিতে লাগিলেন—যেমন প্রতিদিন আমাদের আহার করার চিত্র ভাবিয়া, তাহার সহিত ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব ও দয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, কোন একটি পীড়িত লোকের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাহার সহিত ঈশ্বরের দয়া ভাবিতে লাগিলেন; একটি স্তন্যপায়ী শিশুর ও তাহার জননীর চিত্র মনে ভাবিয়া, তাহাতে ঈশ্বরের দয়ার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার ঈশ্বরের জ্ঞান এই সকল বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ ঘটনা, বিশেষ বিশেষ বাহ্য জগতের চিত্র অবলম্বনে হইল। এই সকল ব্যক্তি, ঘটনা ও চিত্র সাকার বলিয়া তাঁহার ঈশ্বরের দয়ার চিন্তা ও সাকার হইল। সুতরাং "ঈশ্বর দয়াময়" বলিয়া যে ঈশ্বর চিন্তা তাহাও সাকার হইল। এইরূপে "শিশুর সরলতায়, নিরুপম মাতৃস্নেহে, সাধ্বীসতীর পবিত্রপ্রেমে, ভক্তজনের ভক্তিরঞ্জিতমুখশ্রী"তে ঈশ্বর দর্শনের কথা বলা হয়, তাহাও সাকার পদার্থ দর্শন, সাকার চিন্তা, কারণ আমরা শিশুর মুখ চিন্তা না করিয়া তাহার সরলতা চিন্তা করিতে পারি না; একটি স্নেহময়ী মাতার চিন্তা না করিয়া আমরা তাঁহার স্নেহের কথা ভাবিতে পারি না; একটি সতী-স্ত্রীর দৃষ্টান্ত মনে না করিয়া তাহার পবিত্র-প্রেমের কথা ভাবিতে পারি না; একজন ভক্তের মুখচ্ছবি কল্পনা না করিয়া তাহার ভক্তিরঞ্জিত মুখশ্রী ভাবিতে পারি না। এই সকল অবশ্যই সাকার; সুতরাং আমার ঈশ্বর চিন্তাও সাকার চিন্তা, আমার উপাসনাও সাকার উপসনা হইল।



অবশ্য এরূপ লোক আছেন, যাঁহারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বস্তু বা ঘটনার চিত্র ( Concrete images ) চিন্তা না করিয়াও ঐ সকল গুণ ( সরলতা, মাতৃস্নেহ, প্রেম, ভক্তি ইত্যাদি ) চিন্তা করিতে পারেন, আমাদের চিন্তাশক্তি পরিপুষ্ট ( developed ) হইলে আমরা বস্তুর চিত্র না ভাবিয়াও ভাব ( abstract idea ) কল্পনা করিতে পারি। আমরা গণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা বা নিয়মগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বা চিত্রের সাহায্য না লইয়াও বুঝিতে পারি।

বিশেষ বিশেষ বস্তুর চিত্র (Concrete images ) চিন্তা না করিয়া ও সূক্ষ্মভাব সকল ( Abstract ideas ) চিন্তা করা যাইতে পারে

এরূপ অনেক ছাত্র আছে যাহারা প্রখর বুদ্ধি দ্বারা অঙ্কের অনেক Step বাদ দিয়া অনায়াসে problem সমাধান করিতে পারে।

কিন্তু বিশেষ বস্তুর চিত্রের ( Concrete image ) এর সাহায্যে কোন একটা বিষয় আমরা যত সহজে বুঝিতে পারি, সূক্ষ্মভাবের ( abstract idea ) দ্বারা তত সহজে তাহা ধরিতে পারি না। এই কারণ ভূগোল পড়িতে হইলে মানচিত্রের প্রয়োজন। শিশুদের শিক্ষা "object lesson" এর সাহায্যেই অধিক সফল হয়। নীতি শিক্ষার সন্দর্ভ অপেক্ষা একজন কবি গল্প ও উপন্যাস দ্বারা যে নীতি শিক্ষা দেন তাহা অধিকতর হৃদয়-গ্রাহী ও সুফলপ্রদ হয়। ইহারই নাম literary art. * যে সকল বক্তা শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে বচন

কিন্তু বস্তু বিশেষের চিত্রের ( Concrete images ) সাহায্যেই কোন বিষয় সহজে বোধগম্য হয়

* "The essential element in literature, then, is the power to appeal

বিন্যাস দ্বারা জীবন্ত চিত্র (vivid picture) সৃষ্টি করিতে পারেন, তাঁহাদের বক্তৃতা অধিকতর আদরণীয় হয়।

## উপাসনার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ।

কিন্তু এরূপ ঈশ্বর চিন্তা বহিরঙ্গ উপাসনা

ঈশ্বরকে পুরুষ-বিশেষরূপে ( Personal God ) ধ্যান ধারণা দ্বারা উপাসনাকরাই অন্তরঙ্গ উপাসনা

যাহা হউক নিরাকার বাদীর এইরূপ বক্তৃতার দ্বারা যে ধর্ম্মোপদেশ ইহা হইল উপাসনার বহিরঙ্গ। এতদ্ভিন্ন হৃদয়ে ঈশ্বরকে একজন জীবন্ত পুরুষ ( Personal God ) রূপে যে চিন্তা তাহাই অন্তরঙ্গ উপাসনা। কিন্তু এরূপ কোন কোন লোক আছেন যাঁহারা বহিরঙ্গ উপাসনা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিতে চান। তাঁহারা ঈশ্বরের ধ্যান ধারণার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না। * কিন্তু ঈশ্বরকে আমার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে জানিতে হইলে, আমার আত্মায় তাঁহার সত্তা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার স্বরূপ চিন্তা করিতে হইলে, ধ্যান ধারণার

---

to the emotions.................that appeal is usually made as in the allied arts of sculpture and painting, by presenting to contemplation concrete objects, or persons or particular actions." *Principles of Literary criticism* pp 56. 58.—by Winchester

* "যাহাকে ধারণা করা যাইবে—তাহা আমাপেক্ষা ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক।...কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কেহই আপনাপেক্ষা ক্ষুদ্রের উপাসনা করে না। ভক্তির পাত্র সর্ব্বদাই আমাপেক্ষা উন্নত ও বৃহৎ। সুতরাং উপাসনার জন্য বা ভক্তি অনুশীলনের জন্য ধারণা দ্বারা পূজা করা আবশ্যক এ কথার কোন মূল্য থাকে না।" ধ্যান সম্বন্ধেও ঠিক এই একই আপত্তি প্রযুজ্য। তত্ত্বকৌমুদী ১৯২০-২১ শক—



একান্ত আবশ্যক। এই ধরুন মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়কে যদি আমি জানিতে ইচ্ছা করি, তবে তাঁহাকে কি প্রকারে জানিব? তাঁহার যে পাগড়ীটা মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে তাহা দেখিলে কি তাঁহাকে জানা হইল? না, ইহা নিতান্ত বাহিরের জানা। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা, বাগান পুষ্করিণী এ সকল দেখিলে তাঁহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় বটে কিন্তু ইহাও "বাহ্য"। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিলে তাঁহাকে অনেকটা ঘনিষ্ঠরূপে জানা যায় বটে, তবে ইহাও "বাহ্য।" তাঁহার জীবনচরিত পাঠ ও তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহাকে আরও ঘনিষ্ঠরূপে জানা যায়, তবে ইহাও "বাহ্য।" যিনি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে কথা কহিয়াছেন, তাঁহার জানাই প্রকৃত জানা। রামমোহন রায় বহুদিন হইল স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকে এইরূপ প্রকৃত ভাবে জানার এখন কোন উপায় নাই। কিন্তু ঈশ্বর নিত্যসত্য পরম-পুরুষ, তাঁহাকে আমরা চেষ্টা করিলে সব সময়ে জানিতে পারি। সেজন্য কেবল বহিরঙ্গ সাধনাই যথেষ্ট নহে। তিনি যেমন বিশ্বব্যাপী, তেমন আমাদের অন্তরের অন্তরতম বস্তু। এইজন্য প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞানী সাধক তাঁহাকে ধ্যানধারণা দ্বারা হৃদয়ে দর্শন করিতে চেষ্টা করেন। স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাঁহাকে অন্তরে ধ্যান করিয়া যোগ-সাধনার উপদেশ দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণও বলেন, ঈশ্বরকে হৃদয়ে প্রেমময় ও পবিত্রতাময় পরমপুরুষরূপে ধ্যান করিতে হইবে।

## উপাসনায় চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বে যে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে দেখা গিয়াছে এইরূপ গুণবিশিষ্ট একজন পুরুষকে যদি আমরা মনে ধ্যান বা চিন্তা করি—তবে তিনি অবশ্যই সাকার হইবেন। ঈশ্বর যদিও চক্ষু না থাকিলেও দেখিতে পারেন, কর্ণ না থাকিলেও শুনিতে পারেন, হস্ত না থাকিলেও ধরিতে পারেন, পদ না থাকিলেও চলিতে পারেন, মস্তক না থাকিলেও চিন্তা করিতে পারেন, কিন্তু আমি চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ মস্তকাদি অবয়ব বাদ দিয়া কোন পুরুষের কল্পনাও করিতে পারিনা। আমার সে রূপ কল্পনা করিবার কোনও চিত্তবৃত্তি নাই। যদি তাঁহাকে এরূপ একজন সাকার সাবয়ব পুরুষরূপে ধ্যান না করি, তবে আমি "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, আনন্দময়, পবিত্রতাময়" পুরুষকে কিরূপে ভাবিব? তখন আমাকে কেবল এই সকল গুণেরই চিন্তা করিতে হইবে; আবার যাহার মনে বাস্তব চিত্র ( concrete images ) ভিন্ন গুণের চিন্তা সহজে আসে না, তাহাকে বাস্তব চিত্রের সাহায্যেই এই সকল গুণের চিন্তা করিতে হইবে। নতুবা আবছায়া রকমে এই সকল ভাব ( concept ) গুলিকে ভাবিতে হইবে, আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরে এই সকল গুণ আছে তাহা ভাবিতে হইবে। এতগুলি গুণের একটির পর একটি চিন্তা করিতে বসিয়া, আমার

সগুণ পুরুষের ধ্যান ধারণা নিরাকার উপাসনা নহে, সাকার উপাসনা—



মন নানাদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবে, সুতরাং আমার ধ্যান করা হইবে না। কারণ ধ্যান করিতে হইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক। যাঁহারা হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে সেই মনের মন, প্রাণের প্রাণ পরমপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে মিলিত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা একান্ত আবশ্যক। এমন কি বেদান্ত শাস্ত্রে এই একাগ্রতা লাভকে উপাসনার মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।* গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ভগবান অর্জ্জুনকে যোগ সাধনার উপদেশ দিলে অর্জ্জুন প্রশ্ন করিলেন—"মন বড়ই চঞ্চল—আমি তাহার নিরোধ বায়ুর নিরোধের ন্যায় কঠিন মনে করি।" তাহার উত্তরে ভগবান বলিলেন "হাঁ চিত্তের চাঞ্চল্য দূর করা বড়ই কঠিন। অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা যায় ( "অভ্যাসেনৈব কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে" )। মহর্ষি পতঞ্জলিও "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" এই সূত্রে, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত নিরোধের উপদেশ দিয়াছেন। ফল কথা চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাস না করিলে ধ্যান ধারণাদি যোগাঙ্গ সাধন কিছুতেই হইতে পারে না।

উপাসনার জন্য চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা একান্ত আবশ্যক

চিত্তের একাগ্রতা কাহাকে বলে? অবিচলিত চিত্তে কোন

---

* "এতেষাং নিত্যাদীনাং চিত্তশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্। উপাসনানাং তু চিত্তৈকাগ্র্যম্—"বেদান্তসার।

ভগবান শঙ্করাচার্য্য একান্ত চিত্তে ধ্যানকেই উপাসনা বলিয়াছেন—গীতার ভাষ্য।

বিষয়ের চিন্তা বা ধ্যান করা। কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তু পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে করিতে তাহার প্রতি চিত্তের আকর্ষণ জন্মে। সেই তীব্র আকর্ষণ বলে, মন অন্য দিকে ধাবিত না হইয়া সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয় বা বস্তুতেই সংলগ্ন থাকে। মনকে কোন ক্রমে তাহা হইতে ফিরান যায় না। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা চরিতে এই একাগ্রতার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অঙ্কিত করিয়াছেন। শকুন্তলা অতি তীব্র একাগ্রতার সহিত দুষ্মন্তের ধ্যানে নিমগ্না। ইতিমধ্যে কোপনস্বভাব উগ্রতেজা মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই মহর্ষিও সদা ব্রহ্মধ্যান-নিমগ্ন, একপ্রকার বাহ্যজ্ঞান শূন্য,—নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত সঞ্চালনের দ্বারা মশক তাড়নের ন্যায় তাঁহার বাহিরের ব্যাপার প্রকৃতিদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহার উপর তাঁহার নিজের কোন প্রভুত্ব নাই, তিনি ভূতগ্রস্ত অথবা উন্মাদের ন্যায় কেবল ঘুরিয়া বেড়ান, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইলে কোন আশ্রমে আগমন করেন। তিনি শকুন্তলার সমীপবর্ত্তী হইলেন, তবুও শকুন্তলা তাঁহাকে দেখিলেন না। তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "আমি অতিথি!" সেই বজ্রনিনাদবৎ শব্দও শকুন্তলার কর্ণে প্রবেশ করিল না। কর্ণে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিতে পারিল না—তৎপরে যখন দুর্ব্বাসা অতিথির অবমাননার জন্য সহস্রাশনি-নির্ঘোষস্বরে শকুন্তলাকে শাপ প্রদান করিলেন, তখনও তাহা শকুন্তলার ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারিল না।

চিত্তের একাগ্রতা লাভের উপায়



ঈশ্বরকে পাইতে হইলে, তাঁহার প্রতিও এইরূপ তীব্র একাগ্রতা চাই।

একাগ্রতা লাভের দুইটি উপায় আছে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য। অভ্যাস অর্থে, ঈপ্সিত বস্তুর পুনঃ পুনঃ চিন্তা; আর বৈরাগ্য অর্থে, সেই ঈপ্সিত বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি উপেক্ষা বা অনাসক্তি। এতদ্ভিন্ন তীব্র অনুভূতি ( feeling—যেমন প্রেম, বিদ্বেষ ) দ্বারাও চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। যাহার প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে, তাহার প্রতি মন সহজেই আকৃষ্ট হয় ও নিমগ্ন থাকে—শকুন্তলার যেমন হইয়াছিল। আবার প্রেম স্বভাবতঃ না থাকিলেও, পুনঃ পুনঃ চিন্তা দ্বারা প্রেমের সঞ্চার হয়। আগে যাহার সহিত কখনও আলাপ পরিচয়ও ছিল না, কেবল পুনঃ পুনঃ তাহার সহিত সঙ্গ, তাহার বিষয় চিন্তা দ্বারা, তাহার প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে—যেমন দাম্পত্য প্রেমের উৎপত্তি হয়। সুতরাং সাধকের পক্ষে যে পথেই যাওয়া যাক না কেন, ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ চিন্তা বা ধ্যান করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কিন্তু ঈশ্বরের অনন্ত ভাব। একটির পর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ তাঁহার কতভাবের চিন্তা করিবে? মানুষ অনন্তকাল বসিয়া চিন্তা করিলেও তাঁহার অনন্তভাবের চিন্তা শেষ করিতে পারিবে না। এই জন্য পুষ্পদন্ত তাঁহার প্রসিদ্ধ স্তোত্রে কহিয়াছেন—

অনন্ত ঈশ্বরের অনন্ত মহিমা বিবৃতি কে করিতে পারে? তাহাতে চিত্তের বিক্ষেপ হয়।

"অসিত গিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্দুপাত্রং
সুর-তরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥"

হে ভগবন্! অসিত গিরির ন্যায় স্তূপাকার যদি মসী হয়, সমুদ্র যদি মস্যাধার হয়, মন্দার বৃক্ষের শাখা যদি লেখনী হয়, পৃথিবীতল যদি কাগজ হয়, আর স্বয়ং সরস্বতী যদি অনন্তকাল বসিয়া লেখেন, তবুও তোমার মহিমা লিখিয়া শেষ করিতে পারেন না। অতএব মানুষ "মঙ্গলময় প্রেমময় জ্ঞানময়" ইত্যাদি যত বিশেষণই তাঁহার প্রতি প্রয়োগ করুক না কেন, তাঁহার অনন্ত বিভূতির কি কখনও নিঃশেষ করিয়া বর্ণন করিতে পারিবে ? কখনই না। লাভের মধ্যে এইরূপ একটির পর একটি, তাহার পর একটি ভাবের চিন্তা করিতে করিতে, তোমার স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত আরও চঞ্চল হইবে, এইরূপ বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমণ জন্য তোমার চিত্ত-সংযম অভাবে, একাগ্রতালাভ তোমার পক্ষে আরও কঠিন হইবে। তবে উপায় কি ?

একাগ্রতা লাভের জন্য মানসীমূর্ত্তি গঠন।

চিত্ত বিক্ষেপ দূর করিবার জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট ভাব বা বিষয় অবলম্বনে একাগ্রতা অভ্যাস আবশ্যক।

উপায় আছে, ঈশ্বরের অনন্ত দয়ার কার্য্য, অনন্ত শক্তির কার্য্য, অনন্ত জ্ঞানের কার্য্য, অনন্ত মঙ্গলের কার্য্য, অনন্ত প্রেমের কার্য্য চিন্তা করিতে চেষ্টা না করিয়া, সেই সকল কার্য্যের মধ্য হইতে, যেটি সহজ, বিনা আয়াসে আমার মনে আসে, আমি যদি ক্রমাগত তাহাই চিন্তা করিতে অভ্যাস



করি, তবে তদ্দ্বারা আমার সেই বিষয় অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত স্থির হইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেন :—

"তৎপ্রতিষেধার্থমেক-তত্ত্বাভ্যাসঃ"—পাতঞ্জল সূত্র,—

অর্থাৎ "চিত্তবিক্ষেপ নিবারণ জন্য কোন একটি আপনার অভিমত তত্ত্ব অভ্যাস, অর্থাৎ তাহাতে পুনঃ পুনঃ মনের নিবেশ করিবে, ক্রমাগত একটি মাত্র বিষয়ে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ মনের অভিনিবেশ করিতে চেষ্টা করিলে একাগ্রতা জন্মে, চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয়।"

অবশ্য তাঁহার অন্যান্য কার্য্য বা ভাব চিন্তা করা একেবারে নিষেধ করা হইতেছে না, তাঁহার মহিমসূচক অন্যান্য কার্য্যও দেখিব, কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ভাব বিশেষ করিয়া দেখিব। সেই কার্য্যটি, সেই ভাবটি, শয়নে স্বপনে আমার মনে জাগরূক থাকা চাই। যেমন, আমার মাতাকে আমি যেরূপ ভালবাসি, পৃথিবীতে আর কাহাকেও সেরূপ ভালবাসি না। আমার মায়ের কথা সহজে, অনায়াসে আমার মনে উদিত হয়, এমন কি আমার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক আছে। এই মাতৃত্বভাব আমার মনে সহজেই আসে বলিয়া, এই মাতৃত্ব অবলম্বনে ঈশ্বরের প্রতিও আমার মন অনায়াসে ধাবিত হইতে পারে, আর ঈশ্বর ত একহিসাবে আমার মাতাও বটেন তিনি মাতার মাতা, পিতারও পিতা, তিনি জগতের মাতা, জগতের পিতা, সুতরাং তাঁহাকে মাতৃভাবে অথবা পিতৃভাবে চিন্তন খুব স্বাভাবিকও বটে। এইরূপে তাঁহার একটি ভাব, তাঁহার

মাতৃত্বভাব অবলম্বনে তাঁহাকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার প্রতি আমার প্রেম জন্মিতে পারে এবং চিত্ত একাগ্র হইতে পারে, সাধক এইরূপে ভগবানের প্রতি অনন্যচিত্ত হইতে পারেন।

সেই ভাব বা বিষয় একটি বিশেষ চিত্র (concrete image) হইলে অধিক চিত্তাকর্ষক হয়।

কিন্তু এই মাতৃত্বভাব অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা কি প্রকারে করিব? একটি স্নেহময়ী মাতার মূর্ত্তি, তাহার সন্তান-স্নেহ-বিগলিত মুখশ্রী অবশ্যই আমাকে কল্পনা করিতে হইবে, সেই মূর্ত্তিটি আমার মনে যত পরিস্ফুট হইবে, যত ভাবোজ্জ্বল হইবে, ততই আমার মন তাহাতে অভিনিবিষ্ট হইবে, ততই আমি অনন্যচিত্ত হইয়া তাহা ধ্যান করিতে পারিব। * আর সঙ্গে সঙ্গে সেই মাতার স্নেহের সহিত ঈশ্বরের স্নেহ বা প্রেম অভেদরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ঈশ্বরের যে অনন্ত অখণ্ড

* "It is concrete individual things that have power upon our feelings. We do not feel because we do not see. We read in the newspaper at our morning coffee that five thousand people perished in an earthquake in Japan yesterday. "How frightful !" We said ; but we never turned the corners of our mouth in any real feeling. We did not *see* the calamity. As we say often, we did not realise it. We have felt more pity for some fictitious person in a novel than for all these five thousand wretches swallowed alive. *It is evidently this power to see and show things in the concrete, as if they were real, that hold the key to our emotions.* This power we call Imagination, It is the most essential faculty in the equipment of the poet, dramatist, novelist ; it is necessary to every man of letters." ( the *Italics* are ours )—*Principles of Literary Criticism*—P P 118—17. —by C-F Winchester.



স্নেহস্রোতস্বতী বিশ্ব ব্যাপিয়া, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ জাতীয় মাতার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে, এই কল্পিত মাতার স্নেহ তাহারই কণিকাবিশেষ, এই মাতৃমূর্ত্তি সেই জগন্মাতারই একটি প্রকাশবিশেষ এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে।

সেই বিশেষ চিত্রে ঐশ্বরিক ভাবের সমাবেশ করিতে হইবে।

যদি বল, ইহাতে আমার পরিতৃপ্তি হইল কই? এতো একটি মানুষমাতার মূর্ত্তি, যেমন যীশুখ্রীষ্ট-কোলে মেরীমাতার মূর্ত্তি—যাহাকে ম্যাডোনা ( Madonna ) বলে। ইহাতে সেই ঐশ্বরিক ভাব ফুটিল কই? আমি চাই "ভূমা" আমার "অল্পে" সুখ হইবে কেন? * আমি চাই একাধারে যেমন স্নেহময়ী জননী আবার সেইরূপ জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, শক্তিময়ী, পবিত্রতাময়ী, জগজ্জননী মূর্ত্তি। ঋষি বলিলেন—আচ্ছা তাহাই তোমাকে দিতেছি। এই দেখ, তোমাকে এরূপ একটি মাতৃমূর্ত্তি দিব, যাহাতে একাধারে মাতার স্নেহ আছে, জ্ঞানীর জ্ঞান আছে, শিশুর সরলতা আছে, সাধুর পবিত্রতা আছে—যাহাতে অনন্ত-জগৎ পরিচালক শক্তি আছে, জগতের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিবার জন্য চন্দ্র-সূর্য্য-বহ্নিরূপে, অথবা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমানের সাক্ষীরূপে তিনটি চক্ষু আছে,—যাহাতে জগতের অমঙ্গল বিনাশ করিবার জন্য দশদিগ্‌বিলম্বী বিবিধ প্রহরণ শোভিত দশটি হস্ত আছে,—যাহাতে পাপাসুরকে বিনাশ করিবার জন্য দুর্দ্দমনীয় সিংহ-পরাক্রম আছে—আবার যাহাতে

* "যো বৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।"—ছান্দোগ্য উপনিষৎ

ঘোর পাপসাগরে নিমগ্ন পাপীকে উদ্ধার করিবার জন্য বরাভয়যুক্ত দুইখানি কর আছে। হে সাধক! তুমি একাধারে সেই নিখিল ভুবনব্যাপিনী অসীম অনন্তরূপিনী, রূপবিবর্জ্জিতা অথবা সর্ব্বরূপে বিরাজমানা, সর্ব্বরূপ-প্রকাশিনী, ত্রিনেত্রা-দশভুজা, অসুরনাশিনী, জয়দাত্রী, সিদ্ধিদাত্রী, জগদ্ধাত্রী, মহাদেবী মূর্ত্তিকে ধ্যান করিয়া তোমার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন কর। এতদিনে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল, তোমাকে এখন আর "শক্তিময়, জ্ঞানময়, দয়াময়, প্রেমময়, পবিত্রতাময়"কে চিন্তা করিবার জন্য সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না। এই দেখ, এই একাধারে তুমি যাহা কিছু চাও, যতগুলি ভাব তোমার হৃদয়ে ধারণ করিতে পার, সেই সবগুলি পাইতেছ।"

একাধারে অনন্তগুণ ও ঐশ্বর্য্যের সমাবেশ দ্বারা জগৎপিতা বা জগন্মাতার মানসীমূর্ত্তি কল্পিত হয়।

এইরূপে "অপরিসীম সূক্ষ্মদর্শী, দূরদর্শী, অন্তদর্শী, প্রকৃতি-দর্শী" * ঋষি সাধকের হিতের নিমিত্ত জগতের অনেকগুলি চিত্রের বা দৃশ্যের সমবায়ে (ক্যাণ্টের ভাষায়, by synthetic unity of divine attributes) এই অনুপম মাতৃমূর্ত্তি উদ্ভাবন করিলেন, জগতের তিল তিল সৌন্দর্য্য একাধারে সংগ্রহ করিয়া এই তিলোত্তমা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। একদিন অসুর নিপীড়িত দেবগণের শরীরস্থ তেজো-রাশি মিলিত হইয়াও এইরূপ একটি অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে:—

* ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় কৃত "পুষ্পাঞ্জলি"—।



"অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ত্বিষা॥
যদভূচ্ছাম্ভবং তেজস্তেনাজায়ত তন্মুখং।
যাম্যেনাচাভবন্ কেশা বাহবো বিষ্ণুতেজসা॥
সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং মধ্যং চৈন্দ্রেণ চাভবৎ।
বারুণেন চ জঙ্ঘোরূ নিতম্বস্তেজসাভুবঃ॥
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ তদঙ্গুল্যোঽর্কতেজসা।
বসূনাঞ্চ করাঙ্গুল্যঃ কৌবেরেণচ নাসিকা॥
* * * * * *
ততঃ সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবাং।
তাং বিলোক্য মুদং প্রাপুরমরা মহিষার্দ্দিতাঃ॥"—চণ্ডী।

দেবগণের শরীরসমুৎপন্ন, দিগন্তর-ব্যাপী, প্রভাবশালী, অপরিমেয় সেই তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া নারীরূপে অভ্যুদিত হইল। শম্ভুর তেজ দ্বারা তাঁহার মুখ, যমের তেজদ্বারা তাঁহার কেশ, বিষ্ণুর তেজ দ্বারা তাঁহার বাহু সকল হইল। চন্দ্রের তেজে তাঁহার স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে কটিদেশ, বরুণর তেজে জঙ্ঘা ও উরু এবং পৃথ্বীতেজে তাঁহার নিতম্ব সৃষ্ট হইল। ব্রহ্মার তেজে পাদদ্বয়, সূর্য্যের তেজে পদাঙ্গুলি সকল, বসুগণের তেজে নাসিকা হইল। * * * * * * অনন্তর দেবগণের তেজোরাশি সম্ভূতা সেই দেবীকে দেখিয়া মহিষাসুর-পীড়িত দেবগণ হর্ষযুক্ত হইলেন।"

এখানে একবার সেই "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা" বাক্যটি স্মরণ কর। যিনি এই বাক্যে বিশ্বাস করেন, তিনি বুঝিবেন সাধকের হিতের জন্য ব্রহ্ম নিজেই এই প্রকার রূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর "রূপ-কল্পনা"

অর্থ যদি ঋষিদিগের কল্পনা হয়, তবে তাহাতেও বুঝিলাম, ঋষিগণ জগতের তিল তিল সৌন্দর্য্য ও মঙ্গল ভাব আহরণ করিয়া এই অপরূপ দেবীমূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন।

আমরা এইরূপে দেখিলাম, ঈশ্বরকে যদি "শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, শান্তিময়, পবিত্রতাময়" বলিয়া চিন্তা ও উপাসনা করা হয়, আর সেই উপাসনা যদি নিতান্ত বহিরঙ্গ ধন্যবাদ বা বক্তৃতায় পর্য্যবসিত না হইয়া উপাসনা দ্বারা সাধক সেই হৃদয়ের বস্তুকে হৃদয়ের মধ্যে ধ্যানধারণাদি দ্বারা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছা করেন, আর সেই ধ্যান-ধারণাদি মানসিক কার্য্য যদি চিরন্তন মানসিক নিয়ম ( psychological laws ) অনুসারে সম্পাদিত হয়, তবে নিরাকার বাদীর সগুণ উপাসনার অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সাকারোপাসনা ও মূর্ত্তি পূজা। এস্থলে কেবল ঈশ্বরের মানসী প্রতিমার কথাই কহিতেছি। বাহিরের জড় প্রতিমার আবশ্যকতা কি, তাহা পরে ব্যাখ্যা করিব।

সেই মানসীমূর্ত্তির উপাসনাই ব্রহ্মোপাসনা। সগুণউপাসনার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সাকারোপাসনা।

এখানে আপত্তি হইতে পারে, আমি যে "ত্রিনেত্রা দশভুজার" মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা করিলাম, আমার কল্পনা অনুসারে ঈশ্বর সেই মূর্ত্তি ধারণ করিবেন কেন? ইহার উত্তর এই, আমি তাঁহাকে যদি "শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়" বলিয়া চিন্তা করি, তবে তিনি "শক্তিময়, জ্ঞানময়, প্রেমময়" হইবেন কেন? আসল কথা এই, সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্ত ঐশ্বর্য্য



লইয়া সর্ব্বদা বিরাজমান রহিয়াছেন—তিনি "সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ"—তিনি অনন্তরূপ-গুণের আকর—আমরা চিন্তা বা ধ্যান দ্বারা—তাঁহার রূপগুণের সৃষ্টি করি না, আমরা তাহার উপলব্ধি করি মাত্র। যে অসীম অপার সমুদ্র দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে, আমরা তাহার মধ্যে হৃদয়-কলসী ডুবাইয়া সেই কলসীর আকারে তাহার অগাধ বারিরাশির কতটুক ধরিয়া লই মাত্র। আর আমাদের সেই মানসী-প্রতিমা আমাদের আত্মার সহিত অভেদ ভাবে ধ্যান করি বলিয়া তাহা ব্রহ্মেরই রূপ, কারণ আত্মা ও ব্রহ্ম অভেদ।

---

# পঞ্চম অধ্যায়

## ব্রহ্মের আকার আছে কি না ?

### ব্রহ্মের বিরাটরূপে অভিব্যক্তি।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ব্রহ্মের কি কোন মূর্ত্তি আছে, না তাঁহার মূর্ত্তি আমাদের মনের কল্পনা ? ঈশ্বর কি কখনও সাকার মূর্ত্তিতে আমাদের প্রত্যক্ষীভূত হইতে পারেন ?

বাইবেল গ্রন্থে আছে মনুষ্যকে ঈশ্বর তাঁহার নিজের আকার দিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন—"God created man in his own image," * ইহা একটি সার্ব্বভৌম সত্য। আমাদের শাস্ত্রেও আছে, পিণ্ডে (মনুষ্য দেহে) ও ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি-সমষ্টিগত প্রভেদ। মনুষ্য দেহ একটি ক্ষুদ্র জগৎ (microcosm)। মনুষ্য-শরীর ও মূর্ত্তি যেমন আমাদের কল্পনার জিনিষ নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়, ঈশ্বরের মূর্ত্তিও সেইরূপ কাল্পনিক নহে প্রত্যক্ষের বিষয়।

ঈশ্বরের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষের বিষয়

আমরা ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি, শ্রুতিস্মৃতির মতে ব্রহ্মের চারিটি রূপ,—তিনি "তূরীয়", তিনি "ঈশ্বর", তিনি "হিরণ্যগর্ভ", এবং তিনি "বিরাট" বা "বৈশ্বানর"।

* মূর্ত্তিপূজকদিগকে বিদ্রূপ করিবার অভিপ্রায়ে কেহ কেহ এই কথা ঘুরাইয়া বলিয়াছেন "Man created God after his own image" একথাও এক হিসাবে সত্য, যে হিসাবে এই জগৎটাই মনুষ্যের কল্পনা বা জ্ঞান-প্রসূত।



তূরীয়াবস্থা, শুদ্ধচৈতন্যাবস্থা ; ইহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরাকার, "শান্ত শিব অদ্বৈত"। ব্রহ্ম যখন সিসৃক্ষু হইয়া মায়োপহিত হন, তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনিয়ন্তা—তখন তিনি জগৎকারণ ঈশ্বর।

ঈশ্বরের চারিটি রূপ;—তূরীয়, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট।

মায়ার দুইটি শক্তি আছে "আবরণ শক্তি" ও "বিক্ষেপ শক্তি"। মায়ার যে শক্তিদ্বারা মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় ব্রহ্মের স্বরূপ আমাদের নিকট আবৃত রহিয়াছে, তাহাকে আবরণ শক্তি বলে। যেমন রজ্জুস্থিত অজ্ঞান নিজশক্তিদ্বারা সেই রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মায়, সেইরূপ যে শক্তিদ্বারা মায়া শুদ্ধচৈতন্য পদার্থে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল ও স্থূল হইতে সূক্ষ্মতর ক্রমে এই জগতের অস্তিত্ব বোধ জন্মায়, তাহাকে বিক্ষেপ শক্তি বলে। অদ্বৈত ব্রহ্মে দ্বৈতজ্ঞান জন্মার কারণ অজ্ঞান বা মায়া। মায়ার তিনটি গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এই ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার বিক্ষেপশক্তি হইতে চৈতন্যাশ্রয়ে প্রথমতঃ সূক্ষ্ম জগৎ ও তৎপরে স্থূল জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম জগতের উপাদান আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পাঁচটি "পঞ্চতন্মাত্র" অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের সূক্ষ্মাবস্থা। এ সকল ক্রমে মায়া হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। এই সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত দ্বারা সপ্তদশাবয়বাত্মক * লিঙ্গ শরীর ও সূক্ষ্ম জগৎ রচিত হইয়াছে।

* চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; মন, বুদ্ধি ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় ; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান—এই পঞ্চ বায়ু—এই সপ্তদশ অবয়ব।

সূক্ষ্মজগদুপহিত চৈতন্যকে "হিরণ্যগর্ভ" বা "সূত্রাত্মা" বলে। মায়ার অব্যক্ত অবস্থায় যিনি অপরিস্ফুট কারণদেহ ধারণ করিয়া ঈশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই মায়ার এই সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণতি হেতু সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করিয়া "হিরণ্যগর্ভ" হইলেন, তৎপরে মায়ার আরও পরিণতি বা অভিব্যক্তি হইতে লাগিল; সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত ক্রমে আকাশ, বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী এই স্থূল পঞ্চমহাভূতে পরিণত হইল। * এই স্থূল পঞ্চমহাভূত দ্বারা ক্রমে পরিদৃশ্যমান স্থূল জগৎ অভিব্যক্ত হইল। তৎসঙ্গে ঈশ্বরও সেই স্থূল জগতের অধিষ্ঠাতৃরূপে স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া বিরাট পুরুষ হইলেন। †

---

* যে প্রক্রিয়া দ্বারা সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত হইতে স্থূল মহাভূতের সৃষ্টি হয় তাহাকে পঞ্চীকরণ বলে। একটি স্থূল মহাভূত, যেমন জল, সূক্ষ্ম জলের ৷৹ আনা এবং আকাশ বায়ু অগ্নি পৃথিবী এই চারিটি সূক্ষ্ম মহাভূতের প্রত্যেকের ৵৹ অংশ এই ষোল আনা অংশে সৃষ্ট।

† সূক্ষ্মদেহী হিরণ্যগর্ভ কিরূপে বিরাটরূপ ধারণ করিলেন,—তাহা পঞ্চদশী গ্রন্থে অতি সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

> "সূত্রাত্মা সূক্ষ্ম-দেহাখ্যঃ সর্ব্বজীব-ঘনাত্মকঃ।
> সর্ব্বাহংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়া-জ্ঞানাদি-শক্তিমান্॥
> প্রত্যূষে বা প্রদোষে বা মগ্নো মন্দে তমস্যয়ম্।
> লোকে ভাতি যথা তদ্বদস্পষ্টং জগদীক্ষতে॥
> সর্ব্বতো লাঞ্ছিতো মস্যা যথা স্যাদ্ ঘট্টিতঃ পটঃ।
> সূক্ষ্মাকারৈ স্তথেশস্য বপুঃ সর্ব্বত্র লাঞ্ছিতম্॥
> শস্যং বা শাকজাতং বা সর্ব্বতো ক্ষুরিতম্ যথা।
> কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ॥
> আতপাভাতো লোকোবা পটো বা বর্ণপূরিতঃ।
> শস্যং বা ফলিতং যদ্বৎ তথা স্পষ্ট-বপুর্বিরাট্॥"—
>
> —চিত্রদীপ ২০০—২০৪



ব্রহ্মের এই চারিটি অবস্থা হইলেও তিনি যখন অখণ্ড অবিভাজ্য অনন্তসত্তা, তখন তিনি এই চারি অবস্থায় এক। তুরীয়াবস্থায় যিনি নিষ্ক্রিয়, মুক্ত, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অদ্বৈত, চৈতন্য স্বরূপ; তিনিই কারণশরীর ধারণ করিলে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা, পুরুষোত্তম ঈশ্বর; আবার সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিলে তিনিই জগৎস্রষ্টা হিরণ্যগর্ভ; এবং স্থূল শরীর ধারণ করিলে তিনিই বিশ্বরূপ বিরাটপুরুষ। চারি এক, এক চারি। ব্রহ্মের এই স্থূল সূক্ষ্ম কারণশরীর প্রপঞ্চ লইয়া এক মহাপ্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে; তাহাই ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব বা জগৎ। এই ব্রহ্মাণ্ড-শরীর ধারী পুরুষ, বিশ্বমূর্ত্তি, সাকারই সগুণ ঈশ্বর। পঞ্চদশীতে সেই বিরাট পুরুষের কথা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।—

> "বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেঽপি পৌরুষে।
> ধাত্রাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তানেত স্যাবয়াবান্ বিদুঃ॥
> ঈশসূত্র-বিরাট্-বেধো-বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্র-বহ্নয়ঃ।
> বিঘ্নভৈরবমৈরাল-মারিকা যক্ষরাক্ষসাঃ॥
> বিপ্রক্ষত্রিয়-বিট্ শূদ্রা গবাশ্ব মৃগ-পক্ষিণঃ।
> অশ্বত্থ বটচুতাদ্যা যবব্রীহি তৃণাদয়ঃ॥
> জল-পাষাণ-মৃৎকাষ্ঠ-বাস্য-কুদ্দালয়াদয়ঃ।
> ঈশ্বরাঃ সর্ব্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ॥
>
> চিত্রদীপ—২০৫—২০৮

গীতার বিশ্বরূপাধ্যায়ে ও ঋগ্বেদীয় পুরুষসূক্তে ঈশ্বরের এই বিরাট মূর্ত্তির কথা বলা হইয়াছে। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্ট

পদার্থের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র তৃণ পর্য্যন্ত সেই বিরাট মূর্ত্তির অবয়ব। ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বহ্নি, বিঘ্ন, ভৈরব, মৈরাল, মারিক, যক্ষ, রাক্ষস, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, অশ্বত্থ, বট, চূত, যব, ব্রীহি, তৃণ, জল, পাষাণ, মৃত্তিকা প্রভৃতি স্বাভাবিক বস্তু; বাস্তু বেদাল প্রভৃতি কৃত্রিম পদার্থ,—এইরূপে ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তু ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি, অথবা সেই বিরাট পুরুষের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব। এই সকল মূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনা করিলে তিনি ফল প্রদান করেন।

এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রকৃতই বিরাট শরীর

এই স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ যে প্রকৃতরূপে তাঁহার শরীর, কাব্যের রূপক শরীর নহে,—পঞ্চদশীকার তাহা স্পষ্টরূপে বলিতেছেন,—

"পটরূপেণ সংস্থানাৎ পটস্তন্তোর্বপুর্যথা।
সর্ব্বরূপেণ সংস্থানাৎ সর্ব্বমস্য বপুস্তথা॥
চিত্রদীপ—১২৮।

তন্তু যেমন পটরূপে পরিণত হইলে, সেই পটকে তন্তুর শরীর বলা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মও বিশ্বরূপে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া এই বিশ্ব তাঁহার শরীর।

কিন্তু তিনি জড়জগতে পরিণত নাই

এখানে আপত্তি হইতে পারে, এই জড় জগৎ যদি ব্রহ্মের প্রকৃত শরীর হইল, তবে তিনি কি জড়ে পরিণত হইলেন? চৈতন্য পদার্থ কি জড়ে পরিণত হইতে পারে? কখনই না, ঈশ্বর জড় জগতে পরিণত হন নাই, চৈতন্য ও জড় সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট, চৈতন্য জড়ে পরিণত হইতে পারে না। আমি যেমন স্বরূপতঃ



চৈতন্য পদার্থ হইলেও, এই জড় শরীর ধারণ করিয়াছি, অথচ আমার আত্মা জড়ে পরিণত হয় নাই, সেইরূপ ঈশ্বর জড় শরীর ধারণ করিলেও জড়ে পরিণত হন নাই। তিনি জড় শরীর ধারণ করিয়াছেন "বিবর্ত্ত" দ্বারা "বিকার" দ্বারা নহে। বিকার কাহাকে বলে? কোন বস্তু নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য আকার ধারণ করিলে, তাহাকে বিকার বা পরিণাম বলে। ("স্বতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ") যেমন দুগ্ধ নিজের স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া দধি বা ঘৃতে পরিণত হয়। বস্তুর নিজের স্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্য আকার ধারণ করাকে বিবর্ত্ত বলে, ("অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ ইতি")। যেমন রজ্জু নিজের স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া সর্প বলিয়া প্রতীত হয়। ব্রহ্মও নিজের চিদ্‌ঘন স্বভাব পরিত্যাগ না করিয়া এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রতীত হন। ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত।

তিনি বিবর্ত্ত দ্বারা জড়-দেহ ধারণ করেন

### এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শনের মত

ক্যাণ্টের (Kant) মতেও এই পরিদৃশ্যমান জগৎ মায়াময় (Phenomenal), ইহার মূলে যে বাস্তব সত্তা (reality) আছে তাহা আমাদের অজ্ঞেয় (unknowable)। সেই অজ্ঞেয় পরমার্থবস্তু (thing-in-itself or noümenon) হইতেই এই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। সেই পরমার্থবস্তু কি? না আত্মা বা ঈশ্বর। ক্যাণ্টের মতে "Our world is a mental growth

—not our individual product, but the work of that common mind in which we live, and think, and which lives and thinks in us" *

অর্থাৎ বহির্জ্জগৎ আমাদের মনেরই সৃষ্টি, আমার মনের তোমার মনের সৃষ্টি নহে—মানবগণের সমষ্টিমনের সৃষ্টি, সেই সমষ্টি মনোজগতেই আমরা প্রত্যেকে অবস্থিতি করি এবং তাহা অবলম্বনে চিন্তা করি; সেই সমষ্টিমন আমাদের মধ্যে আছে এবং আমাদের মধ্যে থাকিয়া চিন্তা করে। বলা বাহুল্য এই সমষ্টিমনই বিশ্বব্যাপী আত্মা বা ব্রহ্ম। ক্যাণ্টের মতেও ব্রহ্ম-স্বরূপের কোন পরিবর্ত্তন বা বিকার না হইয়া তাহা হইতে এই জগতের উদ্ভব হইয়াছে। কিন্তু সেই পরমার্থবস্তু হইতে কি প্রকারে এই মায়িক জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমাদের অজ্ঞেয়, কারণ ব্রহ্ম অজ্ঞেয়। †

হিগেলের ( Hegel ) মতে, ঈশ্বর অজ্ঞেয় নহেন, তিনি জ্ঞেয়। এই মায়িক জগৎ ( Phenomenal world ) ঈশ্বর হইতেই অভিব্যক্ত হইয়াছে। সেই এক অদ্বিতীয় সত্তাই স্থূল

---

* *The Logic of Hegel*—by W. Wallace.

† "Science is the definite and detailed of the conditioned * * *—But knowledge of the whole—of the enveloping unity—is a contradiction in terms. To know is to synthetise; You can not synthetise synthesis ( "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ"—শ্রুতি ). Knowledge is of the relative, but an absolute and unconditional totality has no relations. We may therefore possibly feel, believe in, presuppose the absolute, but know it in the strictest sense we cannot. It may be the object of a rational faith"—Ibid.



সূক্ষ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। এই বিশ্ব তাঁহাতে, তিনি বিশ্বে। তিনি আপন স্বরূপের কোন বিপর্য্যয় সাধন না করিয়া এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। এক অখণ্ড সত্তা, এক অখণ্ড জ্ঞান, এক অখণ্ড জীবনশক্তি জড় ও চৈতন্য, প্রকৃতি পুরুষ, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতারূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া আবার আপনাতে এই উভয় সত্তাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই দুইটি বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবের অভিব্যক্তি আবার তাঁহাতেই আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। তাই তিনি এক হইয়াই সর্ব্ব,—এক সর্ব্বে এবং সর্ব্ব একে অবস্থিত।*

"মত্তঃসর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে।" (বিষ্ণুপুরাণ, প্রহ্লাদেরস্তব )

হিগেলের মতে আত্মা ও জড়জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্ম্মা, পৃথক্ বস্তু নহে; তাহারা একই পরমাত্মার বিভিন্ন অভিব্যক্তি। আত্মা পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া প্রথমে বহির্জ্জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয় ও পরে আবার পরমাত্মা বা ঈশ্বরে ফিরিয়া আসে।†

---

* "All is indeed one life, one being, one thought; but a life, a being, a thought which only exists as it appears itself within itself, sets itself apart from itself, projects its meaning and relations outwards and upwards and yet retains and carries out the power of reuniting itself. The Absolute may be called one, it is also All; it is one which makes and overcomes difference; it is, and it essentially is, in the antithesis of nature and spirit, object and subject, matter and mind; but under and over the antithesis, it is fundamental and complete unity" * * * "one is not alone, but one and All, one in All, and All is One"—*The Logic of Hegel* by Wallace.

† "The mind and the world—the so-called subject and object are equally the results of a process.........The subjective world, the mind of

ইতি পূর্ব্বে আমরা বেদান্তমতের আলোচনায় দেখিয়াছি ব্রহ্মই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। ক্যাণ্ট বলেন জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত,কিন্তু ব্রহ্ম ও জগৎ সম্পূর্ণ বিভিন্নধর্ম্মা। বেদান্তের সহিত ক্যাণ্টের এখানে ঐক্য আছে। বেদান্তমতেও মায়িক জগৎ ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্ম্মা, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, জগৎ অজ্ঞান-প্রসূত।* ব্রহ্মস্বরূপ অজ্ঞেয় এ সম্বন্ধেও ক্যাণ্টের সহিত বেদান্তের ঐক্য আছে কিন্তু বেদান্ত ও ক্যাণ্ট এই উভয় মতের সহিত এ বিষয়ে

ক্যাণ্টের মতেও মায়িক জগৎ ব্রহ্ম বা আত্মা হইতে অভিব্যক্ত

man is really constituted by the some force as the objective world of nature.........That the absolute is the original synthetic unity from which the external world and the ego have issued by differentiation and in which they return to unity"—( *Ibid* )

* * * * * * * *

"Essence and phenomena are accordingly mutually inseparable in as much as the latter ia always the appearance of an essence and the former is essence only as it manifests itself in phenomena"........."Reason becomes nature in order to become spirit"........"The Idea goes forth from itself in order—enriched—to refurn to itself"

—Falckenberg's *History of Modern philosophy*

* এই পরিদৃশ্যমান জগতের পারমার্থিক ( real ) অস্তিত্ব নাই, এই বেদান্তমত বিজ্ঞান দ্বারাও সমর্থিত হয়। আমাদের বহির্জ্জগতের যে জ্ঞান হয়—যেমন একটা বৃক্ষের জ্ঞান—তাহা বাস্তবিকপক্ষে কতকগুলি শক্তিমাত্র। আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই সকল শক্তি impression-রূপে গ্রহণ করি। সেই impression গুলি কি? না স্পন্দন ( vibrations )। বিশ্বব্যাপী ইথার ( Ether ) সমুদ্রের লঘুগুরু মাত্রাভেদে নানা প্রকার স্পন্দন হইতেছে। আবার ইথারের উপরিস্থ বায়ু মণ্ডলেও সেইরূপ স্পন্দন হইতেছে। আমরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সকল স্পন্দন অনুভব করি। ইথারের যে স্পন্দন আমাদের চক্ষুর রেটিনায় ( retina ) ধরা পড়ে, তাহাই বস্তুর রূপ। বায়ু স্তরের যে



হিগেলের সম্পূর্ণ অনৈক্য। হিগেলের মতে ব্রহ্ম অজ্ঞেয় নহেন জ্ঞানগম্য। ব্রহ্ম স্বরূপ জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন। তিনিই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন। আবার জগৎ ( Phenomenal world ) তাঁহা হইতে অভিব্যক্ত হইয়া তাঁহাতেই চিরন্তনরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। আত্মা ও জগৎ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নরূপে পরমাত্মায় অবস্থিত। বেদান্তমতে ব্রহ্ম নিজ স্বরূপের কোন ব্যত্যয় না করিয়া বিবর্ত্ত দ্বারা জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন ; হিগেলের মতেও ব্রহ্ম জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, কিন্তু সে মায়াদ্বারা নহে ; তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা। আমাদের দ্বৈতবাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও এই কথা

হিগেলের মতেও জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তরূপ, কিন্তু জগৎ তাঁহাতে নিত্যরূপে অবস্থিত

স্পন্দন আমাদের কর্ণপটহে আঘাত করে, তাহাই আমাদের নিকট শব্দ। যে স্পন্দন আমাদের ত্বকের উপর আঘাত করে, তাহাই কঠিন-কোমল বা শীতল-উষ্ণ স্পর্শ। এইরূপে একটি বৃক্ষ হইতে যে সকল স্পন্দন বিচ্ছুরিত হইয়া আমার বিবিধ ইন্দ্রিয় স্পর্শ করিতেছে, সেইগুলিই রূপান্তরিত হইয়া আমার বৃক্ষটির আকার বর্ণাদির জ্ঞান হয়। সুতরাং আমি যাহাকে বৃক্ষ বলিয়া জানিতেছি, তাহা প্রকৃত পক্ষে বৃক্ষ নহে, ইথার সমুদ্রে ও বায়ুস্তরে কতকগুলি স্পন্দনের সমষ্টি ( knot ) মাত্র। অতএব বৃক্ষটি আমার অজ্ঞতা প্রসূত মায়িক পদার্থ, আমার মন ও বুদ্ধি রাজ্যেই ইহার অস্তিত্ব। আমি যখন মন ও বুদ্ধির রাজ্য ছাড়াইয়া, আমার জাগ্রদবস্থা হইতে স্বপ্নে ও সুষুপ্তি অবস্থায় প্রবেশ করিব, তখন এই জড়জগৎ আমার নিকট সূক্ষ্মশক্তিমাত্রে প্রতিভাত হইবে। আমার সমাধি অবস্থায় সেই সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত ক্রমে সত্ত্বরজতমোগুণের অব্যাকৃত (undifferentiated ) অবস্থায় অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়াস্বরূপে বিলীন হইয়া মায়োপহিত চৈতন্য বা ঈশ্বররূপ ধারণ করিবে, সেই মায়োপহিত চৈতন্যই হিগেলের absolute, সেই মায়া যখন ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন বেদান্তের একমেবাদ্বিতীয়ম্ নির্গুণ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকেন।

বলেন। আবার নিরাকারবাদীদিগেরও এইমত বলিয়া বোধ হয়।

যাহা হউক উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা পাইলাম, বেদান্ত মতে ব্রহ্মই এই জগৎরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছেন, এবং এই ব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার শরীর, হিগেলও এই মতের সমর্থন করেন, ব্রহ্ম নিজ স্বরূপের ব্যত্যয় না ঘটাইয়াই এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই বিশ্বরূপ ঈশ্বরই হিন্দুর উপাস্য। সুতরাং হিন্দুর উপাস্য ঈশ্বরের সাকাররূপ আছে।

এখন আমরা দেখিব, এই বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপ হইতে ভগবানের দ্বিভুজ চতুর্ভুজাদি কর-চরণ বিশিষ্ট আকার কি প্রকারে আসিল?

## অনন্তরূপ হইতে সান্তরূপের বিকাশ

নিরাকারবাদীবলেন "পরমেশ্বর অনন্ত সুতরাং তিনি পরিমিত দেহধারী হইতে পারেন না।"

"মূর্ত্তি বলিলেই পরিমিত বুঝায়; সুতরাং অনন্তের মূর্ত্তি নাই, মূর্ত্তি থাকিলেই হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকিবে। শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ। একটি যেখানে শেষ হইয়াছে আর একটি সেখানে আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট শরীর হইলেই, প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবশ্য সীমা থাকিবে, সকল অঙ্গই সকলস্থানে ইহা অবশ্যই অসম্ভব কথা।" *

* সাকার ও নিরাকার উপাসনা, ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ১৬-১৭ পৃষ্ঠা



"সকল অঙ্গই সকল স্থানে, ইহা অবশ্য অসম্ভব কথা,"

অনন্ত ঈশ্বর পরিমিত দেহধারী হইতে পারেন কিনা?

কেন? ইহা তোমার আমার বুদ্ধিতে অসম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে তাহা অসম্ভব হইবে কেন? শ্রুতি বলিতেছেন—

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূত-গুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥—

—শ্বেতাশ্বতর

সেই ভগবানের সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র গ্রীবা; তিনি সর্ব্ব-ভূতের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী; অতএব তিনি সর্ব্বগত মঙ্গলময়।

শ্রুতিকে অনুবাদ করিয়া গীতা বলিতেছেন,—

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি শিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥"

—গীতা ১৩।১৩

ব্রহ্মের সর্ব্বত্র হস্ত, সর্ব্বত্র পদ, সর্ব্বত্র চক্ষু, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র কর্ণ, এই ত্রিভুবনে তিনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন।

অতএব "সকল অঙ্গ সকল স্থানে" ইহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর, কল্পনার অতীত বলিয়া, আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞানের অবস্থায় তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না বলিয়া, আমরা কি বলিব ইহা অসম্ভব?

আমাদের জ্ঞানের অপরিপক্কাবস্থায় যাহা আমরা অসম্ভব বলিয়া মনে করি, জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থায় তাহাই আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়। "অনন্তের মূর্ত্তি" আমাদের অপূর্ণ জ্ঞানে আসে না; কিন্তু একদিন অর্জ্জুন ভগবৎ-প্রসাদে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া স্তব করিয়াছিলেন,—

অর্জ্জুন দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া ভগবানের বিরাট রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

"অনন্ত-বাহূদর বক্ত্র-নেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ॥"—গীতা ১১।১৬

হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ, আমি অনন্ত বাহু, উদর, মুখ ও নেত্রবিশিষ্ট অনন্ত রূপ তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি। কিন্তু তোমার অন্ত, মধ্য আদি কিছুই দেখিতেছি না।

অর্জ্জুন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া একাধারে অনন্ত-বাহূদরাদি অবয়ব বিশিষ্ট ভগবানের অনন্তরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি আমি তাঁহাকে কিরূপ আকারে দেখিব? আমাদের দেশ-কালাদি সীমায় সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া আমরা কি দেখিব?

কিন্তু আমরা তাঁহার সান্ত রূপই দেখিতে পারি

নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

সেই অনন্ত পুরুষকে মনুষ্য ধারণা করিতে পারে না, অথচ সাধকও তাঁহাকে ধরিবার জন্য ক্রমশঃ চেষ্টা করেন। একটি কলসে মহাসমুদ্র হইতে জল তুলিলাম। মহাসমুদ্র কলসের মধ্যে আসিতে পারে না।



কিন্তু কলসের যতটুক আয়তন, সেই পরিমাণ সমুদ্রের জল উহাতে অবশ্যই ধরিবে। পরমেশ্বর অনন্ত হইলেন তাহাতে কি? আমার হৃদয় যতটুক সেই পরিমাণে তাঁহার ভাব অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারি। আমার হৃদয় কলসের যেরূপ আয়তন, অনন্ত মহাসমুদ্রের সেই পরিমাণ জল তাহাতে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইবে।" *

নগেন্দ্রবাবুর এই হৃদয় কলসের উপমাটা বড়ই সুযোগ্য হইয়াছে। ব্রহ্ম হইলেন অনন্ত সমুদ্র, আমার ক্ষুদ্র হৃদয় একটা কলস। স্বর্গীয় সাধক হরিনাথ মজুমদার তাঁহার "ব্রহ্মাণ্ডবেদ" পুস্তকে লিখিয়াছেন ঈশ্বর নিরাকার নহেন 'নীরাকার', জল যেমন যখন যে পাত্রে রাখা যায়, তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, ঈশ্বরও সেইরূপ। ঈশ্বররূপ অনন্ত সমুদ্রও আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় কলসে প্রবেশ করিয়া দেশকালবদ্ধ আকার ধারণ করেন। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, সকলই দেশকাল (space and time) দ্বারা সীমাবদ্ধ ভাবে চিন্তা করি। আমাদের চিন্তা মাত্রেই সাকার চিন্তা। সুতরাং বিশ্বব্যাপী বিরাট-পুরুষকে চিন্তা করিতে হইলেও দেশকাল দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে। অনন্ত আকাশ ও অনন্ত মহাসমুদ্রের ফটোগ্রাফ্ তোল। সে ফটোগ্রাফ্ কি অনন্ত আকাশ ও অনন্ত মহাসমুদ্রকে সমগ্ররূপে প্রকাশ করিবে? কখনই না, ফটোগ্রাফের প্লেট (plate) সেই অনন্তের যতটুকু আকার ধারণ করিতে সমর্থ ও যে ভাবে, যে আকারে, যে বর্ণে ধারণ

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—৪৪-৪৫ পৃষ্ঠা

করিতে সমর্থ সে কেবল তাহাই প্রকাশ করিবে। অনন্ত আকাশ ও অনন্তবিস্তৃত সমুদ্র সেই চতুষ্কোণাকৃতি প্লেটের উপর চতুষ্কোণ আকার ধারণ করিবে। "অনন্ত বাহূদরবক্ত্রনেত্র" অনন্ত পুরুষকেও আমাদের হৃদয়ের ছাঁচে ঢালিলে, তিনি সাকার, সাবয়ব, ত্রিভুজ চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তিতে প্রতিভাত হইবেন, আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় কলসে সেই অনন্ত বিরাট পুরুষের যে কয়েকটি ভাব ধরিতে পারে, তাহা জমাট বাঁধিয়া ( crystallised ) ঈশ্বরের সাকার মূর্ত্তি গঠিত হয়, ইহাই হিন্দুর ইষ্টদেবতা।

হিন্দুর ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি সাকার হয় কিরূপে?

তোমার হৃদয়রূপ প্লেটে ঈশ্বরের জগৎ-স্রষ্টৃত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি গুণের ফটোগ্রাফ্ উঠিলে, তাহাতে যে মূর্ত্তি হইবে, তাহা ব্রহ্মা। ঈশ্বরের জগৎপালকত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদির সমবায়ে যে মূর্ত্তি উঠিবে তাহা বিষ্ণু। জগৎ সংহারকত্ব, পিতৃত্ব জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদির গুণের সমষ্টিতে যে মূর্ত্তি উঠিবে তাহা রুদ্র। আবার মাতৃত্ব, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্যাদি, মঙ্গলভাব, পাপবিনাশের ভাব ইত্যাদি লইয়া যে মূর্ত্তি উঠিবে তাহা দুর্গা। পিতৃত্ব, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মঙ্গলভাব যোগৈশ্বর্য্যাদি লইয়া যে মূর্ত্তি গঠিত হইবে তাহা শিব। ভক্তি-প্রেম যোগৈশ্বর্য্যাদি লইয়া যে মূর্ত্তি উঠিবে তাহা কৃষ্ণ। এইরূপে অনন্তগুণ বিশিষ্ট অনন্তঈশ্বরের যে কয়েকটি ভাব আমাদের হৃদয় কলসে ধরা যাইতে পারে, অথবা হৃদয়ক্ষেত্রে, চিত্রিত হইতে পারে তাহাদের সমবায়ে হিন্দুর উপাস্য ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই সকল উপাস্য দেবতায় ও



ঈশ্বরে কোন ভেদ নাই। কলস মহাসমুদ্রে ডুবাইলে সেই কলসমধ্যস্থ জলে ও সাগরের জলে যেমন কোন ভেদ থাকে না, ( কেবল উপাধিগত ভেদ ),—সেইরূপ এই সকল দেবদেবীর সহিতও ঈশ্বরের কোন ভেদ নাই, কেবল উপাধিমাত্র, নামমাত্র ভেদ। সাধক দ্বিভুজ চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তি উপাসনা করিতে করিতে শেষে দেখিতে পান তাঁহার উপাস্য দেবতা জগৎ-জোড়া, জগৎ-ব্যাপী, জগন্ময়। তিনি অর্জ্জুনের ন্যায় প্রত্যক্ষ দেখিতে পান তাঁহার ইষ্টদেবতা বিশ্বরূপ, বিরাট। তাঁহার ইষ্টদেবতা

সেই সাকার মূর্ত্তিই আবার অনন্তরূপ ধারণ করেন।

"বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখঃ
বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ,—শ্বেতাশ্বতর—

এইজন্য বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, প্রভৃতি সকল দেবতারই বিরাট মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।*

আমরা এইরূপে দেখিলাম, নিরাকারবাদিগণ জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে ঈশ্বরের কার্য্য দেখিয়া যেমন তাঁহাকে "জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, দয়াময়" বলিয়া উপাসনা করেন; সাকারবাদিগণ তাঁহার বিরাট মূর্ত্তির অন্তর্গত দ্বিভুজ চতুর্ভুজ দশভুজাদি মূর্ত্তিতে একাধারে তাঁহাকে "জ্ঞানময়, প্রেমময়, মঙ্গলময়, দয়াময়" রূপে উপাসনা করেন। যেমন নীল

* গীতায় যেমন বিষ্ণুর বিশ্বরূপের উল্লেখ আছে, সেইরূপ শিবগীতায় শিবের, দেবীগীতায় ভগবতীর বিশ্বমূর্ত্তির উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে দেখা যায় অর্জ্জুনের ন্যায় প্রহ্লাদও বিষ্ণুর বিশ্বরূপ দেখিয়া স্তব করিয়াছিলেন।

পীত লোহিতাদি সপ্তবর্ণ সমষ্টিভূত শুভ্র সূর্য্যকিরণ নীল পীত লোহিতবর্ণ-রঞ্জিত কাচনির্ম্মিত গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহ-মধ্যস্থ ব্যক্তির নয়নে কেবল নীল পীত বা লোহিত বর্ণে প্রতিভাত হয়—সেইরূপ সাধকের প্রেমরাগরঞ্জিত হৃদয়ে সেই সর্ব্ববর্ণ, সর্ব্বাকার সর্ব্বগুণের আধার "সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষ সহস্রপাদ" পুরুষ কোন বিশেষ পরিমিত হস্তপদবিশিষ্ট মূর্ত্তিতে ও বিশেষ বর্ণে প্রতিবিম্বিত হন। ঘাসের উপর পতিত শিশিরবিন্দু সূর্য্য-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া দর্শকগণের অধিকৃত স্থান ( angle of vision ) অনুসারে, কাহারও চক্ষে নীল, কাহারও চক্ষে পীত, কাহারও চক্ষে লোহিত, কাহারও চক্ষে ধূসরবর্ণ দৃষ্ট হয় ;—সেইরূপ এক অদ্বিতীয়, সর্ব্বগুণাধার, সর্ব্বাকার সর্ব্বময় ঈশ্বর ভক্তগণের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে, কাহারও নিকট পিতা, কাহারও নিকট মাতা, কাহারও নিকট প্রভু, কাহারও নিকট সখা, কাহারও নিকট প্রেমিকভাবে ; অথবা অন্য ভাষায়, কাহারও নিকট শিব, কাহারও নিকট দুর্গা বা কালী, কাহারও নিকট কৃষ্ণরূপে প্রতীয়মান হয়েন। আর যোগিগণ কঠোর যোগসাধনা, সংযম ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দ্বারা হৃদয়ক্ষেত্রকে কামকলুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ ও শুভ্র করিয়া ধ্যান দ্বারা তাঁহার নির্ম্মল, নিষ্কল, শুভ্র, চিদ্‌ঘন মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,

"হিরণ্ময়ে পরেকোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদোবিদুঃ॥"

—শ্রুতি



"রজঃশূন্য এবং কলাশূন্য ব্রহ্ম হিরণ্ময় পরমকোষে অবস্থিতি করিতেছেন, আত্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে শুভ্রজ্যোতির জ্যোতি বলিয়া জানিয়াছেন।"

## দেবতা ও মন্ত্র

আমরা এইরূপে দেখিলাম সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের বিরাট-রূপের কোন বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে সাকারবাদিগণ শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, রাম, দুর্গা, কালী, সূর্য্য, গণপতি প্রভৃতি দেবতারূপে উপাসনা করেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত ও বৈষ্ণব এই পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় বর্ত্তমান আছেন। যিনি যে মূর্ত্তির উপাসক সেই মূর্ত্তি তাহার ইষ্টদেবতা। এখন কথা হইতেছে, ঈশ্বর কি যথার্থই এই সকল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন, না এসকল মানুষের কল্পনা ? এ সম্বন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে তদ্দারা আমরা বুঝিয়াছি সাধক-দিগের হিতের জন্য ঈশ্বর যথার্থই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এখানে সে সকল শাস্ত্রীয় প্রমাণের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যুক্তিদ্বারাও আমরা বুঝি, যিনি এই বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া আছেন, তিনি লীলাচ্ছলে সেই বিশ্বব্যাপী বিরাটরূপের অন্তর্গত যে কোন ক্ষুদ্ররূপ ধারণে অসমর্থ হইবেন কেন ? যে তড়িৎশক্তি অদৃশ্য-ভাবে আকাশ ভূমি ব্যাপিয়া রহিয়াছে, তাহা উপযুক্ত যন্ত্রের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা যেখানে সেখানে যখন তখন

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপাস্য ইষ্টদেবতা সেই এক বিরাট পুরুষেরই বিভিন্ন আকারে অভিপ্রকাশ।

উজ্জ্বল অগ্নি-শিখারূপে প্রকট হইয়া থাকে। সেইরূপ সাধকের হৃদয়রূপ যন্ত্রে সাধনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা সেই বিশ্বব্যাপী ভগবানের মূর্ত্তি বিশেষ যে আবির্ভাব হইবে তাহার বিচিত্র কি? আমি কেবল কল্পিত আবির্ভাবের কথা বলিতেছি না, সেরূপ আবির্ভাব সাধকের চিন্তাসাপেক্ষ। আমি যে আবির্ভাবের কথা বলিতেছি, তাহা ঈশ্বরের কৃপাসাপেক্ষ—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"—তিনি যাঁহাকে কৃপা করিয়া দর্শন দেন তিনিই তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন।

"অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানু-মানাভ্যাম্"-ব্রহ্মসূত্র-৩।২।২৪

ভক্তিযোগে আরাধিত হইলে তিনি প্রকাশিত হয়েন, শ্রুতি স্মৃতি ইহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যং প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ।"

—ব্রহ্মসূত্র ৩।২।২৫

যেমন সূর্য্যও অগ্নি প্রভৃতি তত্তদুপযোগী সাধন দ্বারা (দর্পণ কাষ্ঠদয় ঘর্ষণ প্রভৃতি দ্বারা) আবির্ভূত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপযুক্ত সাধন দ্বারা প্রকাশিত হন, ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা দ্বারাই তিনি প্রত্যক্ষীভূত হন।

সূর্য্যমণ্ডলে ও চৈতন্য পদার্থে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ

তিনি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যমণ্ডলে এবং চৈতন্য পদার্থে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ, সেজন্য হিন্দুর দৈনন্দিন সান্ধ্যোপাসনায় এই দুইরূপে তাহাকে বিশেষভাবে ধ্যান করার ব্যবস্থা রহিয়াছে, গায়ত্রী মন্ত্র ও সন্ধ্যামন্ত্র পাঠ করিলেই তাহা বুঝা যায়। গায়ত্রী মন্ত্রের অনুবাদ এই—



"সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী তেজের প্রাণভূত, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তির অবচ্ছিন্ন সেই পরব্রহ্মকে আমি চিন্তা করি যিনি জন্মমৃত্যু দুঃখ বিনাশের জন্য উপাসনীয় এবং যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন।"* অবশ্য এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে স্বীয় ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি ধ্যান করিতে হয়, কারণ ইষ্টদেবতা ও পরব্রহ্ম অভিন্ন এবং পরব্রহ্ম ধ্যানের বিষয় নহেন। যাঁহারা সন্ধ্যোপাসনা করেন তাঁহারা সকলেই একথা জানেন। তান্ত্রিক সন্ধ্যার একটি মন্ত্র এই—

"উদ্যদাদিত্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিন্যৈ নিত্য-চৈতন্যোদিতায়ৈ
অমুক দেবতায়ৈ নমঃ।"—

যিনি উদীয়মান সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে প্রকাশিত আর যিনি জগতে চৈতন্য-স্বরূপে নিত্য প্রকাশিত, সেই দেবতাকে নমস্কার।

একথা সকলেই জানেন হিন্দুর আরাধিত ইষ্টদেবতার বিশেষ বিশেষ মন্ত্র আছে। মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা জৈমিনি বলেন—যে দেবতার যে মন্ত্র বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে সেই মন্ত্রই উক্ত

মন্ত্র দেবতার সূক্ষ্ম শরীর

দেবতার শরীর। সেই মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে উক্ত দেবতা চৈতন্য লাভ করিয়া সূক্ষ্মদেহে সাধক-সমীপে উপস্থিত হন।† কোন বস্তুর রূপ কাহাকে বলে? না, সেই বস্তুটি চক্ষুতে অথবা

* "আহ্নিককৃত্য" হইতে উদ্ধৃত ৺ কালীবর বেদান্তবাগীশ ও শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণির ব্যাখ্যা।

† "The natural name of anything is the sound which is produced by the action of the moving forces which constitute it. He, therefore, it is

মস্তিষ্কে যে স্পন্দন সৃজন করে তাহাই তাহার রূপ। রূপ ইথারের স্পন্দন ( vibration ) বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই প্রকার বায়ুস্তরে স্পন্দন সৃষ্ট হইয়া তাহা কাণে অথবা কাণের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে লাগিলে তাহাই শব্দ। কোন বিশেষ শব্দ উচ্চারণ দ্বারা মস্তিষ্কে যে স্পন্দন সৃষ্ট হয়, কোন রূপের দ্বারাও ঠিক সেই স্পন্দন সৃষ্ট হইতে পারে। যেমন ( অং ) শব্দ যদি ( ঋ ) স্পন্দন সৃষ্টি করে, এবং (ম) রূপও সেই (ঋ) স্পন্দন সৃষ্টি করে, তবে (অং) = (ম)। (ম)কে যদি দেবতা ধরা হয় তবে (অং) তাঁহার মন্ত্র; সেই দেবতার শরীর (অং) বর্ণাত্মক; অর্থাৎ (অং) মন্ত্র জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলে, ( ম ) দেবতার সূক্ষ্মদেহে আবির্ভাব হইবে। কিন্তু এ সকল তত্ত্ব কেবল সাধনা দ্বারাই উপলব্ধি হইতে পারে, ইহা যুক্তিদ্বারা বুঝান কঠিন।

---

said, who mentally or vocally utters with creative force, the natural name of anything brings into being the thing which bears that name ( cf "thought and thing are identical"—*Hegel.* ) Thus "Ram" ( রং ) is the Bija of fire: and is said to be the expression in gross sound (vaikhari shabda বৈখারি শব্দ) of the subtle sound produced by the activity of, and which is, the subtle fire-force. The mere utterance however of "Ram" ( রং ) or any other mantra is nothing but a movement of the two lips. When however the mantra is awakened ( Prabudhya ), that is, when there is mantra-chaitanya then the Sadhak can make the mantra work. However this may be in all cases it is the creative thought which insouls the uttered sound, which works now in man's small magic just as it first worked in the grand magical display of the world-creator. His thought was the aggregate, with creative power of all thought. Each man is a Shiva and can attain his power to the degree of his ability to consciously realise himself as such. Mantra ana Devata are one and the same. By Jap the presence of



## নিরাকারবাদীর আপত্তি খণ্ডন

(১) নিরাকারবাদী বলেন,—

"যদি তিনি ( ব্রহ্ম ) দেহধারী নহেন, তবে তাঁহাকে বিশ্বরূপ বলা হয় কেন? এই জগৎ কি তাঁহার দেহ নহে? সাকারবাদী এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের উত্তরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত দর্শন অবলম্বন পূর্ব্বক এইরূপ বলিতেছেন, "যাবৎ নামরূপময় মিথ্যাজগৎ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যাসর্প সত্যরজ্জুকে অবলম্বন করিয়া সত্যরূপে প্রকাশ পায়, বস্তুতঃ সে রজ্জু সর্প হয় এমত নহে, সেইরূপ সত্যরূপ ব্রহ্ম, তিনি মিথ্যারূপ জগৎ বাস্তবিক হয়েন না। এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম, বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া, প্রপঞ্চস্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়াদ্বারা প্রকাশ পায়েন। কিরূপে এখনকার পণ্ডিতেরা লৌকিক কিঞ্চিৎ লাভের নিমিত্তে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন, বিনাশযোগ্য, মূর্ত্তিমান করিতে সাহস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে আঘাত করিতে উদ্যত হয়েন? ইহা হইতে অধিক আশ্চর্য্য আর কি আছে যে, ইন্দ্রিয় হইতে পর যে মনঃ, মনঃ হইতে পর যে বুদ্ধি, বুদ্ধি হইতে পর যে পরমাত্মা, তাঁহাকে বুদ্ধির অধীন যে মন, সেই মনের অধীন যে পঞ্চেন্দ্রিয় তাহার মধ্যে এক ইন্দ্রিয় চক্ষুঃ, সেই চক্ষুর গোচর যোগ্য করিয়া কহেন?" রাজা রামমোহন রায় যাহা বলিয়াছেন,

জগৎ মিথ্যা সুতরাং তাহা কিরূপে সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের দেহ হইবে?

---

the latter is invoked. Jap or repetition of mantra is compared to the action of a man shaking a sleeper to wake him up. * * * * Mantravidya is the science of thought and of its expression in language as evolved from Logos or Shabda Brahman Himself."——*Studies in Mantra Shastra* Part IV by Arthur Avalon ( Sir John Woodroffe ) P 19—20

তাহার তাৎপর্য্য এই যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়। রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। সেইরূপ বেদান্তের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ব্রহ্ম নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ; জগৎ রূপবিশিষ্ট। যাহা রূপবিশিষ্ট তাহা ভ্রান্তি, মায়ামাত্র, মানুষের মনের অজ্ঞানতা মাত্র। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দের বাস্তব সত্তা নাই, সুতরাং রূপ ইত্যাদি জীবের মনেতেই রহিয়াছে, তাহা ব্রহ্মের স্বরূপ নহে।" *

আপত্তিকারিগণ এস্থলে ধরিয়া লইয়াছেন, যে যাঁহারা জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে জগৎকেও নিত্য, চিরস্থায়ী, ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন। বাস্তবিক তাহা কখনই নয়। জগৎকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া কেহ কখনও মানেন না। আর ব্রহ্ম নিত্য পদার্থ বলিয়া, তাঁহার শরীর যে জগৎ, তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে নিত্য অপরিবর্ত্তনশীল হইবে এরূপ কোন বাঁধাবাঁধি আছে কি? ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, এই মনুষ্য শরীরের সহিত জীবাত্মার যেরূপ সম্বন্ধ, জগতের সহিত ব্রহ্মেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। এই মানবদেহ একটি ক্ষুদ্র জগৎ (microcosm) এবং মনুষ্যদেহ সেই বিশ্বরূপ বিরাট পুরুষের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। ইহা যদি সত্য হয়, তবে মানুষের শরীর ক্ষণস্থায়ী বলিয়া কি সে শরীর মানুষের শরীর নহে? এই মনুষ্য দেহ শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্যরূপে—এমন কি সর্ব্বদা প্রতিমুহূর্ত্তে জগতের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জীবের যখন দেহত্যাগ হয় তখন

* ৺ নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত সাকার ও নিরাকার উপাসনা, ১৭—১৮ পৃষ্ঠা।



প্রলয়কালীন জগতের ন্যায় এই শরীরেরও বিনাশ হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যা, পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণবিধ্বংসী হইয়াও যদি এই শরীর মনুষ্য-শরীর হইতে পারিল, তবে জগৎ অনিত্য ও মিথ্যা বলিয়া ব্রহ্মের শরীর হইতে পারিবে না কেন?

যাঁহারা ব্রহ্মকে চক্ষুর গোচরযোগ্য বলিয়া কহেন, তাঁহারা সে স্থানে ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষ্য করিয়া সে কথা বলেন না, তাঁহারা ব্রহ্মের সগুণ ও সাকার রূপ লক্ষ্য করিয়া বলেন। তাঁহার যে সগুণ ও সাকার রূপ আছে তাহা পূর্ব্বে প্রমাণিত হইয়াছে।

ঈশ্বরের দেহ যদি অনিত্য, মিথ্যা হইল তবে সাকারবাদিগণ কি মিথ্যা বস্তুর উপাসক? কখনই না, হিন্দু কখনও মূর্ত্তি পূজা করেন না, যাঁহার মূর্ত্তি সেই ঈশ্বরের পূজা করেন। তুমি তোমার পিতার শরীরের নিকট ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছ, তাহাতে কি সেই জড় শরীরকে প্রণাম করিতেছ, না শরীরধারী পিতাকে প্রণাম করিতেছ? অবশ্য তোমার পিতাকেই প্রণাম করিতেছ, তাঁহার শরীরকে নহে।

পরমেশ্বর বিশ্ব হইলে তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে কি না?

(২) "যাঁহারা বলেন পরমেশ্বর স্বয়ং এই বিশ্ব হইয়াছেন, তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাঁহাদিগকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করি—পরমেশ্বর নিত্য জগৎ অনিত্য। পরমেশ্বর সার, সত্য; জগৎ অসার, অনিত্য; পরমেশ্বর স্থায়ী, অপরিবর্ত্তনশীল; জগৎ অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল। যখন উভয়ের লক্ষণে এতদূর পার্থক্য বা বৈপরীত্য, তখন কেমন করিয়া বলিব

যে জগৎ ঈশ্বর এক, তিনি স্বয়ং এই জগৎ হইয়াছেন। এই জগতের অতীত তাঁহার আর স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না?"—ঐ পুস্তক

ইহার উত্তর অতি সহজ, এই জগতের অতীত তাঁহার স্বতন্ত্র সত্তা অবশ্যই আছে, তিনি "তুরীয়" বা চতুর্থ অবস্থায় জগতের অতীত। গীতায়ও ভগবান বলিয়াছেন—

"বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নং একাংশেন স্থিতো জগৎ।" ১০।৪২

অর্থাৎ আমি কেবল এক অংশদ্বারা এই নিখিল জগৎ ধারণ করিয়া আছি। চণ্ডীতেও ভগবতীকে "জগদংশভূতা" বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাঁহার এক অংশ লইয়া জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। আর রাজা রামমোহনরায়ই ত বলিয়াছেন—নিত্য, সত্য, স্থায়ী, ব্রহ্ম অনিত্য মিথ্যা অস্থায়ী জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন—বিবর্ত্ত দ্বারা। "এই হেতু বেদান্তে পুনঃ পুনঃ কহেন যে ব্রহ্ম, বিবর্ত্তে অর্থাৎ আপন স্বরূপের ধ্বংস না করিয়া, প্রপঞ্চ স্বরূপ দেবাদি স্থাবর পর্য্যন্ত জগদাকারে আত্মমায়া দ্বারা প্রকাশ পায়েন।" ইহাই বেদান্তের মত, এবং অধিকাংশ হিন্দু সম্প্রদায়েরও এইমত। তবে আজ কাল হিগেলের মতাবলম্বী কোন কোন নিরাকারবাদী এই মত মানেন না, তাঁহাদের মতে ব্রহ্মের সহিত জগতের নিত্য সম্বন্ধ, ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, অথচ তিনি আবার অখণ্ড সচ্চিদানন্দ স্বরূপেও অবস্থিতি করিতেছেন, (Absolute contains within itself self and not-self), ইহা কিরূপে সম্ভবপর হয়, তাহা তাঁহারা বুঝাইতে পারেন না।



ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইলেও শরীর ধারণ করিয়া স্বরূপ নাশ করিতে পারেন না

(৩) "এখন কেহ বলিতে পারেন, যে পরমেশ্বর নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ হইলেও তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান্, তখন ইচ্ছা করিলে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে পারিবেন না কেন? ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ভগবান রূপ ধারণ করিবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি?......এই আপত্তির উত্তরে রাজা রামমোহন রায় কি বলিয়াছেন, দেখুন, "জগতের সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান বটেন, কিন্তু তাঁহার আপনার স্বরূপ নাশ করিবার শক্তি তাঁহার আছে, এমত স্বীকার করিলে, জগতের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের নাশ হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যাহার স্বরূপ নাশের সম্ভাবনা সে ব্রহ্ম নহে। অতএব জগতের বিষয়ে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিমান হয়েন, আপনার স্বরূপের নাশে সর্ব্বশক্তিমান নহেন।"—ঐ পুস্তক

এখানে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় একটি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণও সেই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াছেন। ব্রহ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় বা নাশ ঘটিবে কেন? ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি বিরুদ্ধ। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে এবং রাজা নিজেও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম স্বরূপের নাশ না করিয়া বিবর্ত্তদ্বারা এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড-রূপে প্রকাশ পাইতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, এই অনন্ত সাকার মূর্ত্তির সমষ্টিভূত জগদাকারে প্রকাশিত হওয়াতে যদি ব্রহ্মের স্বরূপের ধ্বংস না হইল, তখন সেই জগতের অংশ যে একটি মূর্ত্তি তাহা ধারণ করিলে, তাঁহার স্বরূপের নাশ কেন হইবে? তিনি যেরূপ আত্মমায়া দ্বারা "বিবর্ত্তে" জগদাকারে

প্রকাশিত হইতেছেন, সেইরূপ আত্মমায়া দ্বারা "বিবর্ত্তে" একটি বা ততোঽধিক মূর্ত্তিও পরিগ্রহ করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার স্বরূপ নাশের কোন আশঙ্কা নাই। সেইজন্য গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—

"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" ৪।৬

জন্মরহিত, অবিনশ্বর ও প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও আমি স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়া আত্মমায়া দ্বারা (সাকার মূর্ত্তিতে) আবির্ভূত হই।

সৃষ্ট পদার্থ যতই বড় হউক তাহা পরিমিত কিন্তু ঈশ্বর অনন্ত

"নিরাকার ব্রহ্ম মূর্ত্তি ধারণ করিলে, যে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় হয়, তদ্বিষয়ে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় বলেন,—যাহার মূর্ত্তি স্বীকার, কি ধ্যান, কি প্রত্যক্ষ করিবে, সে যদি অত্যন্ত বৃহদাকার হয়, তথাপি আকাশের মধ্যগত হইয়া পরিমিত এবং আকাশের ব্যাপ্য অবশ্য হইবেক। কিন্তু ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হয়েন, কোন মতে পরিমিত, এবং কাহারও ব্যাপ্য নহেন।" —ঐ পুস্তক

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্ম যেমন সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, মহৎ অপেক্ষাও মহান্, তেমন আবার অণুর অপেক্ষাও অণু হইতে পারেন। "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্।" সুতরাং পরিমিত আকার ধারণ করিলে তাঁহার স্বরূপের বিপর্য্যয় ঘটে না। আমরা যখন তাঁহাকে ধ্যান বা চিন্তা করি তখন তাঁহাকে পরিমিত ভাবেই চিন্তা করিতে হয়। অবশ্য নিরাকারবাদীরাও সেইরূপ চিন্তা



করেন, কারণ মন সকলেরই সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট। তাহাতে তাঁহার স্বরূপের নাশ হয় না কেন?

ভগবান বেদব্যাস নিম্নলিখিত ব্রহ্মসূত্রেও এই তত্ত্বের উত্তম মীমাংসা করিয়াছেন,—

"স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ।" ৩।২।৩৪

আকাশ আলোক প্রভৃতি যেমন স্থানবিশেষ-প্রাপ্তিহেতু তৎস্থান পরিমিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও উপাসনার নিমিত্ত প্রতীকাদি স্বরূপে চিন্তিত হয়েন। তন্নিমিত্ত তাঁহার অপরিমিতত্বের অপলাপ হয় না।

ঈশ্বর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে একটি বৃক্ষের সহিত তাঁহার প্রভেদ কি?

(৫) "যদি একথাও কল্পনা করা যায় যে, পরমেশ্বর মানবদেহ ধারণ করিয়া উপাসকের সম্মুখীন হন, তাহা হইলে ঐ সম্মুখস্থ বৃক্ষটি দেখা আর সেই প্রকাশিত মূর্ত্তি দেখা একই কথা। ঐ বৃক্ষটি ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট হইয়াছে আর সেই মূর্ত্তিও ঈশ্বরেচ্ছায় সৃষ্ট। উভয়ই সৃষ্ট পদার্থ। ঐ বৃক্ষ নিত্য পদার্থ নহে, সেই মূর্ত্তিও নিত্য পদার্থ নহে। ঐ বৃক্ষ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় স্থিতি করিতেছে; সেই মূর্ত্তির স্থায়িত্বও পরমেশ্বরের ইচ্ছায়। ঐ বৃক্ষে পরমেশ্বরের সত্তা রহিয়াছে, সেই মূর্ত্তিতেও পরমেশ্বরের সত্তা আছে। সুতরাং ঐ বৃক্ষকে দেখিলে যেমন পরমেশ্বরকে দেখা হয়, যদি তিনি কোন মূর্ত্তি ধরিয়া প্রকাশিত হন, সেই মূর্ত্তি দেখিলেও তাঁহাকে সেইরূপই দেখা হয়। সৎ চিৎ আনন্দরূপে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার প্রকৃত দর্শন হয় না।"—ঐ পুস্তক

ব্রহ্মকে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে দর্শন অতি উচ্চাধিকারের কথা, নিরাকারবাদিগণ তাঁহার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি দর্শন করেন

কি না, সে তাঁহাদের নিজ নিজ সাধনাধিকারের কথা। কিন্তু আমরা ত সেইরূপ উচ্চাধিকারের লোক খুব কমই দেখিতে পাই। ব্রহ্ম যদি কৃপা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা ভক্তের আরাধিত কোন আকার ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন, তবে সেই মূর্ত্তির সহিত একটি বৃক্ষের আকাশ পাতাল প্রভেদ। কারণ বৃক্ষ জড়, সেই মূর্ত্তি চিন্ময়; বৃক্ষে কেবল তাঁহার সত্তা মাত্র প্রকাশ, ঐ মূর্ত্তিতে তিনি সচেতন পুরুষরূপে আবির্ভূত। কারণ, যেখানেই তাঁহার এইরূপ আবির্ভাবের কথা শুনা যায়, সেখানেই তিনি ভক্তের হৃদয়ে আনন্দের উৎস ঢালিয়া দিয়াছেন, ভক্তকে আশ্বস্ত করিয়াছেন, তাঁহাকে বরাভয় প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাব সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলে, এগুলিও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। নচেৎ সুবিধামত একটি ছাড়িয়া আর একটি গ্রহণ করিলে চলিবে না।

## অনন্ত ও পরিমিত

নিরাকারবাদী বলেন,—

"অনন্ত ঈশ্বরকে ধরিতে পার না বলিয়া তাঁহাকে ছোট করিও না। আপনাকে বড় কর। তোমার হৃদয় মন আত্মাকে প্রশস্ত কর। যতই তোমার হৃদয় মন ও আত্মা প্রশস্ত হইবে, ততই অনন্ত কাল পর্য্যন্ত, সেই অনন্ত পুরুষকে ক্রমশঃ অধিকতররূপে ধারণা করিতে পারিবে।" *

ঈশ্বরকে ছোট না করিয়া আপনাকে বড় কর।

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা" ৫৩ পৃষ্ঠা—



ইহা অতি উত্তম কথা, বলা বাহুল্য নিরাকারবাদী সাকারবাদী সকলেরই এই একই লক্ষ্য। এই কথাই শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এই পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে তাঁহার স্বভাবসুলভ কবিত্বের ভাষায় নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"আকার আমাদের মনের পক্ষে সুগম হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার যে আকারের দ্বারা সুগম হইতে পারেন তাহা নহে—ঠিক তাহার উল্টা।

"মনে কর আমি সমুদ্রের ধারণা করিতে ইচ্ছা করি। সমুদ্র ক্রোশ দুই তফাতে আছে। আমি তাহা দেখিতে যাত্রা করিবার সময় পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, সমুদ্র এতই বড় যে স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার ধারণা হইতে পারে না, কারণ আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, আমরা সমুদ্রের মধ্যে যতই দূরে যাই, যতই প্রয়াস পাই, সমুদ্রকে ছোট করিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। অতএব তোমার অন্দরের মধ্যে একটি ছোট ডোবা খুঁড়িয়া তাহাকে সমুদ্র বলিয়া কল্পনা কর।

"কিন্তু দর্শন শক্তির সাধ্য সীমা দ্বারা সমুদ্র দেখিয়াও যদি সমুদ্রের ধারণা সম্পূর্ণ না হয়, তবে ডোবা হইতে সমুদ্রের ধারণা অসম্ভব বলিলেও হয়।

"অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডলবদ্ধ, কিন্তু তাই বলিয়া ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া আকাশ দেখার সাধ মিটাইতে পারি না, আমি যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই তাহা না দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

"এই যে প্রয়াস, বস্তুতঃ ইহাই উপাসনা। আমার শেষ পর্য্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না; আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকায় অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্য মধ্যে সে হারাইয়া যায় এবং প্রভাকরপ্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চদেশে বিলীনপ্রায় বিহঙ্গমের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তুমি

ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না—তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ। "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"।*

নিরাকারবাদীর ন্যায় সাকারবাদীও "ভূমা" লাভের প্রয়াসী, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেই ভূমা, সেই অনন্ত সত্তা আমাদের মনোবুদ্ধির অগোচর ইহা সাকারবাদী স্পষ্ট স্বীকার করেন, নিরাকারবাদী তাহা স্বীকার করিতে চান না। সাকারবাদী সেই অনন্ত অখণ্ড সত্তাকে সমগ্ররূপে ধরিতে না পারিয়া সান্তের সাহায্যে, সান্তের মধ্যদিয়া তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করেন। তিনি অনন্ত সমুদ্র দর্শনের অভিলাষে অন্তঃপুরে "ডোবা" খনন করেন না, অথবা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া অনন্ত আকাশ দেখার সাধ মিটান না। এখানেই নিরাকারবাদিগণ সাকারবাদীকে ভুল বুঝেন। তিনিও সমুদ্র এবং আকাশের সমীপবর্ত্তী হইয়া থাকেন, সমীপবর্ত্তী হইয়া সেই সমুদ্র ও আকাশের যতটুকু চিত্র তাঁহার হৃদয়মুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়, সেই "অল্পের" সাহায্যে "ভূমা" লাভের প্রয়াস পান। সান্তের সাহায্যে অনন্তকে লাভ করা ভিন্ন, অনন্তলাভ হইতে পারে না, একথা কবিবর নিজেও অন্যত্র স্বীকার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথও বলেন সান্তের মধ্যে অনন্তকে ধরিতে হইবে।

"সীমার মাঝে অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

* "আধুনিক সাহিত্য"—সাকার ও নিরাকার



কত বর্ণে কত গন্ধে
কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায়
জাগে হৃদয় পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা
এমন সুমধুর॥"—গীতাঞ্জলি

এখানে কবিবর রূপের দ্বারাই অরূপকে, সসীমের দ্বারাই অসীমকে সুগম করিতেছেন। কবির এই সঙ্গীত হিগেলের উক্তির প্রতিধ্বনি, যথা:—

"A concrete concept would be one which sought the universal not without the particular, but in it; which should not find the infinite beyond the finite, nor the absolute at an unattainable distance above the world, nor the essence hidden behind the phenomenon, but manifestiug itself therein"—*Falkenberg.*

হিগেল বিশেষের মধ্যে সামান্যকে, সান্তের মধ্যে অনন্তকে খুঁজিতে বলেন। এইরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে absolute reality (অনন্ত সত্তায়) পৌঁছা যায়।

অনন্ত সমুদ্রের দর্শন জন্য "ডোবা" খনন রবীন্দ্রনাথ যদি হিন্দুর প্রতিমা পূজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহার এই উপমা খাটে না। আর্টের সাহায্যে কি প্রকারে সান্ত হইতে অনন্তের উপলব্ধি হয়, তাহাও হিগেল দেখাইয়াছেন। আমরা ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহার আলোচনা করিব। এখানে মাত্র প্রতীক অর্থাৎ

প্রতিমা পূজাও সান্তের মধ্যে অনন্তের দর্শন, ডোবার মধ্যে সমুদ্র কল্পনা নহে।

"Symbolic art" এর দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। সকলেই জানেন হিন্দুর শালগ্রাম শিলাতে নারায়ণের পূজা হয়। তাহা কি কেবল সেই প্রস্তর খণ্ডের পূজা? কদাপি নহে। ইহা সেই পূজার মন্ত্রেই প্রকাশ পায়।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
সভূমিং সর্ব্বতঃ স্প্রিত্বাহত্যতিষ্ঠেদ্দশাঙ্গুলম॥"

সেই বিরাট পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু, সহস্র পদ; তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু নাভির উর্দ্ধে দশাঙ্গুলি পরিমিত স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ।

এই মন্ত্র দ্বারা যাঁহার পূজা হয়, তিনি কি অনন্ত বিরাট পুরুষ, "ভূমা" নহেন?

আবার হিন্দুগণ প্রত্যহ যে শিবলিঙ্গের পূজা করেন, তাহা কি সেই মৃত্তিকাখণ্ডের পূজা? তাঁহাকে যে মন্ত্রে স্তব করা হয় তাহা এই,—

"মহিম্নঃ পারংতে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্না স্বয়ি গিরঃ।
অথাহবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতি-পরিণামাবধি গৃণন্
মমাপ্যেষ স্তোত্রে হর নিরপবাদ-পরিকরঃ॥"

হে ভগবন্! তোমার স্তুতি করিতে বসিয়া ব্রহ্মাদিদেবগণের বাক্যও যখন অবসন্ন হয়, তখন আমার ন্যায় অবিদ্বান ব্যক্তি তোমার মহিমার কীর্ত্তন কি প্রকারে করিবে? তবুও সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে কিছু



না বলিয়া থাকিতে পারে না, সুতরাং আমিও সেইরূপ চেষ্টা করিতেছি।

"অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়োঃ
অতদ্ব্যাবৃত্ত্যায়ং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।
স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য নবচঃ॥"

তোমার মহিমা বাক্য মনের অগোচর। বেদও তাহা নিতান্ত ভয় চকিত ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তাহার কে স্তুতি করিবে? তোমার কত গুণ তাহা কেই বা গোচর করিবে? তবে তোমার সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী সগুণরূপ বিষয়ে সকলেরই বাক্য ও মন অগ্রসর হয় সন্দেহ নাই।

* * * * *

"ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতিচ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু-কুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণা মেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

বেদবিহিত মার্গ, সাংখ্য মত, যোগমার্গ, পশুপতি মত, বৈষ্ণবমত এইরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বি সাধক-সম্প্রদায় স্বীয় স্বীয় মতকেই একমাত্র উৎকৃষ্ট ও অবলম্বনীয় মত মনে করেন। মানবগণের রুচিবৈচিত্র্য হেতু এই সকল পৃথক্ পৃথক্ মতের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কোনটা সরল পথ, কোনটা কুটিল পথ। কিন্তু হে বিভো! যেমন সকল দিক হইতে নদীগণ আসিয়া এক সমুদ্রেই পতিত হয়, সেইরূপ এই সকল প্রকার সাধনমার্গের একমাত্র তুমিই গম্য।

* * * * *

"মহীপাদাঘাতাদ্ ব্রজতি সহসা সংশয়-পদং
পদং বিষ্ণো ভ্রাম্যদ্ ভুজ-পরিঘরুগ্ন-গ্রহগণম্
মুহুর্দ্যৌ দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটা তাড়িত তটা
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননুবামৈববিভুতা ॥"

হে মহেশ্বর! তুমি জগৎ রক্ষার জন্য অসুর বিনাশ করিয়া যখন তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলে, তখন পৃথিবী তোমার পদাঘাতে রসাতলে যাওয়ার উপক্রম করিয়াছিল; আকাশপথে ঘূর্ণিত তোমার কঠিন বাহুসকল দ্বারা গ্রহগণ চূর্ণপ্রায় হইয়াছিল; তোমার অসংবৃত জটাজালের তাড়নায় স্বর্গ কম্পিত হইয়াছিল। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য বক্র পথেই প্রকাশিত হয়।

পরমেশ্বরের এত বড় বিশাল কল্পনা ( Sublime Conception ) পৃথিবীর আর কোন ধর্ম্মে, আর কোন ভাষায় আছে কিনা জানি না। ইহা কি "ডোবার" স্তব, না "অগণ্য গ্রহচন্দ্র তারকার অনন্ত জ্যোতিরণ্য ভেদ করিয়া সাধকের অনন্তের পথে যাত্রা"?

উক্ত মন্ত্রে স্তব করিয়া, শিবকে যে মন্ত্রে প্রণাম করা হয় তাহা এই,—

"নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর ॥
তব তত্ত্বং নজানামি কীদৃশস্ত্বং মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব তাদৃশায় নমোনমঃ ॥"

যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ জগতের এই কারণ-ত্রিতয়ের হেতু, যিনি শান্ত, সেই শিবকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! তুমিই একমাত্র গতি, তোমাকে আত্মসমর্পণ করিতেছি। হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপ কি তাহা আমি



জানি না; সেই জন্য হে মহাদেব! তুমি যেরূপই হও, তোমার সেই রূপকেই পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি।

এই মন্ত্রদ্বারা যাঁহার প্রণাম করা হয় তিনি কি সেই ক্ষুদ্র মৃত্তিকা বা শিলাখণ্ডে "সীমাবদ্ধ" থাকেন?

বলা বাহুল্য নিরাকারবাদিগণ সাকারোপাসনার কিছুমাত্র খোঁজ খবর রাখিলে, এই সকল আজগুবি ধারণা পোষণ করিতে পারিতেন না।

"অল্পের" মধ্যেও "ভূমা"কে কি প্রকারে দেখা যায়, স্বর্গীয় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন তাহা এইরূপে বুঝাইয়াছেন,—

"অবলোকন কি? ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে দর্শন করা। নিরীক্ষণ কি? একটি জায়গাতে খুব ভালরূপে তাঁহাকে দেখা। একটু ছোট বিভাগে স্থির ভাবে তাঁহাকে দেখা, কিন্তু যখন সূক্ষ্ম অথবা বিশেষ ভাবে সেই সত্তা নিরীক্ষণ করিবে, তখন এরূপ মনে করা হইবে না যে আমি যতদূর দেখিতেছি ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মের সত্তা নাই। তখন মনে করিবে আমার সাধ্যানুসারে আমি কেবল অল্পাংশ দেখিতেছি।" *

বলা বাহুল্য সকল সাকারোপাসকই সেইরূপ মনে করেন; কেহই মনে করেন না যে আমি যতদূর দেখিতেছি ইহা ভিন্ন আর ব্রহ্মের সত্তা নাই, উল্লিখিত পূজার মন্ত্রই তাহার প্রমাণ।

"একটি বিশেষ অংশে তাঁহার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্যের প্রকাশ দেখিব কিন্তু তার অর্থ এই নহে যে অন্যস্থানে তাহার এ সকল গুণ নাই। কেবল সাধকের সুযোগের জন্য একটি বিশেষ স্থানে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে হয় ( Exactly so—ইহা অতি সত্য কথা ) যদি অসীমভাবে ভাসিয়া

* ব্রহ্ম-গীতোপনিষৎ,—১৯৮—৯৯ পৃষ্ঠা

যাও, তোমার যথার্থ গভীর ব্রহ্মদর্শন হইবে না, আর যদি তাঁহার অনন্তত্ব ভুলিয়া কেবল কিয়দংশ নিরীক্ষণ কর, তোমার ব্রহ্ম পরিমিত হইবে। তুমি যেটুকু বাঁধিলে কেবল সেটুকু ব্রহ্ম নহেন, তাহাছাড়া আরও অসীম ভাবে ব্রহ্ম আছেন, ইহা স্মরণ রাখিবে।"—

ব্রহ্মোগীতোপনিষৎ—২০৭—৮ পৃষ্ঠা

ব্রহ্মানন্দ বলেন "যদি অসীমভাবে ভাসিয়া যাও, তোমার যথার্থ গভীর ব্রহ্ম দর্শন হইবে না।" অথচ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নীল আকাশের অসীম" দিয়া ভাসিয়া যাওয়াই প্রকৃত উপাসনা বলিয়াছেন।

প্রতীক বা প্রতিমাতে ব্রহ্মের অনন্তভাবের যতটুকু ধরা পড়ে তাহা ছাড়া যে তাঁহার আরও অসীমভাব আছে, সাকার উপাসকগণ অহোরহঃ একথা স্মরণ রাখিয়া প্রতিমাদির সাহায্যে উপাসনা করেন। যেমন দুর্গাপূজার সঙ্গে শ্রীশ্রীচণ্ডীপাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সেই চণ্ডীতেই স্মরণ করাইয়া দেয় যে এই ত্রিনেত্রা, দশভুজা মূর্ত্তি, ইহা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মেরই আকারবিশেষ। সেই চণ্ডীর একটি স্তবের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে ঃ—

যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যাদেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্‌ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"



যে দেবী সর্ব্বভূতের মধ্যে চেতনা নামে অভিহিত হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতের মধ্যে বুদ্ধিরূপে আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূতসকলের অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ভূতনিবহে ব্যাপ্তিরূপে বিদ্যমানা, সেই দেবীকে নমস্কার। যিনি চৈতন্যরূপে অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

আমরা এই প্রকারে দেখিলাম, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মতানুসারে সসীম প্রতিমার অবলম্বনে যদি অনন্ত ব্রহ্মের দর্শন করা হয় তবে তাহা পুতুল পুজা বা পৌত্তলিকতা নহে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তাঁহার "সীমার মাঝে অসীম" এই গানটিতে সরূপ অর্থাৎ সাকার দ্বারা কিরূপে অরূপ অর্থাৎ নিরাকারকে উপলব্ধি করা যায় তাহা দেখাইয়াছেন।

---

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## প্রতিমাপূজার প্রয়োজন কি ?

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ নিরাকার হইলেও তিনি সৃষ্টি লীলার জন্য এই জগৎরূপ ধারণ করিয়াছেন। এই চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহার বিরাটরূপ। তিনি আত্মমায়া দ্বারা যেমন এই বিরাটরূপ ধারণ করিয়াছেন, তেমন সাধকের হিতার্থে অথবা ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া আত্মমায়া দ্বারা দ্বিভুজ চতুর্ভুজাদি মূর্ত্তিও ধারণ করেন। সাধক ঈশ্বরের এই সকল মূর্ত্তি মনে মনে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন।

নিত্য পূজার জন্য প্রতিমা একান্ত আবশ্যক নহে

উপাসকের নিত্যপূজার জন্য, ধ্যান ধারণা জপাদির জন্য বাহিরের কোন প্রতিমার আবশ্যক নাই। তবে বাহিরের প্রতিমার প্রয়োজন কি ?

(১) প্রতিমা দেবতার মূর্ত্তিধ্যানের সাহায্য করে।

প্রয়োজন অবশ্যই আছে। প্রত্যেক সাধকের ইষ্ট দেবতার মূর্ত্তি তাঁহার নিজেরই উপাস্য, তিনি তাহা সচরাচর মনে মনে কল্পনা করিয়াই উপাসনা করেন, কিন্তু

নৈমিত্তিক পূজায় একসঙ্গে অনেক লোকের উপাসনার জন্য প্রতিমার প্রয়োজন

এরূপ দেবতারও পূজা করা হয়, যাঁহাকে একসঙ্গে অনেক লোকে উপাসনা করেন। যেমন দুর্গোৎসবের দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি, কালীমূর্ত্তি, জগদ্ধাত্রীমূর্ত্তি, সরস্বতীমূর্ত্তি, বিষ্ণুমূর্ত্তি, রাধাকৃষ্ণমূর্ত্তি,



ইত্যাদি। এই সকল দেবদেবীমূর্ত্তি একসঙ্গে অনেক লোকের ইন্দ্রিয়গোচর ( visualise ) করিবার জন্য প্রতিমার প্রয়োজন। ঈশ্বরের কোন বিশেষ বিশেষ ভাব এই সকল প্রতিমূর্ত্তি বা প্রতিমার সাহায্যে একসঙ্গে অনেক লোকের হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ যেখানে অনেকগুলি ভাবের একত্র সমাবেশ হয়, সেখানে প্রতিমার সাহায্য গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

আমরা ইতিপূর্ব্বে চতুর্থ অধ্যায়ে দেখিয়াছি, ঈশ্বরকে "শক্তিময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পবিত্রতাময়" প্রভৃতি ভাবে চিন্তা করিতে হইলে আমাদিগকে তাঁহার শক্তি, জ্ঞান, মঙ্গল, প্রেম, পবিত্রতা প্রকাশক ভাবের চিন্তা করিতে হয়। আর এইরূপ ভাবিতে গেলে, ক্রমাগতঃ একবিষয় হইতে অন্য বিষয়ে আমাদের মন ঘুরিয়া বেড়ায়, জগতে তাঁহার এইসকল গুণপ্রকাশক কার্য্য খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহাতে চঞ্চল মন আরও অধিকতর চঞ্চল হয়। সুতরাং ধ্যান-ধারণাদি ক্রিয়া সম্ভবপর হয় না। এই কারণে একটি বিশেষ ভাবের অবলম্বনে ঈশ্বর চিন্তা করিলে—যেমন মাতৃমূর্ত্তি অবলম্বনে ঈশ্বরের ধ্যান করিলে, চিত্ত স্থির হইতে পারে। যদি সেই একাধারে শক্তি জ্ঞান মঙ্গল পবিত্রতা প্রভৃতি ভাবের সমাবেশ করা হয় তবে সেই প্রকার মূর্ত্তিদ্বারা উপাসকের চিত্ত কোন বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া অনন্তমুখী হইতে পারে। ঋষিগণ এইজন্য আর্টের ( art ) সাহায্য গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মের বিবিধ ভাবোদ্যোতক সাকার মূর্ত্তির কল্পনা

করিয়াছেন। ইহাকে পূর্ব্বে "Synthetic unity of Divine attributes" বলিয়াছি। এখানে একথাও বলা আবশ্যক, এই বিবিধ দৈবভাবের সমবায়ে গঠিত মূর্ত্তি কেবল মনুষ্যের কল্পনা নহে। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর এই সকল মূর্ত্তিতে উপাসিত হইলে, মন্ত্রসিদ্ধি দ্বারা সাধকের নিকট এই সকল মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন। প্রত্যেক দেবতার মন্ত্র তাঁহার অপ্রকট সূক্ষ্ম শরীর এবং মানসী মূর্ত্তি তাঁহার প্রকট সূক্ষ্ম শরীর। প্রতিমা সেই শরীরের প্রতিকৃতি। বাহিরের প্রতিমা সেই মানসী মূর্ত্তিধ্যানের সহায়তা করে।

সাধকের হিতের জন্ত ঈশ্বরের যে মানসীমূর্ত্তি কল্পিত হয়, প্রতিমা তাহার বাহিরের প্রতিকৃতি

যাহা হউক, একাধারে বহু ঐশ্বরিক ভাবের সমবায়ে যে মূর্ত্তি কল্পিত হইল, ঋষি দেখিলেন তাহা সহজে মনে ধারণা করা যায় না। আমরা সেই সকল ভাবের দ্যোতক জগতে যে সকল চিত্র দেখিতে অভ্যস্ত, ইহা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও জটিল বলিয়া ইহা সহজে কল্পনা করা যায় না। তবে বাহ্যিক কোন প্রতিরূপ দেখিলে, তাহার সাহায্যে ইহা সহজে মনে ধারণা করা যাইতে পারে। সেইজন্য প্রতিমার ব্যবস্থা করা হইল। সকল সাধকের কল্পনা বা চিন্তাশক্তি সমান থাকে না। যাঁহার কল্পনাশক্তি বা ধারণাশক্তি তত প্রখর নহে, তাঁহার পক্ষে এই বাহিরের প্রতিমা সাধনের বিশেষ সহায়। আবার দশভুজা, কালী প্রভৃতি পূজা—যাহা আবালবৃদ্ধবণিতা

মানসী মূর্ত্তির ধ্যানের সহায়তার জন্যও বাহিরের প্রতিমার প্রয়োজন হইতে পারে।



অনেক লোকে একসঙ্গে করিয়া থাকে—তাহার পক্ষে প্রতিমা পূজা একান্ত আবশ্যক, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। একজন সুনিপুণ শিল্পীদ্বারা রচিত বা চিত্রিত একটি মনুষ্যমূর্ত্তি যেমন সেই মানুষ সম্বন্ধে অনেকগুলি ভাব আমার মনে অঙ্কিত করে, সেইরূপ প্রতিমাও ঈশ্বরের মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, দয়া স্নেহাদি ভাব একজন উপাসকের মনে সঞ্চার করে।

## ( ২ ) প্রতিমাতে দেবতার আবির্ভাব জানিয়া পূজাও করা হয়।

একখানা তৈল চিত্র বা একটি ভাস্করমূর্ত্তি ( statue ) যেমন একজন মানুষের প্রতিমূর্ত্তি, মৃত্তিকা কাষ্ঠ পাষাণ নির্ম্মিত প্রতিমা বা পটচিত্রও সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি। কিন্তু এই উভয় প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। তোমার ছবি দেখিলে তোমাকে স্মরণ হয়, কিন্তু তুমি সেই ছবি হইতে পৃথক ভাবে আছ। প্রতিমা সেরূপ নহে। প্রতিমা দর্শনে সেই সর্ব্বভাব-শক্তিগুণের আশ্রয় দেবদেবীমূর্ত্তির স্মরণ হয়, সেই প্রতিমার প্রতিবিম্ব হৃদয়মুকুরে পড়িলে হৃৎপদ্মে তাঁহাকে ধ্যান করা যায়; আবার বাহিরে প্রতিমাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার গুণ ও শক্তি লইয়া বিরাজমান আছেন বলিয়া সেই প্রতিমা অবলম্বনে তাঁহাকে পূজাও করা যায়। পাশ্চাত্যদেশে কোন কোন স্বনামধন্য পুরুষের মৃত্যুতিথি বা অন্য কোন উপলক্ষে তাঁহার

আবার বাহিরের মূর্ত্তিতেঈশ্বরের পূজাও হইতে পারে

প্রস্তরমূর্ত্তি ফটোগ্রাফ বা তৈলচিত্র পুষ্পমাল্যদ্বারা সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে পূজা বা সম্মান করিতে দেখা যায়। সেই চিত্রের মধ্যে উক্ত পুরুষ বিদ্যমান থাকেন না, সেই চিত্র কেবল তাঁহার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু প্রতিমাতে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর অধিষ্ঠিত থাকেন। সুতরাং পুরুষ-বিশেষের চিত্রাবলম্বনে যদি তাঁহার পূজা করা যায়, তবে প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা আরও স্বাভাবিক, কারণ ঈশ্বর প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হিগেল (Hegel) অনন্ত সত্তাকে (absolute) জগৎ হইতে এতদূরে স্থাপন করেন না যে তাঁহাকে ধরা ছোঁয়া যায় না; তিনি পরমাত্মাকে মায়িক জগতের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চাহেন না মায়িক জগতের মধ্যে প্রকটরূপে দেখিতে চান। তাঁহার মতে Subjective spirit বা জীবাত্মা, objective spirit বা জীব জগতের মধ্যদিয়া absolute বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে চায়। তিনি জগৎ হইতে বিচ্ছিন্নভাবে পরমাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহার পরমাত্মা বেদান্তদর্শনের সগুণ ঈশ্বর, তত্ত্বাংশে তাঁহার সহিত বেদান্তদর্শনের (অদ্বৈত মতের) পার্থক্য থাকিলেও সাধনাংশে ঐক্য দেখা যায়। তিনি সান্তজীবের, অনন্ত ব্রহ্মের সহিত মিলনের তিনটি সোপান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—আর্ট (Art), রিলিজিয়ান (Religion), ফিলসফি (Philosophy). আমি দেখাইব হিন্দুর প্রতিমা পূজায়

প্রতিমা পূজা হিগেলের দার্শনিকমত দ্বারা সমর্থিত



এই তিনটি ক্রম মিলিত হইয়াছে। হিন্দুর প্রতিমা পূজা দার্শনিক-শিরোমণি হিগেলের আবিষ্কৃত উচ্চতম দার্শনিক সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থিত।

আর্ট সান্ত হইতে অনন্তে লইয়া যাইবার প্রথম সোপান। আর্ট মাত্রেই সৌন্দর্য্যের উপাসনা, কোন বিশেষ (concrete বস্তুর ধ্যানের দ্বারা সেই অনন্ত চিরসুন্দরের অগাধ সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাওয়া।

সকল প্রকার যথার্থ আর্টের একটা সাধারণ ধর্ম্ম এই যে তাহা অতি সাধারণ ঘটনা বা বিষয়কে বিশ্বব্যাপী, সনাতন ও অনন্ত-ভাবের দ্যোতনা প্রদান করে,—সে আর্ট আমাদের মনে বিস্ময় বা ভয়ের অথবা হাসি বা অশ্রুর সঞ্চারই করুক কিম্বা আমাদের হৃদয়কে কোমল বা কঠোর ভাবাপন্ন করুক। *

হিগেলের মতে আর্ট তিন শ্রেণীর। প্রথম Symbolic art অর্থাৎ আর্টের বস্তু একটা প্রতীক বিশেষ; তাহার নিজের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি নাই, তাহা ব্যঞ্জনা দ্বারা অনন্তের ভাব জাগাইয়া তোলে। আমাদের শালগ্রাম শিলা, শিবলিঙ্গ এই শ্রেণীর আর্ট।

দ্বিতীয় প্রকারের আর্টের নাম "Classic art" তাহাতে

---

* All true art whether it awakes awe or admiration, laughter or tears, whether it melts the soul or steels it to endurance, has a common characteristic, and that is, to raise the single instance, the prosaic or commonplace- act, into its Universal, eternal and infinite Significance."—*Logic of Hegel* by W. Wallace.

কল্পিত বস্তুর ( প্রতিমার ) নিজের সৌন্দর্য্য আছে, আবার তাহা যে ভাবের দ্যোতনা করে তাহারও সৌন্দর্য্য আছে। বস্তুর সৌন্দর্য্য ও ভাবের সৌন্দর্য্য সমান পরিমাণে মেশামেশি, মাখামাখি ভাবে থাকিয়া আমাদিগকে অনন্তের পথে লইয়া যায়। গ্রীকদিগের ভাস্করমূর্ত্তি অধিকাংশ এই শ্রেণীর, হিন্দুদিগের প্রায় প্রত্যেক দেবদেবীর মূর্ত্তি এইরূপ উভয়বিধ সৌন্দর্য্যের আকর।

তৃতীয় প্রকার আর্টের নাম "Romantic art," ইহার মধ্যে বস্তুর সৌন্দর্য্য অপেক্ষা ভাবের দ্যোতনাই অনেক বেশী। যেমন আমাদের কালীমূর্ত্তি বা নটরাজ শিবমূর্ত্তি। অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তিও ধ্যান করিতে করিতে ভক্তের চিত্ত যখন বস্তুর সৌন্দর্য্য ছাড়াইয়া ভাবে তন্ময় হইয়া উঠে তখন সেগুলিও romantic art এর নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এতদ্ভিন্ন চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং কাব্যও romantic art.

হিগেলের মতে, আমরা যাহাদিগকে জড় ও চৈতন্য বলি, তাহাদের মধ্যে মূলতঃ কোন ভেদ নাই—তাহারা উভয়েই পরমাত্মার ( absolute spirit ) অভিব্যক্তির প্রকার-ভেদমাত্র ( different processes of development ), সুতরাং আমরা যাহাকে জড় বলি তাহার মধ্যে চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় আছে, ("intelligence petrified"),—আমরা জড়ের মধ্যে চৈতন্যের কল্পনা করি না, সৃষ্টিও করি না, আমরা কেবল তাহা উপলব্ধি ( realise ) করি। জীবজন্তুর মধ্যে চৈতন্য পদার্থ স্বতঃস্ফূর্ত্ত, তাহা আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে। উদ্ভিদের মধ্যে যে



চৈতন্য আছে, তাহাও জীব জন্তুর মধ্যস্থ চৈতন্যের ন্যায় সুখ দুঃখের সাড়া দেয়। এই তত্ত্ব আচার্য্য স্যর জগদীশচন্দ্র বসু তাঁহার আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করিয়াছেন। উদ্ভিদের নিম্নস্তরের যে জড় পদার্থ ( যেমন মাটী, পাথর ইত্যাদি ) তাহাদের মধ্যেও চৈতন্য সুষুপ্ত আছে, তাহাকে জাগাইবার উপযুক্ত যন্ত্র আবিষ্কৃত হইলেই তাহা ধরা পড়িবে। জড় প্রতিমূর্ত্তির মধ্যে চৈতন্য আছে বলিয়াই তাহা আমাদের আত্মচৈতন্যের নিকট সাড়া দেয়, জড় প্রতিমা আমাদের দিকে তাকাইয়া হাসে কথা কয়। এই ঐক্যের কারণ, যে পরমাত্মা মানুষের হৃদয়ে বসিয়া দেখিতেছেন তিনিই আবার জড় প্রতিমার অভ্যন্তরে বসিয়া দেখা দিতেছেন, ( "The lord of nature is one with the lord of human soul"—*Wallace* ) সুতরাং জড় প্রতিমার মধ্যে চৈতন্যের আবির্ভাব আমাদের মনের কল্পনা নহে তাহা সত্য। শিল্পী তাঁহার কল্পনা দ্বারা সেই আবির্ভাবকে প্রস্ফুট করিয়া তোলেন। তৎপরে উপাসক তাঁহার মন্ত্র দ্বারা এবং ভক্তসাধক তাঁহার ভাবগর্ভ চিন্তা ও ধ্যানের দ্বারা সেই প্রতিমার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। যিনি সাধনমার্গে যত অধিক অগ্রসর, সেই জড় প্রতিমা তাঁহার নিকট তত অধিক জাগ্রত ও প্রাণবন্ত হইয়া সাড়া দেয়। তুমি আমি স্থূলস্তরের মানুষ যে কালীমূর্ত্তিকে পুতুল বলিয়া মনে করি, ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের নিকট তাহা "মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী মূর্ত্তি" রূপে দেখা দিতেন।

আর্টের দ্বারা কল্পিত মূর্ত্তিতে এইরূপ ভাবে দেবতার প্রাণ

প্রতিষ্ঠা হইলে, তখন তাঁহার পূজা আরম্ভ হয়। এই পূজা "religion" এর ব্যাপার। হিগেলের এই religion জ্ঞান-মিশ্রাভক্তির সাধনা।*

এই জ্ঞান মিশ্রাভক্তির সাধনা হইতে সাধক ক্রমে জ্ঞানের চরম সীমায় উপনীত হন। হিগেল তাহার নাম দিয়াছেন Philosophy—"In philosophy absolute spirit attains the highest stage, its perfect self-knowledge."—*Falckenberg.*

এইরূপে আমরা দেখিলাম মানবাত্মা কি প্রকারে art, religion, philosophy দ্বারা সুসংস্কৃত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত মিলিত হইতে পারে। পরমজ্ঞানী আর্য্যঋষিগণ যে সকল নিগূঢ় দার্শনিক তত্ত্ব অবলম্বনে আমাদের উপাসনা পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের তত্ত্বানুসন্ধানে এখন তাহার কিছু কিছু আবিষ্কৃত হইতেছে। হিগেলের মত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে দেব দেবীর প্রতিমা অনন্তপথযাত্রী মানবাত্মার লক্ষ্যবস্তু লাভের অন্তরায় না

* "Religion is not merely a feeling of piety, but a thought of the absolute, only not in the form of thinking"—*Falckenberg,*—"The essence of religion of course for Hegel as for other exponents of its inmost natuie, is a feeling of the gulfs and separations of seculiar consciousness which sees with the believing soul, the inner peace, the absolute harmony of true reality. ..........The sense of utter dependence on God, in complete identity with the sense of absolute independence in God—the strength of faith is the very life of religion"—*Wallace.*



হইয়া বরং তাহার সহায়। কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবন্ধু মিঃ এনড্রুস্ (Rev. C. F. Andrews) মহাত্মা গান্ধীকে একখানা পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে প্রতিমা পূজার উপকারিতা এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

প্রতিমা পূজা সম্বন্ধে এনড্রুস্ সাহেবের মত

"I have traced three elementary and primary factors in traditional Hinduism, as practised by the common people and embodied in their religion. I can only call them by the three forms, marriage, caste and incarna tion."

*    *    *    *    *

Thirdly in the worship of the divine the trend of Hindu genius among the common people has ever been towards the personal and the concrete—towards God as revealed in form, * * * * It has been said truly that the Hindn religious heart among the people shrivels up in an atmosphere of dry abstraction. It may be able, in the future, to eleminate grosser forms of divine representation. But to eleminate divine representation in and through form, would appear to be disastrous in the long run to Hindu faith. For at the centre of all, from the time of the Upanishads onwards, the instinct has grown deeper, that the divine spirit and the human spirit are intimately one, and that all nature is included in the union". *

* *Hindu and Budhist Ideals—Modern, Review Octr. 1922*

মহাত্মা এনড্রুস্ ভারতের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া এবং দীর্ঘকাল বোলপুর শান্তিনিকেতনে অবস্থান করিয়া এ দেশের সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের আচার ব্যবহার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি যেরূপ সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে আর কোন ইংরেজ সেরূপ করেন নাই। একজন খ্রীষ্টীয় মিশনারী হইলেও তাঁহার মত অত্যন্ত উদার, আর তিনি রবীন্দ্র-শিষ্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের মতের দ্বারা অভিভূত না হইয়া যথেষ্ট স্বাধীন চিন্তা করিয়া থাকেন। তিনিই বলিতেছেন, সাধারণ হিন্দুর হৃদয় ঈশ্বরকে abstract (সূক্ষ্ম) রূপে ধারণা করিতে সঙ্কুচিত হয়, concrete (বিশেষ) আকারদিয়া ধারণা করিতেই অভ্যস্ত। মূর্ত্তি পূজার মধ্যে যে সকল স্থূলত্ব প্রবেশ করিয়াছে, তাহা ক্রমে সংশোধিত হইবে, কিন্তু সে সকল স্থূলভাবের জন্য মূর্ত্তি পূজা যদি একেবারে বর্জ্জন করা হয় তবে হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে। উপনিষদের সময় হইতে হিন্দুজাতির এইরূপ বিশ্বাসই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানের কেন্দ্রীভূত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, যে জীব ও ব্রহ্ম মূলতঃ এক এবং এই জগত বা জড় প্রকৃতি সেই মিলনের সহায়তা করে।*

*প্রতিমা পূজা কোন্ সময়ে এদেশে প্রথম প্রচলিত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত কালিদাস কর "Indian Iconography" নামক একটি প্রবন্ধে বলেন "The controversy between Prof. Macdonnel of Oxford and Prof. Vintakeswara of Kombokonam with regard to the development of Hindu Iconography is highly interesting. It established a fact that "there is clear evidence of the use of image from the latest Vedic age onwards"—*Modern Review*, January, 1922 অর্থাৎ প্রফেসার ম্যাকডোনেল ও প্রফেসার ভেনটকেশ্বর এই উভয়ের মধ্যে বিচার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে ভারতবর্ষে মূর্ত্তি পূজা



## নিরাকারবাদীর আপত্তি খণ্ডন।

(১) "সৃষ্টি দেখিলে স্রষ্টাকে মনে হয়, প্রকৃতি দেখিলে পুরুষকে মনে হয়, ইহা মানব মনের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে হইয়া থাকে। তোমার কোন প্রিয়জনের হস্ত রচিত একটি সামগ্রী দেখিলে যেমন সহজে স্বভাবতঃ তাহাকে স্মরণ হইবে, কুম্ভকার নির্ম্মিত মৃণ্ময় মূর্ত্তি দেখিলে সেইরূপ সহজে তাঁহাকে স্মরণ হইবার কি সম্ভাবনা আছে"।*

প্রতিমা দেখিলে কুম্ভকারকেই মনে পড়ে ঈশ্বরকে নহে

অর্থাৎ নিরাকারবাদী প্রকারান্তরে বলিতেছেন, একটি মৃণ্ময় মূর্ত্তি দেখিলে তাহার কর্ত্তা যে কুম্ভকার তাহাকেই স্মরণ হওয়া স্বাভাবিক। বাস্তবিক তাহা সত্য নহে। শিল্প কার্য্য দেখিলে তাহার শিল্পীকেই যদি স্বভাবতঃ মনে পড়িত তবে সুসভ্য পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণের নিকট রাফেল, মাইকেল এঞ্জিলো প্রভৃতি প্রসিদ্ধ চিত্রকরগণের চিত্র এতদূর আদৃত হইবে কেন? শুনিতে পাই কোন কোন বিখ্যাত চিত্রকরের এক এক খানা ছবি দশ বিশ হাজার এমন কি লক্ষ টাকায় বিক্রীত হয়। যাঁহারা এই সকল চিত্রের জন্য এরূপ অজস্র অর্থব্যয় করেন, তাঁহারা কি সেই সকল চিত্রকরের প্রতি মুগ্ধ হইয়া এত অর্থব্যয় করেন? না সেই সকল চিত্র দ্বারা যে সকল ভাব অভিব্যক্ত হয় সেই সকল ভাবের অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হন? যদি চিত্রদ্বারা কেবল চিত্রকরের কথা

সর্ব্বশেষের বৈদিক যুগ হইতে প্রচলিত আছে। অতএব যাঁহারা বলেন বৌদ্ধযুগের পর হইতে মূর্ত্তি পূজার আরম্ভ হইয়াছে, তাঁহাদের মত ভুল।

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"।

মনে পড়িত, তবে তাঁহারা এই সকল চিত্রের জন্য এত অর্থ ব্যয় করিতেন না। সেই সকল চিত্রে কোন বিশেষ চিত্তাকর্ষক ভাবের অভিব্যক্তি হেতু অবশ্য তাঁহারা তাহাদের এত আদর করেন। আজকাল আমাদের দেশেও চিত্রকলার সমধিক আদর হইতেছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে আর বেশী বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

(২) "কোন ব্যক্তির হস্তরচিত একটি সামগ্রী দেখিলে যেমন সেই ব্যক্তিকে স্মরণ হয়, সেইরূপ তাঁহার একখানি ছবি দেখিলে কি তাঁহাকে স্মরণ হয় না? নিশ্চয়ই হয়। মানুষের সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোন পরিচিত ব্যক্তির মূর্ত্তি দেখিলে নিশ্চয়ই তাঁহাকে স্মরণ হয়, কিন্তু সেই অনাদ্যন্ত মহান্ পুরুষের ছবি আঁকিবে কে? সেই ইন্দ্রিয়াতীত, অপার অগম্য, চিন্ময় পুরুষের ছবি আঁকিবে কে? সে শিল্পী, সে চিত্রকর কোথায়? পূজ্যপাদ প্রাচীন মহর্ষি উপনিষদে যাঁহার বিষয়ে বলিতেছেন———"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয় সে পরব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন, কদাপি ভয়প্রাপ্ত হন না * * * * তিনি চক্ষুর গম্য নহেন, বাক্যের গম্য নহেন এবং মনেরও গম্য নহেন। আমরা তাঁহার কিছুই জানি না, এবং ইহাও জানিনা যে কিপ্রকারে তাঁহার উপদেশ দিতে হয়, ইত্যাদি।" *

সেই অনাদ্যন্ত মহান্ পুরুষের ছবি আঁকিবে কে?

তিনি আমাদের বাক্যের অগোচর, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহার বিষয়ে বক্তৃতা করিতে ক্ষান্ত হই? তিনি আমাদের মনের

* সাকার ও নিরাকার উপাসনা।



অগোচর, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহাকে চিন্তা করি না? তাঁহার উপদেশ কি প্রকারে দিতে হয় আমরা জানি না, তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহার সম্বন্ধে অন্যকে উপদেশ দিই না? বাধ্বঋষি বাস্কলি কর্ত্তৃক পরব্রহ্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া চুপ করিয়াছিলেন। উপনিষদ্গম্য নির্গুণ ব্রহ্ম আমাদের বাক্য মন ও উপদেশের অগোচর, তিনি অজ্ঞেয়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার জগদাশ্রিত সগুণ অবস্থা আমাদের বাক্য মন উপদেশের অগোচর নহে। আধুনিক নিরাকারবাদিগণ তাহার এই সগুণাবস্থাই কেবল স্বীকার করেন, তাঁহার উপনিষদ্গম্য নির্গুণাবস্থা স্বীকার করেন না। তাঁহার নির্গুণাবস্থা যেমন আমাদের বাক্য মনের অগোচর, সেরূপ তাঁহার কোন প্রতিমূর্ত্তিও নাই—তাহা নির্ম্মাণ করিতে পারে এমন শিল্পীও নাই। কিন্তু এ জগতে তাঁহার যে সকল জ্ঞান প্রেম মঙ্গল দয়ার কার্য্য প্রকটিত হইয়াছে, ও নিরন্তর হইতেছে, আমরা সে সকল যেমন বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারি, সেইরূপ চিত্রসাহায্যেও প্রকাশ করিতে পারি। বস্তুতঃ ভাষাবিদ্যা (সাহিত্য) ও চিত্রবিদ্যার মধ্যে বড়ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। যাহা কিছু ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, তাহাই আবার চিত্রদ্বারাও ব্যক্ত করা যায়। সেইজন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যেমন সাহিত্যের আদর করেন, সেইরূপ চিত্রবিদ্যারও আদর করিয়া থাকেন। অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের চিত্র হইতে পারে না সত্য, কিন্তু সগুণ সাকার ব্রহ্মের চিত্র ও প্রতিমা হইতে পারে।

(৩) "নতস্য প্রতিমা অস্তি"—এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া নিরাকারবাদী বলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি নাই, ইহা শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

"নতস্য প্রতিমা অস্তি"

প্রথমতঃ আমরা একথা বলিনা যে নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিমূর্ত্তি হইতে পারে। নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন বাক্য মনের অগোচর, সেইরূপ তাঁহার চিত্রও হইতে পারে না। দ্বিতীয় কথা এই, এস্থলে "প্রতিমা" অর্থে প্রতিমূর্ত্তি নহে, উপমা। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মূলের * (Context) সহিত মিল করিয়া ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—

"তস্য তস্যৈব ঈশ্বরস্য অনন্তসুখানুভবত্বাদেতাদৃশদ্বিতীয়াভাবাৎ প্রতিমা উপমা নাস্তি।"

অর্থাৎ সেই ঈশ্বর অনন্ত সুখস্বরূপ, তাঁহার দ্বিতীয় নাই, সেজন্য তাঁহার উপমাও নাই। তিনি অদ্বিতীয় বস্তু বলিয়া তাঁহার সহিত কাহারও তুলনা হয় না।

(৪) "বিশ্বের প্রাণরূপা বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে যে ব্যক্তি মৃত্তিকা-তৃণনির্ম্মিত ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে বদ্ধ করিতে ও তথা হইতে বিসর্জ্জন দিতে চায়, তাহার কি মহা ভ্রম! "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" প্রতিমার সম্মুখে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া পুরোহিত যখন এই মহাবাক্য আবৃত্তি করেন, বুঝেন না তিনি কি

বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তিকে ক্ষুদ্র প্রতিমার মধ্যে কে বদ্ধ করিতে পারে?

* "নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ ॥"—শ্বেতাশ্বতর—৪।১৯
ইঁহাকে কেহ ঊর্দ্ধে, অধেতে, মধ্যে ধরিতে পারেন না। যাঁহার নাম মহদ্‌যশঃ তাঁহার প্রতিমা নাই।



বলিতেছেন? যেদিন হিন্দু সমাজ এই বাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবে, সেদিন চিরদিনের জন্য হিন্দুহৃদয় হইতে পৌত্তলিকতা দূরে পলায়ন করিবে। অনন্তশক্তিকে যে পরিমিত স্থানে বদ্ধ রাখিতে চায়, সে অন্ধ।" *

পুরোহিত ঠাকুর প্রতিমার সম্মুখে "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু" মন্ত্র পড়েন বলিয়া যে তিনি সেই দেবীকে প্রতিমাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহেন, একথা কে বলিল? এই মন্ত্র প্রতিমার নিকট পড়া হয় বলিয়াই কি বুঝিতে হইবে, যে পুরোহিত ঠাকুর অনন্তশক্তিকে পরিমিত স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন? বোধ হয় সকলেই জানেন পুরোহিত কেবল প্রতিমার নিকট চণ্ডীপাঠ করেন না, কেবল দুর্গোৎসব ব্যাপারেই যে চণ্ডীপাঠ হয় এরূপ নহে। যেখানে প্রতিমার নাম গন্ধও থাকে না, পুরোহিত ঠাকুর সেখানেও চণ্ডীপাঠ করেন। পুরোহিত ঠাকুর যদি অনন্তশক্তিকে প্রতিমাতেই আবদ্ধ বলিয়াই বিশ্বাস করিতেন তবে তিনি যখন ও যেখানে প্রতিমা থাকে না, তখনও সেখানে সর্ব্বভূতের মধ্যে বিরাজমানা শক্তিকে পূজা করেন কিরূপে? প্রতিমাতে দেবতার আবাহন ও বিসর্জ্জন হয় বলিয়াই কি সেই দেবতাকে ক্ষুদ্র মূর্ত্তির মধ্যে আবদ্ধ বুঝিতে হইবে? অনন্তশক্তির বিশ্বজগতে যেরূপ প্রকাশ, জড় পদার্থে, মৃত্তিকাতৃণে, মৃত্তিকাতৃণনির্ম্মিত প্রতিমাতেও সেইরূপ প্রকাশ। হিন্দুগণ জলে, স্থলে, ফুলে, পল্লবে, আকাশে, বায়ুতে, তৃণ

* সাকার ও নিরাকার উপাসনা।

লতায়, তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়া থাকেন, প্রতিমাতেও সেইরূপ তাঁহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে প্রভেদ এই—প্রতিমা সেই সর্ব্বব্যাপিনী অনন্তশক্তির কোন বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে, যাহা অন্য স্বাভাবিক জড় পদার্থে করে না। কিন্তু তাহাতে সেই অনন্তশক্তিকে সেই প্রতিমারূপ কারাগারে বদ্ধ করা হয় না। ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, আর্টের বিশেষ ভাবের সাহায্যে অনন্তের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। বাস্তবিক কার্য্যতঃও তাহাই হয়। যিনি প্রতিমা অবলম্বনে অনন্তশক্তিকে ত্রিনেত্রা দশভুজারূপে ধ্যান করেন, তিনিই আবার চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র আকাশ বায়ু জল অগ্নি বৃক্ষ তৃণ প্রভৃতিতেও সেই অনন্তশক্তির পূজা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মাণ্ডে চেতনাচেতন উদ্ভিদের মধ্যে এমন বস্তু নাই, দুর্গোৎসবে যাহার পূজা না হয়। বলা বাহুল্য সেই অনন্তশক্তির বিকাশ রূপেই সে সকলের পূজা হইয়া থাকে। অতএব প্রতিমাতে অনন্তশক্তিকে আবদ্ধ করিয়া রাখা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা।

জড় প্রতিমার পূজা করিতে করিতে চিত্তের জড়তা হয়।

(৫) কেহ কেহ বলেন জড় প্রতিমার চিন্তা করিতে করিতে চিত্তের জড়তা হয়। কিন্তু জড় প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিলে মন জড় হইবে কেন? যখন আমরা জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে চক্ষু মেলিলেই চারিদিকে জড়বস্তু দেখিতেছি, আবার চক্ষু মুদিলেও জড়বস্তুর ভাবনা করিতেছি;—আমরা



শয়নে স্বপনে জাগরণে কেবল জড় বস্তুরই চিন্তা করিয়া থাকি, অথচ কিন্তু আমাদের মন জড় হইয়া যায় না; তখন কেবল ঈশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা করিলেই মন জড় হইয়া যাইবে, ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক কথা।

প্রতিমা দেবতার প্রতিনিধি বলিয়া দেবতার স্থান অধিকার করে।

(৬) "যাঁহারা বলেন দেবমূর্ত্তি—ঈশ্বরের চিহ্ন বা প্রতিনিধি স্বরূপ (substitute) তাঁহাদের কথার উত্তরে সুকবি রবীন্দ্রনাথ সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইংলণ্ডের রাজা আরথারের (king Arthur) সহিত ভিন্নদেশীয় এক রাজকুমারীর বিবাহের কথা হইয়াছিল। কন্যা দেখিবার জন্য রাজা না গিয়া তাঁহার একজন সভাসদ্‌কে প্রেরণ করিলেন, সভাসদ্ অতি সুপুরুষ ছিলেন। তাঁহাকেই রাজা বলিয়া বিবাহার্থিনী কন্যার ভ্রান্তি জন্মিল এবং তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। সুতরাং আরথারের সহিত তাঁহার বিবাহ দুর্ঘট হইল। পৌত্তলিকতা সেইরূপ। পুত্তলিকা যদি চিহ্ন বা প্রতিনিধি হয়, তবে উহা রাজা আরথারের প্রেরিত প্রতিনিধির ন্যায়। লোকে উহাকে প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেছে না। উহাকেই উপাস্য দেবতা বলিয়া মনে করিয়া হৃদয়ের প্রেমভক্তি সকলই উহার চরণে সমর্পণ করিতেছে। ইহা নিশ্চয় যে, প্রতিমাকে লোকে বিশ্বকর্ত্তা বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের নিজ স্বরূপ মনে করে না। তবে বলিতে পারেন যে, কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন। যে দেবতার যেমন আকার, কাষ্ঠে মৃত্তিকাতে তাঁহার সেইরূপ মূর্ত্তি গঠিত হয়। দেবতা আসিয়া তাহাতে আবির্ভূত হন। এইরূপ বলিলে সাধারণ হিন্দুর বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেকটা প্রকৃত কথা বলা হয়। তথাচ ইহা

সম্পূর্ণ সত্য যে অবোধ লোকে প্রতিমা ও প্রতিমাধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে একীভূত করিয়া ফেলে। তাহাদের নিকট মূর্ত্তি ও দেবতা এক।" *

সাহিত্যসম্রাট রবীন্দ্রনাথ এদেশবাসী এবং হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তবুও একজন ভিন্নদেশবাসী খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী ইংরেজ অর্থাৎ তাঁহারই শিষ্য মহাত্মা এনড্রুস সাহেব হিন্দুর প্রতিমাপূজার যে তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা পারেন নাই, আমাদের এ দুঃখ রাখিবার আর স্থান নাই। মায়ার ন্যায় কুসংস্কারের ( pre-judice ) ও একটা "আবরণী শক্তি" আছে, তাহা মহাজ্ঞানীকেও অন্ধ করিয়া ফেলে। যাহা হউক, উদ্ধৃতাংশে কবিবরের উপমার দোষ ঘটিয়াছে। প্রথমতঃ রাজা আরথারের সভাসদ্ যে অর্থে তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া গিয়াছিলেন, প্রতিমা সে অর্থে ঈশ্বরের প্রতিনিধি নহে। রাজা আরথারের নিজের প্রতিকৃতি যে অর্থে তাঁহার প্রতিনিধি প্রতিমাও সেই অর্থে দেবতার প্রতিনিধি। যেমন আরথারের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে কেবল তাঁহাকেই মনে পড়ে, শিব, কৃষ্ণ, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি দেখিলে, পুরাণে বর্ণিত রূপ ও গুণাদি-বিশিষ্ট ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি সেই সেই দেবতাকেই মনে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ; উক্ত রাজকুমারী ভ্রান্তিবশতঃ সেই সভাসদ্ ও রাজাকে এক বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু হিন্দু উপাসক প্রতিমা ও দেবতাকে এক বলিয়া মনে করেন না।

* সাকার ও নিরাকার উপাসনা।



এ বিষয়ে নগেন্দ্র বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহাই সত্য। "কালী, দুর্গা, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি প্রতিমাতে অধিষ্ঠিত থাকেন।" প্রতিমাতে দেবতা আসিয়া আবির্ভূত হন, সুতরাং উপাসকগণ হৃদয়ের প্রেমভক্তি সকলই সেই প্রতিমার চরণে সমর্পণ না করিয়া সেই দেবতার চরণে সমর্পণ করেন। তৃতীয় কথা, পাছে মূর্খলোকে প্রতিমা ও দেবতাকে এক বলিয়া বিশ্বাস করে, এই আশঙ্কায় তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ "প্রাণপ্রতিষ্ঠার" নিয়ম বিধান করিয়াছেন, ও উপাসনার মন্ত্র সকল বাঁধিয়া দিয়াছেন। প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা বুঝা যায়, জড়প্রতিমা পূজার বিষয় নহে, তাহার মধ্যে আবির্ভূত দেবতাই উপাস্য। পূজার মন্ত্র স্থির ও নির্দ্দিষ্ট আছে বলিয়া যে নিতান্ত মূর্খ তাহাকেও বাধ্য হইয়া প্রতিমাকে পূজা না করিয়া তাহার মধ্যস্থ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পূজা করিতে হয়, সেরূপ মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে হয়ত অজ্ঞ লোকে "প্রতিমায়ৈ নমঃ" বলিয়া পূজা করিত। কিন্তু যে পূজার যে মন্ত্র তাহা নির্দ্দিষ্ট থাকাতে "কৃষ্ণায় নমঃ," কি "শিবায় নমঃ," কি "দুর্গায়ৈ নমঃ" এইরূপে প্রতিমাধিষ্ঠিত দেবতাকেই পূজা করে।

---

# সপ্তম অধ্যায়

## কোন্‌দেবতা আদিকারণ ?

এক অদ্বিতীয় সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আমাদের সকলের উপাস্য সন্দেহ নাই, কিন্তু শাস্ত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, বায়ু বরুণ প্রভৃতি নানা দেবদেবীর পূজার বিধান কেন করা হইয়াছে ? ইঁহাদের মধ্যে কোন্ দেবতা আদি কারণ ? আবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার দেবতাকেই সকলের আদি ও সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন।

প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন দেবতাকে সকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন। ইঁহাদের মধ্যে আদি কারণ কে ?

"বৈষ্ণব জানেন, বিষ্ণু সকলের আদি। তাঁহা হইতে শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। শিব ব্রহ্মা প্রভৃতি সকল দেবতা বিষ্ণুর অধীন ও আজ্ঞাকারী। শৈব বিশ্বাস করেন যে শিব সকলের আদি। ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন— ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি সকল দেবতা শিবের অধীন ও আজ্ঞাকারী। শাক্ত মনে করেন শক্তি সকলের মূল। বিষ্ণু শিব ব্রহ্মাদি সকল দেবতাই শক্তি হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি সকল দেবতাই শক্তির অধীন ও আজ্ঞাকারী। হিন্দু সম্প্রদায়সকলের মধ্যে এই গুরুতর মতবিরোধ বর্ত্তমান। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতে যে বিরোধ দেখিতেছি, শাস্ত্রেও সেই বিরোধ। বৈষ্ণব



শাস্ত্রে বিষ্ণুই প্রধান, অন্য সকল দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন। অন্যান্য শাস্ত্র সম্বন্ধেও সেইরূপ।"*

এতদ্ভিন্ন নিরাকারবাদিগণ আরও একটি প্রশ্ন করেন। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই পুস্তকের সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

এই সকল দেবতাকে শাস্ত্রে জন্ম-মৃত্যু রাগদ্বেষাদি লৌকিক ধর্ম্মের বশীভূত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে কিরূপে ?

"আমাদের দেশের দেবতা কি কেবল মূর্ত্তিতেই বদ্ধ যে রূপক ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে আমরা ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিব ? চারি হাতকে যেন আমরা চারিদিকবর্ত্তী কর্ম্মশীলতা বলিয়া মনে করিলাম, কিন্তু পুরাণে উপপুরাণে যাত্রায় কথকতায় তাঁহার জন্মমৃত্যুবিবাহ রাগদ্বেষ সুখদুঃখ দৈন্যদুর্ব্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্ত করিব কেমন করিয়া ?"

আর একজন সমালোচক বলেন,—

"এইসকল দেবতার আকার ভিন্ন, পূজাপদ্ধতি ভিন্ন, পূজোপকরণ ভিন্ন। এই সকল সাম্প্রদায়িক কল্পিত দেবতাগণের পরিবার পরিজন আছে, তাঁহারা পরস্পর হইতে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্নের জন্য আগ্রহান্বিত, তাঁহারা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন, লোকে যেমন ছল ও কৌশল অবলম্বন করিয়া অপরকে পরাজয় করে, ইঁহারাও সেইরূপ চেষ্টায় তৎপর। আত্ম-প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মিথ্যাচরণে রত এবং নানাপ্রকার লৌকিক আচার ব্যবহার ও লৌকিক প্রকৃতিসম্পন্ন †।

---

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা।"

† "অযথা অভিযোগ"—তত্ত্বকৌমুদী, ১৬ই আষাঢ় ১৮২১ শক।

আগে প্রথম প্রশ্নের মীমাংসা কি দেখা যাউক। "কোন্ দেবতা আদি কারণ?"

প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোক আপনার দেবতাকেই সকলের আদি ও সকলের স্বষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন ইহার অর্থ কি?

প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তাহার উপাস্য দেবতাকে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বলিয়া জানেন, তিনিই আদি কারণ।

ইহার অর্থ এই যে, সকল সম্প্রদায়ের লোকই একমাত্র অদ্বিতীয়, সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন, সগুণ ব্রহ্মের আরাধনা করেন। যদি শৈব শিবকে সকলের স্বষ্টিকর্ত্তা ও আদি বলিয়া না মানিয়া বিষ্ণুকে সকলের (এমন কি শিবেরও) স্বষ্টিকর্ত্তা ও আদি বলিয়া মানিতেন, কিম্বা বৈষ্ণব যদি বিষ্ণুকে আদি ও স্বষ্টিকর্ত্তা বলিয়া না মানিয়া শিবকে সকলের (এমন কি বিষ্ণুরও) আদি বলিয়া মানিতেন, তাহা হইলে শৈবকে শিবের উপরে ও বৈষ্ণবকে বিষ্ণুর উপরে অন্য দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইত। সুতরাং এক ঈশ্বরের উপর অন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইত, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে বহু ঈশ্বরের উপাসনা অনিবার্য্য হইত। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের লোকই যখন আপনার ইষ্টদেবতাকে সকলের আদি ও স্বষ্টিকর্ত্তা বলিয়া জানেন, তখন সকলেই—এই "অদ্বিতীয়" ব্রহ্মের উপাসনা করেন।

সাধারণের বিশ্বাস ও এইরূপ

সর্ব্বসাধারণে এমন কি ইতর শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত জানে যে তাহাদের ইষ্ট দেবতা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, সকলেই বলে "এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" *

* পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রসিদ্ধ ব্রাহ্ম বাবু রাজনারায়ণ বসু বলেন—বেদ, স্মৃতি পুরাণ,



একব্রহ্মাই যে নাম ও রূপ ভেদে শিব বিষ্ণু দুর্গা কালী প্রভৃতি আকার ধারণ করেন তাহা হিন্দুসমাজের সকলেই জানেন ও বিশ্বাস করেন। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি সর্ব্বজনাদৃত গান ইহার প্রমাণ—তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"হৃদয়-রাস-মন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে।
হ'য়ে বাঁকা, দে মা দেখা, শ্রীরাধারে সঙ্গে নিয়ে॥
নরকরকটি বেড়া, ত্যজে পর মা পীতধড়া,
মাথায় পর মা মোহন চূড়া, চরণে চরণ দিয়ে।
ত্যজিয়ে ভীষণ অসি, করে নে মা মোহন বাঁশী,
বাজা মা হ'য়ে উল্লাসী জয় রাধে শ্রীরাধে ব'লে।
নরশির-মুণ্ডমালা ত্যজে পর মা বনমালা,
কালী ছেড়ে হ'মা কালা, হাদে গো পাষাণীর মেয়ে॥"

---

"কেজানে তোমার মায়া, ওহে শ্রীহরি।
পুরুষ প্রকৃতি হও কভু ত্রিপুরারি॥
কভু ব্যাঘ্র চর্ম্ম পর, কভু বা মুরলী ধর,
কভু হও নরহর, রণস্থলে দিগম্বরী।
তব মায়ায় বদ্ধ বলি, ত্রিপাদ ভূমি দিবে বলি,
ছলনা করিয়ে ছলী, পাঠাইলে নাগপুরী।
জয় বলে রাম রাম, আকার ভেদ, ভেদ নাম,
যেই শ্যামা সেই শ্যাম, ভাব মন ঐক্য করি॥"

তন্ত্র সকল হিন্দু শাস্ত্রই সেই একমাত্র পরম ব্রহ্মকে কীর্ত্তন করিতেছে, সকল সাধারণ হিন্দু অবিশুদ্ধ সংস্কৃতে বলিয়া থাকে "একব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি।" ব্রহ্মই সকল হিন্দুর উপাসিত দেবতা।" দাসী ১৭২ পৃষ্ঠা ৫ ভাগ, ৩য় সংখ্যা।

এইত গেল সাধারণের বিশ্বাসের কথা। শাস্ত্রেও সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে। শৈব শাস্ত্র বলেন, শিব সকলের আদি, অন্য দেবতা তাঁহা হইতে উৎপন্ন ও তাঁহার অধীন;

শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তাহাই

ইহার কারণ শিব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলেন, বিষ্ণু সকলের আদি ও অন্য দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা, কারণ বিষ্ণু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। শাক্ত শাস্ত্র বলেন, শক্তি সকলের আদি, অন্য দেবতা তাঁহার অধীন, কারণ শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। গাণপত্যশাস্ত্র বলেন গণপতি সকলের আদি ও অন্য দেবতা তাঁহার অধীন, কারণ গণপতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। সুতরাং সকল শাস্ত্রেই এক অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই প্রাধান্য স্বীকার ও তাঁহার উপাসনা প্রতিপাদন করিতেছেন। শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি প্রভৃতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নামরূপের ভেদমাত্র। অন্য দেবতা তাঁহার অধীন বলায় "একেশ্বরবাদ" প্রতিপন্ন হইতেছে। এখন এ বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে।

সাকার ও নিরাকার উপাসনা পুস্তকে এইসকল দেবতার ভেদ প্রতিপাদন করিবার জন্য যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তদ্দারাই এই অভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে।

### কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয়ব্রহ্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ হইতে যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যথা,—



"ব্রহ্মাণ্ডাণাঞ্চ সর্ব্বেষামীশ্বর শ্চৈব এব সঃ।
সর্ব্বেষাং পরমাত্মা চ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
ব্রহ্মাদয়শ্চ তস্যাংশাস্তস্যাংশশ্চ মহাবিরাট্।
তস্যাংশশ্চ বিরাট্ ক্ষুদ্র স্তস্যাংশঃ প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥"

"হে মুনে! শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ। তিনিই সকলের পরমাত্মা এবং তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বর। ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহাবিরাট্ ও ক্ষুদ্র বিরাট্ সকলেই তাঁহার অংশভূত।"

এখানে দেখিলাম সেই এক অদ্বিতীয় বিশ্বরূপ ব্রহ্মই শ্রীকৃষ্ণ নামে অভিহিত হইয়াছেন।

বায়ু পুরাণে বিষ্ণুকে স্তব করা হইতেছে,—

"দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি প্রাণাহঙ্কারবর্জ্জিতং।
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-বিনির্ম্মুক্তং তং নমামি গদাধরম্॥"

যিনি দেহ, মন, ইন্দ্রিয় বুদ্ধি, প্রাণ অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত, যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাত্রয় বিনির্ম্মুক্ত সেই বিষ্ণুকে নমস্কার।

অতএব এখানেও বিষ্ণু পরমাত্মা।

বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্তব করিতেছেন,—

"নমস্তে পুণ্ডরীকাক্ষ নমস্তে পুরুষোত্তম।
নমস্তে সর্ব্বলোকাত্মন্ নমস্তে তিগ্মচক্রিণে॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥
ব্রহ্মত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ।
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং ত্রিমূর্ত্তয়ে॥

* * * *

রূপং মহত্তে স্থিতমত্র বিশ্বং
ততশ্চসূক্ষ্মং জগদেতদীশ।
রূপাণি সর্ব্বাণি চ ভূতভেদা
স্তেষ্বন্তরাত্মাখ্য মতীবসূক্ষ্মম্॥
তস্মাচ্চ সূক্ষ্মাদি বিশেষণানাং
অগোচরে যৎ পরমাত্মরূপম্।
কিমপ্যচিন্ত্যং তবরূপমস্তি
তস্মৈনমস্তে পুরুষোত্তমায়॥

*　　*　　*　　*

ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ॥
নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ মহাত্মনে।
নামরূপং ন যস্যৈকো যোঽস্তিত্বেনোপলভ্যতে॥
যস্যাবতাররূপাণি সমর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ।
অপশ্যন্তঃ পরং রূপং নমস্তস্মৈ মহাত্মনে॥
যোঽন্তস্তিষ্ঠন্নশেষস্য পশ্যতীশঃ শুভাশুভং।
তং সর্ব্বসাক্ষিণং বিষ্ণুং নমস্তে পরমেশ্বরম্॥"

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি তীক্ষ্ণচক্র ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকর, ও জগতের মঙ্গলসম্পাদক গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। তুমি ব্রহ্মস্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাক, বিষ্ণু-রূপে স্থিতিতে পালন করিতেছ, এবং কল্পান্তে রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক। * * * * * * * * *



এইপ্রকার ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহৎরূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। নানাপ্রকার জীবজন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এবং এই জীবজন্তুগণের যে অন্তরাত্মা আছে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এতৎ সমুদায়ই তোমার রূপভেদ। এই অন্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদি বিশেষণের বিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ কোন এক অচিন্ত্যরূপ আছে তোমার সেই পুরুষোত্তম নামক রূপকে নমস্কার করি * * * * * কোন পদার্থই যাহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু যিনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, সেই ভগবান বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। দেবগণ যাঁহার সূক্ষ্মরূপ নেত্রগোচর করিতে না পারিয়া অবতাররূপকে অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বরকে নমস্কার করি।" ("হিন্দুত্ব" হইতে উদ্ধৃত ৺জগন্মোহন তর্কালঙ্কারের অনুবাদ)।

সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বাহুল্য ভয়ে আর শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম না। এইরূপে আমরা দেখিলাম, হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

## শিব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম

শৈবশাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে শিব ব্রহ্ম। যথা—শিব-পুরাণে মহাদেব-স্তোত্র,—

"গুহাশয়ং বেদবিদো বিদুস্তাং
অনন্তমাদ্যং বিবিধপ্রকারং।
সৃজস্যদো বিশ্বমলোকলোকং
রজঃ সমাসাদ্য বিভো পরাত্মন্॥

অন্তঃ সমাসাস্থ চসত্ত্বভাবং
বহিস্তমঃসাস্থ চ নীলবর্ণং।
বিভূতিভি র্দৈত্য-বিদারিতাভিঃ
প্রজা ইমাঃ পাসি তথান্তরাত্মন্॥" দ্বিতীয় অধ্যায়।

বেদজ্ঞব্যক্তিগণ তোমাকে হৃদয়গুহানিবাসী, অনন্ত, আস্থ প্রভৃতি নানাভাবে জানেন। হে বিভো, হে পরমাত্মন! তুমি রজগুণ অবলম্বন করিয়া চরাচর বিশ্ব সৃজন করিয়া থাক। অন্তরে সত্ত্বভাব ও বাহিরে নীলবর্ণ তমোভাব ধারণ করিয়া, হে অন্তরাত্মন্ তুমি দৈত্যবিধ্বংসকারী বিভূতি সকলের দ্বারা এই সকল প্রজাপালন করিয়া থাক।

শিবপুরাণ হইতে উদ্ধৃত বচন যথা—

"ভো! রক্তাঙ্গ! ব্রহ্মরূপী ভবাশু। জগৎ সর্ব্বং ত্বং রজসা ত্বং সৃজস্ব। অসৌ কৃষ্ণ পাতু এতত্তু সর্ব্বং। ত্রিভিগু ণৈশ্চাচ্ছাদিতোঽহং স্বশক্ত্যা।"

"মহাদেব স্তবে তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে ও বিষ্ণুকে পালন কার্য্যে ভার দিয়াছিলেন। হে রক্তাঙ্গ! তুমি অচিরাৎ ব্রহ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক রজোগুণ দ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন কর। এবং এই কৃষ্ণ সমস্ত বিশ্বমণ্ডল রক্ষা করুন। আর আমি নিজ শক্তিবলে সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিলাম।"

শিব নিজ শক্তিবলে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিলেন, ইহার অর্থ কি? সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি বা মায়া। সেই মায়াদ্বারা আচ্ছাদিত যিনি, তিনি মায়োপাধি সগুণব্রহ্ম। অতএব এখানে শিব ব্রহ্মরূপে উক্ত হইয়াছেন। তৎপরে লিখিত হইয়াছে,



"ব্রহ্মা ও বিষ্ণু শিবের আজ্ঞালাভ করিয়া তাঁহাকে পূজা করিলেন, এবং নিজ নিজ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।"

"সংপূজ্যৈনং—সর্ব্বভূতান্তরস্থং
ব্রহ্মাচ্যুতৌ কৃতকৃত্যৌ তু ভূত্বা
স্পৃষ্ট্বা স্পৃষ্ট্বা ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরেষঃ
তত্তদ্বাক্যং পালয়ামাস সর্ব্বং॥"

এখানে স্পষ্টরূপে শিবকে সর্ববভূতের অন্তরাত্মা বা ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। অতএব এ বিষয়ে সংশয়ের কোন কারণ নাই।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিবস্তোত্র যথা,—

"যো দেবানাং প্রভবশ্চোদ্ভবশ্চ
বিশ্বাধিপো রুদ্রো মহর্ষিঃ।
হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস পূর্ব্বং
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু॥

* * * *

সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ সর্ব্বভূতগুহাশয়ঃ।
সর্ব্বব্যাপী স ভগবান্ তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ॥
মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং প্রাপ্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥"

যিনি দেবতাগণের সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁহা হইতে দেবগণ সমৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই মহর্ষি (জ্ঞানময়) রুদ্র আমাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন। তাঁহার সর্ব্বত্র মুখ, সর্ব্বত্র মস্তক, সর্ব্বত্র গ্রীবা, তিনি সর্ব্বভূতের হৃদয়গুহায় বাস করেন; ভগবান্ শিব সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি সর্ব্বগত, অর্থাৎ সর্ব্বত্র বিদ্যমান্ আছেন। সেই,

অব্যয়, জ্যোতির্ম্ময়, মহান্ প্রভু, পুরুষ সর্ব্বপ্রাণীকে সুনির্ম্মল (পুণ্যের) পথে, প্রবর্ত্তন করেন ; সেজন্য তাঁহার নাম ঈশান।

এতদ্দ্বারা শিব যে ব্রহ্ম তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। শিব-গীতায় শিবের উক্তি যথা,—

"এক এব যতো লোকান্ বিসৃজামি সৃজামি চ।
বিবাসয়ামি গৃহ্ণামি তস্মাদেকোঽহমীশ্বরঃ ॥
ন দ্বিতীয়ো যতস্তস্থে তুরীয়ং ব্রহ্ম যৎ স্বয়ং।
ভূতান্যাত্মনি সংহৃত্য চৈকো রুদ্রো বসাম্যহম্ ॥
সর্ব্বলোকান্ যদীশেঽহমীশিনীভিশ্চ শক্তিভিঃ।
ঈশানমস্য জগতঃ স্বদৃশং চক্ষুরীশ্বরম্ ॥
ঈশানমীন্দ্রতস্থং যঃ সর্ব্বেষামপি সর্ব্বদা।
ঈশানঃসর্ব্ববিদ্যানাং যদীশান স্তদস্ম্যহম্ ॥
সর্ব্বান্ ভাবান্ নিরীক্ষেঽহমাত্মজ্ঞানং নিরীক্ষয়ে।
যোগং চ সময়ে যস্মাদ্ ভগবান্ মহতো মতঃ ॥
অজস্র যচ্চ গৃহ্ণামি সৃজামি বিসৃজামিচ।
সর্ব্বলোকান্ বাসয়ামি তেনাহং বৈ মহেশ্বরঃ ॥
মহৎস্বাত্মজ্ঞান যোগৈরৈশ্বর্য্যৈস্ত মহীয়তে।
সর্ব্বান্ ভাবান্ মহাদেবঃ সৃজত্যবতিসোঽস্ম্যহম্ ॥
এবোঽস্মি দেবঃ প্রদিশোঽপি সর্ব্বাঃ
পূর্ব্বোহি জাতোঽস্ম্যহমেব গর্ভে।
অহং হি জাতশ্চ জনিষ্যমাণঃ
প্রত্যগ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতো মুখঃ ॥
বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো
বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।



স বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ
র্দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব এক ॥"

পঞ্চম অধ্যায় ৩৭—৪৫।

"একমাত্র আমিই সমস্ত লোকের সৃষ্টি, সংহার, লোকান্তর প্রাপ্তি এবং অনুগ্রহ করিয়া থাকি। তাই আমি এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছি। আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তুর সত্তা নাই, আমি তুরীয় রুদ্র স্বরূপ, আমি ব্রহ্মরূপে ভূত সমুদায়কে আত্মাতে সংযত করিয়া অবস্থিতি করিতেছি, যেহেতু মায়াশক্তিদ্বারা আমি সমস্ত লোককে নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছি, সেইকারণে আমাকে ঈশান বলে। তাই শ্রুতিও আমাকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগতের ঈশান, সর্ব্বলোকদ্রষ্টাচক্ষু অর্থাৎ অভিব্যঞ্জক, সত্তাপ্রদবস্তু, এবং ঈশ্বর বলিয়াছেন। আমি স্থাবর পদার্থের ঈশ্বর, অধিক কি আমি সমস্ত পদার্থেরই ঈশ্বররূপে বিদ্যমান আছি ; আমি সমস্ত বিদ্যার ঈশ্বর, তাই আমি ঈশান নামে অভিহিত হইয়া থাকি। আমি অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, আমি মহাপুরুষগণের সম্বন্ধে আত্ম-জ্ঞান সাধনযোগ সমুদ্বোধন করি, এবং আমি সমস্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থিত আছি ; তাই আমাকে ভগবান্ (ঐশ্বর্য্যশালী) বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। আমি এই সমস্ত লোককে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছি, আমি সমস্তলোকের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার করিয়া থাকি, তাই আমাকে মহেশ্বর বলে। আমি আত্মজ্ঞান ও যোগগম্য বস্তু, আমি ঐশ্বর্য্যশালী, এবং আমি সমস্ত পদার্থকে সৃষ্টি ও রক্ষা করি, তাই আমি ব্রাহ্মণাদির মধ্যে মহাদেব বলিয়া অভিহিত হইয়াছি। আমিই শ্রুতি-প্রতিপাদিতদেব, আমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছি। আমিই পূর্ব্বে উৎপন্ন হইয়াছি, আমিই গর্ভে বিদ্যমান আছি, এবং আমিই গর্ভ হইতে নির্গত হইয়া উৎপন্ন হইব। পরন্তু আমি সর্ব্বজন স্বরূপ, তাই আমাকে সর্ব্বতোমুখ বলে। আবার

আমিই সত্য, জ্ঞান ও আনন্দরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকি, তাই আমাকে প্রত্যক-চৈতন্ত বলিয়া থাকে। আমি বিশ্বরূপ, তাই আমাকে সর্ব্বত্রচক্ষু, সর্ব্বত্রমুখ, সর্ব্বত্রবাহু, এবং সর্ব্বত্রপাঙ্গ বলিয়া থাকে। একমাত্র আমিই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া বাহু ও চরণদ্বারা আকাশ ও পৃথিবীস্থ পদার্থকে প্রেরণ করিতেছি।"

বলা বাহুল্য এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে শিব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

এইরূপে শাক্তশাস্ত্রসকলের মতে,

## শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম

যথা মার্কণ্ডেয় চণ্ডী,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু যা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমোনমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

যে দেবী সর্ব্বভূতের মধ্যে চেতনা নামে উক্ত হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যে দেবী সকল ভূতের মধ্যে বুদ্ধিরূপে আছেন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যিনি ইন্দ্রিয় ও ভূত সকলের অধিষ্ঠাত্রী, এবং যিনি ভূতনিবহে ব্যাপ্তিরূপে বিদ্যমানা, সেই দেবীকে নমস্কার। যিনি চৈতন্যরূপে এই অখিল জগৎ ব্যাপিয়া আছেন, সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।



দেবীভাগবতে বিষ্ণু ভগবতীকে স্তব করিতেছেন,—

"সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ।
পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমোনমঃ॥
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমোনমঃ।
অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হৃল্লেখায়ৈ নমোনমঃ॥
বিস্তার্য্য সর্ব্বমখিলং সদসদ্‌বিকারং
সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে।
তত্ত্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব সপ্তভিশ্চ।
ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল বঞ্চনায়।"

"যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপা, সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীকে প্রণাম করি। মাতঃ, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (সৃষ্টিস্থিতি, সংহার তিরোভাব, এবং নিজ সর্জ্জনীয় নিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ) পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই একমাত্র বিধাত্রী। অতএব হে ভুবনেশ্বরি! তোমাকে বারংবার প্রণাম করি। যিনি এই মিথ্যাভূত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ (বিবর্ত্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে প্রণাম করি। যিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছেন, সেই অর্দ্ধ-মাত্রাস্বরূপা (প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা তৃতীয়াবস্থা প্রকাশক) হৃল্লেখাকে প্রণাম করি। জননি! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শবিকার ও মহদাদি সপ্তবিকৃতি প্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ প্রভৃতি মূর্ত্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূতময় এই জগৎকে স্থূলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃরূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জনকারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন। অতএব মাতঃ! আপনার

এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদের বুদ্ধিতে ঠিক যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে।

দেবীভাগবতে এইরূপ সহস্র শ্লোক আছে। বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত করিলাম না।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের গণপতি খণ্ড হইতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে,

"সৃষ্টিপালনসংহারশক্তয় স্ত্রিবিধাশ্চ যাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশানাং সা ত্বমেব নমোঽস্তুতে॥
যদাজ্ঞয়া বাতিবাতঃ সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি স্তাং দুর্গাং প্রণমাম্যহম্॥"

"হে দেবি! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনজন যে সৃষ্টিস্থিতি সংহার এই ত্রিবিধ শক্তি ধারণ করেন, তুমি সেই শক্তিস্বরূপা। অতএব হে দেবি! তোমাকে নমস্কার। যাঁহার আজ্ঞাক্রমে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহার ভয়ে সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ এবং অগ্নি দহন করিতেছে, আমি সেই দুর্গাকে প্রণাম করি।"

এখানে দুর্গা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। "যদাজ্ঞয়া বাতিবাতঃ সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ"—ইহা নিম্নোদ্ধৃত ব্রহ্মবিষয়ক শ্রুতির অবিকল অনুবাদ নহে কি?

"ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

কঠোপনিষৎ ৩।৩

এইরূপে আমরা দেখিলাম শাক্তশাস্ত্রসকলের মতে দুর্গা বা শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।



## গণপতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

যে স্থানে গণেশের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেখানে গণেশ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে গণেশস্তোত্র,—

"ঈশ ত্বাং স্তোতুমিচ্ছামি ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
নিরূপিতমশক্তোঽহং মনিরূপমনূহকম্।
অব্যক্তমক্ষরং নিত্যং সত্যমাত্মস্বরূপিণম্॥"

১৩ অধ্যায়।

হে গণপতে, তুমি ঈশ্বর, তুমি ব্রহ্মজ্যোতিঃ, তুমি সনাতন পুরুষ, তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করি। (কিন্তু তোমাকে কিরূপে স্তব করিব?) তোমাকে নিরূপণ করিতে আমি অশক্ত; তুমি তর্কের অগম্য; তুমি অব্যক্ত, অক্ষয়, নিত্য, সত্য, পরমাত্মরূপী।

গণেশ পুরাণে দেবগণকৃত গণেশাষ্টক স্তোত্র যথা,—

যতোঽনন্তশক্তে রনন্তাশ্চ জীবাঃ
যতো নির্গুণাদপ্রমেয়-গুণাস্তে।
যতো ভাতিসর্ব্বং ত্রিধাভেদভিন্নং
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ১
যতশ্চাবিরাসীৎ জগৎ সর্ব্বমেতৎ
তথাব্জাসনো বিশ্বগো বিশ্বগোপ্তা।
তথেন্দ্রাদয়ো দেবসংঘা মনুষ্যাঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ॥ ২
যতো বহ্নিভানু ভবো ভূর্জলং চ
যতঃ সাগরা-শ্চন্দ্রমা ব্যোমবায়ুঃ।

যতঃ স্থাবরজঙ্গমা বৃক্ষসঙ্ঘাঃ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৩
যতো দানবাঃ কিন্নরা যক্ষসঙ্ঘাঃ
যতশ্চারণা বারণাঃ শ্বাপদাশ্চ।
যতঃ পক্ষিকীটা যতো বিরুধশ্চ
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৪

*　　*　　*　　*　　*

যতো বেদবাচো হতিকুণ্ঠা মনোভিঃ
সদা নেতি নেতীতি যত্তা গৃণন্তি।
পরব্রহ্মরূপং চিদানন্দ-ভূতং
সদা তং গণেশং নমামো ভজামঃ ॥ ৮

যে অনন্ত শক্তি হইতে বিবিধ প্রকার জীবসকলের সৃষ্টি হইয়াছে, যে নির্গুণ পদার্থ হইতে অপরিমিত গুণরাশি বিকাশ হইয়াছে, যাঁহা হইতে সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণ এই ত্রিধা ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজমান আছে, আমরা সেই গণপতিকে সর্ব্বদা নমস্কার ও ভজনা করি। যাঁহা হইতে এই সমস্ত জগৎ আবির্ভূত হইয়াছে, যাঁহা হইতে এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বপাতা ব্রহ্মা প্রকাশিত হইয়াছেন, যাঁহা হইতে ইন্দ্রাদি দেবসমূহ এবং মনুষ্যসকল আবির্ভূত হইয়াছে সেই গণগতিকে নমস্কার ও ভজনা করি। যাঁহা হইতে অগ্নি, সূর্য্য শিব, পৃথিবী ও জল উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদ্র সকল চন্দ্রমা আকাশ এবং বায়ু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যাঁহা হইতে স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থ সকল এবং বৃক্ষসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই গণপতিকে নমস্কার ও ভজনা করি। যাঁহা হইতে দানব কিন্নর যক্ষ সমূহ আবির্ভূত হইয়াছে, যাঁহা হইতে চারণ (দেবযোনি বিশেষ) হস্তিসমূহ, শ্বাপদগণ, পক্ষী কীট লতা গুল্মাদি



উৎপন্ন হইয়াছে আমরা সেই গণপতিকে নমস্কার ও ভজনা করি। *　*　*　* বেদবাক্য সকল সর্ব্বদা “নেতি নেতি” (তিনি ইহা নহেন তিনি ইহা নহেন) এইপ্রকার নিষেধ বাক্যদ্বারা অতি কুণ্ঠিতচিত্তে যাঁহার (নির্গুণ স্বরূপের) স্তব করে, সেই চিদানন্দ মূর্ত্তি পরব্রহ্ম স্বরূপ গণপতিকে আমরা নমস্কার করি ও ভজনা করি।

আর কত শাস্ত্র উদ্ধার করিব? এইরূপ সহস্র সহস্র শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারা যায় যে, শৈব শাস্ত্রের মতে শিব এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, বৈষ্ণব শাস্ত্রের মতে বিষ্ণু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, শাক্ত শাস্ত্রের মতে শক্তি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, গাণপত শাস্ত্রের মতে গণপতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। শিব, বিষ্ণু, শক্তি, গণপতি প্রভৃতি হিন্দুর উপাস্য ইষ্টদেবতা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নাম ও রূপের ভেদমাত্র। এক অদ্বিতীয়, সাকার, সগুণ, মায়োপাধিক চৈতন্য পদার্থই হিন্দুর ইষ্টদেবতারূপে উপাস্য।

শিব = ব্রহ্ম
বিষ্ণু = ঐ
শক্তি = ঐ
গণপতি = ঐ
∴ শিব = বিষ্ণু = শক্তি
= গণপতি = ব্রহ্ম

ইহা যে কেবল আমার সিদ্ধান্ত তাহা নহে। পঞ্চদশীকার বলিতেছেন,

“অন্তর্যামিনমারভ্য স্থাবরান্তেশবাদিনঃ।
সন্ত্যশ্বথার্কবংশাদেঃ কুলদৈবত্ব দর্শনাৎ ॥
তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ন্যায়াগম বিচারিণাং।
একৈব প্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে ॥
মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
অস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥

ইতি শ্রুত্যনুসারেণ ন্যায়ো নির্ণয় ঈশ্বরে।
তথাসত্যবিরোধঃ স্যাৎ স্থাবরান্তেশ বাদিনাম্ ॥"

চিত্রদীপ ১২৩-১২৪

অর্থাৎ কেহ অন্তর্যামী ( কারণদেহী ব্রহ্ম ) কে ঈশ্বর বলে, কেহ হিরণ্যগর্ভকে ঈশ্বর বলে, কেহ বিরাট্‌কে ঈশ্বর বলে, কেহ ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলে, কেহ বিষ্ণুকে ঈশ্বর বলে, কেহ শিবকে ঈশ্বর বলে, কেহ গণপতিকে ঈশ্বর বলে, কেহ বা অশ্বত্থ, অর্ক, বংশ প্রভৃতি বৃক্ষকে কুলদেবতা জানিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বর বলে। এইরূপে অন্তর্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ঈশ্বর সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও প্রকৃত তত্ত্ব নিশ্চয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, ন্যায় ও আগম অনুসারে যাঁহারা বিচার করিবেন, তাঁহারা কেবল একটি মাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। তাহা এখানে স্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে। "মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে, ও সেই মায়ার অধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে; সেই মহেশ্বরের মায়ার অবয়ব দ্বারা এই চরাচর বিশ্বব্যাপ্ত রহিয়াছে।"—এই শ্রুতি অবলম্বন করিলে ন্যায়রূপে ঈশ্বর নির্ণয় হইবে। তাহা হইলে "অন্তর্য্যামী হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত" ঈশ্বরবাদিগণের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায় না।

নিরাকারবাদিগণও যদি প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া ন্যায় ও শাস্ত্র অনুসারে বিচার করেন, তবে স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন, শাস্ত্র সকলের মধ্যে আপাততঃ বিরোধ দেখা গেলেও প্রকৃত কোন বিরোধ নাই। এক অদ্বিতীয় মায়োপাধি সাকার ব্রহ্মই যে সকলের আদি কারণ ও সকল সম্প্রদায়ের উপাস্য, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।



## দেব দেবীগণও বিদ্যমান আছেন

এখন দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যা'ক। বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ভিন্ন ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র প্রভৃতি অসংখ্য দেবদেবীর উল্লেখ আছে সত্য। ইঁহারা সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী ও সূক্ষ্মদেহধারী। ইঁহাদিগকে দেবযোনি বা দেবতা বলে। ইঁহারা সৃষ্ট প্রাণী, সুতরাং জন্মমৃত্যুর অধীন। ইঁহাদিগকেই লক্ষ্য করিয়া শাস্ত্র বলেন,—

ব্রহ্মাবিষ্ণুরুদ্রাদি নাম ধারী দেবযোনি সৃষ্টপ্রাণী এবং জন্ম মৃত্যুর অধীন।

"ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥"

কুলার্ণব, ১ম উল্লাস।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ প্রভৃতি দেবগণ এবং সমস্ত জীব কেবল বিনাশের পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, অতএব সকলেই শ্রেয় আচরণ করিবে।

"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বা বা ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি সলিলানীব বাড়বম্ ॥"

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

সলিল যেমন বাড়বানলের পশ্চাৎ হয় সেইরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং অন্যান্য প্রাণিগণ বিনাশেরই অনুধাবন করিতেছে।

এই সকল দেবতা মনুষ্যের ন্যায় জন্মমৃত্যুর অধীন বটেন, কিন্তু ইঁহারা সূক্ষ্ম জগতের অধিবাসী বলিয়া এবং ঐশীশক্তি-

সম্পন্ন বলিয়া ভূলোকের প্রাণিবৃন্দের নিগ্রহানুগ্রহ করিতে সক্ষম। এই পৃথিবীর লোকেও যখন ক্ষমতা বলে অন্য প্রাণীর উপর নানাপ্রকার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে, তখন স্বর্গলোক-বাসী দেবযোনিরা যে তাহা পারিবেন, ইহার আশ্চর্য্য কি? এই পৃথিবীবাসী মানুষ যে যোগবলে অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়া অপরের ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতে পারে, ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা। পাতঞ্জল যোগসূত্রে আছে, মানুষ যোগসাধনদ্বারা অলৌকিক ঐশীশক্তি বা বিভূতি লাভ করিতে পারে। সেরূপ যোগসিদ্ধ লোক এখনকার দিনেও নিতান্ত দুর্লভ নহে। সুতরাং সূক্ষ্মদেহ-ধারী দেবযোনিগণের যে ঐশীশক্তি স্বভাবতঃ থাকিবে ইহা একে-বারেই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই কারণে সেই সকল দেবতা আমাদের পূজনীয় এবং আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক পূজা পার্ব্বণে তাঁহাদের পূজার বিধান রহিয়াছে।

ইঁহারা আমাদের ইষ্টদেবতা নহেন, কিন্তু অন্য কারণে উপাস্য

আবার এইসকল দেবতা ব্রহ্ম না হইলেও ব্রহ্মের অভিব্যক্ত-রূপ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যে হিসাবে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মের অভিব্যক্তি, সেই হিসাবে এই সকল দেবতাতেও তাঁহার প্রকাশ ধরিতে পারা যায়, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণাদি দেবতার মধ্যদিয়া সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রকাশ এরূপ বেদেও উক্ত হইয়াছে। "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—বিপ্রেরা এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সৎবস্তুকেই বিবিধ নামে অভিহিত করেন। মানুষ যেমন জন্মমৃত্যু জরা, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষের বশীভূত হইলেও



সেই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের অভিব্যক্তরূপ, এইসকল দেবতাও সেই প্রকার তাঁহার অভিব্যক্ত রূপ। সেই হিসাবেও এই সকল দেবতা মানুষের নিকট পূজনীয়।

সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কোন একটা অবলম্বনের সাহায্যে পূজা করা আবশ্যক একথা পূর্ব্বেই বুঝান হইয়াছে। অবলম্বনের মধ্যে আবার প্রকাশ হিসাবে তারতম্য আছে। যেমন জড় অবলম্বন অপেক্ষা মনুষ্য অবলম্বন শ্রেষ্ঠ (যথা কুমারী পূজা); সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা সাধু ভক্তের অবলম্বন শ্রেষ্ঠ (যেমন গুরুপূজা); সাধুভক্তের অবলম্বন অপেক্ষা দেবতার অবলম্বন শ্রেষ্ঠ; আবার সকল দেবতার মধ্যে যে সকল দেবতাতে ব্রহ্মের সৃষ্টি, পালন ও সংহার এই তিনটি সর্ব্ব-প্রধান ক্রিয়া প্রকাশিত হয়, সেই ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র কিংবা শক্তির অবলম্বন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইরূপে যখন কোন উপাসক, ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার রূপ অবলম্বনে উপাসনা করেন, তখন তিনি ব্রহ্মাকে পরমেশ্বরের বিশিষ্ট প্রকাশ ভাবিয়া তাঁহার সহিত অভেদ জ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করেন। বিষ্ণু, শিব, শক্তি প্রভৃতি অন্যান্য উপাস্য দেবতা সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। সেই সেই উপাস্য দেবতার সঙ্গে তখন ঈশ্বরের কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ দেবতার কথা দূরে থাকুক, এই সংসারের ক্ষুদ্র প্রাণীও যখন সাধনাবলে ব্রহ্মকে "সোঽহং" ভাবে দেখিতে পারে, তখন সেও বলিতে পারে, আমি

এই সকল দেবতা অবলম্বনে ও আবার সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে

সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি পালনকর্ত্তা, আমি সংহারকর্ত্তা, আমিই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। একদিন দৈত্যকুমার প্রহ্লাদের এই পরিণতি ঘটিয়াছিল, তাই তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সর্ব্বগত্বাদনন্তস্য স এবাহমবস্থিতঃ।
মত্তঃ সর্ব্বমহং সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে॥
অহমেবাক্ষয়ো নিত্যঃ পরমাত্মাত্মসংশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মসংজ্ঞোঽহমেবাগ্রে তথান্তে চ পরঃ পুমান্॥"

বিষ্ণুপুরাণ ১।১৯।৯৫-৬

"সেই অনন্তপুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমিই নিত্য ও অক্ষর। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয় অব্যর্থ ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম, এবং মহাপ্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। আমিই পরম পুরুষ।"

এইরূপ পরিণতি আর ঘটিয়াছিল ঋগ্‌বেদোক্ত অম্ভৃণ মহর্ষির বাক্ নাম্নী ব্রহ্ম-বিদুষী দুহিতার। তাই তিনি ব্রহ্ম ভাবে বিভোর হইয়া এইরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন,—

"অহং রুদ্রেভি র্বসুভিশ্চরামি
অহমাদিত্যৈ রুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্মি
অহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
* * * * * *
অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং
চিকীতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।



তাং মাং দেবা ব্যদধুঃ পুরত্রা
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীং॥ ঋগ্‌বেদীয় দেবীসূক্ত।

আমি সমস্ত রুদ্ররূপে, সমস্ত বসুরূপে বিচরণ করি, আমি আদিত্যগণ ও দেবতাগণরূপে বিচরণ করি। আমিই মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি, অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে ধারণ করিয়া আছি। আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরী, আমি উপাসকগণের ধনদা, ইষ্টফলদাত্রী, ব্রহ্মজ্ঞগণ আমাকেই ব্রহ্মরূপে সাক্ষাৎ করেন. উপাস্যদেব গণের মধ্যেই আমিই প্রধানা। আমিই বহু আকারে বহু স্থানে বিরাজ করিতেছি। আমিই সর্ব্বভূতের মধ্যে জীবাত্মারূপে প্রবেশ করিয়া আছি, এবং এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডবাসী দেবগণ যাহা কিছু করেন, তাহা আমারই কার্য্য।

এইরূপ পরিণতি-প্রাপ্ত প্রহ্লাদকে কিম্বা অম্ভৃণ ঋষির কন্যাকে ভক্ত মাত্রেই ব্রহ্মরূপে পূজা করিতে পারেন। উদ্ধৃত দেবীসূক্ত হইতে আমরা ইন্দ্র. রুদ্র, অগ্নি, বায়ু, মিত্র বরুণ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বেদোক্ত দেবতা যে এক ব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ তাহা বুঝিতে পারি।

কলুষিত চরিত্র দেবতাগণ ভক্তির পাত্র হইবেন কিরূপে?

যাহা হউক উপরে কথিত দেবতাসকল মনুষ্যাদি জীবগণের ন্যায় সৃষ্ট জীব হইলেও মনুষ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মনুষ্যের পূজনীয় ইহা বুঝিলাম। এখন কথা হইতেছে, পুরাণাদিতে ইঁহাদের যে সকল নীতি চরিত্রের বর্ণনা দেখা যায় তাহাতে ইঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা হওয়া দূরে থাকুক বরং আমাদের মনে ঘৃণারই উদয় হয়। সুতরাং ইঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া ভক্তি করিব কি প্রকারে?

## পুরাণশাস্ত্রের বিশেষরূপ আলোচনার প্রয়োজন

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পুরাণ শাস্ত্রের বিশেষরূপে আলোচনা করা আবশ্যক। পুরাণ সকল কোন সময়ে কাহাদের দ্বারা কি উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয় কি, এই সকল নির্ণয় করা আবশ্যক। এই গ্রন্থে সেরূপ বিস্তারিত আলোচনার অবসর নাই। ভাগবতাদি প্রধান প্রধান পুরাণ সম্বন্ধে অনেক পুস্তক বাহির হইয়াছে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক সেই সকল অধ্যয়ন করিবেন। তবে সংক্ষেপে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে। বেদের সত্য সকল আখ্যায়িকার আকারে সাধারণে প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে পুরাণ প্রণীত হইয়াছে, ইহা প্রায় সর্ব্ববাদি-সম্মত। "ইতিহাস পুরাণ" বেদের সময়েও প্রচলিত ছিল ইহার প্রমাণ উপনিষদের মধ্যেই আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ সনৎকুমারের নিকট উপদেশ লাভ করিবার জন্য গমন করিয়া নিজে কি কি বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার উল্লেখ করিতেছেন। তাহার মধ্যে "ইতিহাস পুরাণের" উল্লেখ আছে। তবে তখন কোন্ কোন্ পুরাণ প্রচলিত ছিল, আর সেই সকল পুরাণ আদি ও অকৃত্রিম অবস্থায় আমরা পাইয়াছি কিনা তাহা নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে পুরাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন, আমরা যে সকল পুরাণ দেখিতে পাইতেছি তাহাদের মধ্যে অনেক প্রক্ষিপ্ত বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা এখন যে



সকল পুরাণ বর্ত্তমান আকারে পাইয়াছি তাহাদের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেও সে সকল যে নানা প্রকার আজগুবি আখ্যায়িকায় পরিপূর্ণ সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার সম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ভাব কালক্রমে পুরাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে আরও বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। যেমন শৈবপুরাণে শিবের প্রাধান্য স্থাপন জন্য অন্য দেবতাকে হীন করিবার চেষ্টা হইয়াছে, বৈষ্ণব পুরাণে বিষ্ণুর প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য অন্যান্য দেবতার প্রতি নানা প্রকার রাগ দ্বেষ কাম মোহ প্রভৃতি ভাবের আরোপ করা হইয়াছে। অন্যান্য পুরাণ সম্বন্ধেও একথা খাটে। আবার কোন বৈদিক সত্য বা সার উপদেশ যদি পুরাণের আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়ে পুরাণ রচিত হইয়া থাকে, তবে সেই সকল আখ্যায়িকার চরিত্র চিত্রণে আলো ও ছায়ার সমাবেশ ত অবশ্যই করিতে হইবে। পুণ্যের আলোক উজ্জ্বলবর্ণে ফুটাইতে হইলে তাহাকে পাপ চিত্রের পাশাপাশি স্থাপন করা আবশ্যক। স্বর্গলোকবাসী দেবতা-গণ যখন সেই সকল আখ্যায়িকার পাত্রপাত্রী ( characters ) তখন তাঁহাদের সাহায্যেই সেই পাপচিত্র কল্পনা করিতে হইবে। এই জন্য দেবতাদিগের প্রতি রাগদ্বেষ কাম মোহাদি মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন পৌরাণিক ঘটনা রূপক ( allegory ) বলিয়াও ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এই সকল কারণে পুরাণ শাস্ত্র মথিত করিয়া তাহার সার সংগ্রহ পূর্ব্বক সাধারণে প্রকাশ করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু আমাদের

দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার উল্টা হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে কথকতা ও যাত্রাগানের দ্বারাই পুরাণশাস্ত্র আমাদের সমাজে প্রচারিত হইয়া থাকে। কিন্তু কথক ঠাকুরদের অনেকেরই সেরূপ শিক্ষা নাই, যদ্দ্বারা তাঁহারা পুরাণের প্রকৃত মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে পারেন। শ্রুতিদর্শনাদির জ্ঞান না থাকিলে পুরাণের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তাঁহারা পুরাণের কথিত বৃত্তান্তের উপর নিজেদের বিদ্যা-বুদ্ধি মত রং ফলাইয়া সাধারণের মনস্তুষ্ট করিতে চেষ্টা করেন। যাত্রার পালারচয়িতারাও আজকাল পুরাণের আখ্যায়িকা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত ঘটনা ও চরিত্র প্রবেশ করাইয়া পুরাণের অবমাননা করিতেছেন। এই সকল কারণে পুরাণ শাস্ত্র আরও কলুষিত হইতেছে। তবে যাঁহারা প্রকৃত ভক্ত তাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে ঐ সকল আজগুবি কথা আদৌ বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা ইষ্টদেবতাকে ব্রহ্মভাবেই উপাসনা করেন।

---

# অষ্টম অধ্যায়।

## নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা কাহাকে বলে ?

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলে, সেই সঙ্গে সাকার জগৎও চিন্তা করিতে হয়। জগৎ বাদ দিয়া আমরা কখনও ঈশ্বর চিন্তা করিতে পারিনা। আমাদের ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে জগতের সাকার ও সগুণ ভাব অবলম্বনে তাঁহাকে ধারণা করিতে হয়। আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নিরাকার, নির্গুণ ঈশ্বরকে জানিতে পারি। তাঁহার নিরাকার স্বরূপ মানুষের চিত্তবৃত্তির অগোচর বলিয়াই শ্রুতি ব্রহ্মকে "অবাঙ্মনস-গোচর" বলিয়াছেন। তবে কি মানুষ কখনও ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে পারেনা ? মানুষ কি কখনও নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেনা ? পারে বৈ কি। কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকেনা। তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। তখন মানুষের মানুষত্ব ব্রহ্মস্বরূপে পরিণত হয়। নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা যখন যোগিগণ নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তখন তাঁহার সহিত তাহাদের অতি অল্পই পার্থক্য থাকে। নিরাকারব্রহ্মজ্ঞানী দ্বৈতজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া, এই সংসারের সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, মান অপমান, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব

নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান কাহাকে বলে ?

( relative idea ) হইতে বিনিৰ্ম্মুক্ত হইয়া অমৃতত্ব লাভ করেন। এ বিষয়ে শ্রুতি বরংবার বলিতেছেন,—

"অশব্দ মস্পর্শমরূপ মব্যয়ং
তথাহ রসন্নিত্য মগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥" কঠোপনিষৎ।

ব্রহ্ম অতি সূক্ষ্ম। তিনি রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ গুণ-রহিত, সুতরাং ইন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত। তিনি ক্ষয়রহিত, অব্যয়, অতি সূক্ষ্মতম যে বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব, তিনি তাহার ও পরবর্ত্তী, সর্ব্বসাক্ষী। তাঁহাকে এই অবস্থাপন্ন জানিলে জীব মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

"তন্দুর্দ্দর্শঙ্গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতঙ্গহ্বরেষ্ঠং পুরাণং।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥"

ব্রহ্ম দুর্দ্দর্শ, কারণ তিনি অতি সূক্ষ্ম। তিনি প্রকৃতিজাত-বিষয় বিকারের জ্ঞান (দ্বৈতজ্ঞান) দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকেন। তিনি বুদ্ধিরূপ গুহাতে লুক্কায়িত। তাঁহাকে সেই গুহার মধ্যে দেখিতে হইলে অনেক অনর্থ ও সঙ্কট অতিক্রম করিতে হয়। তিনি পুরাতন। সেই দেবতাকে ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া হর্ষশোক হইতে মুক্ত হন, অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্ব মুত্তমং।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽ ব্যক্ত মুত্তমম্ ॥



অব্যক্তাৎপরঃ পুরুষো ব্যাপকোঽলিঙ্গ এব চ।
যজ্ জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তু রমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥" কঠ।

"আত্মার প্রকাশ সম্বন্ধে, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন উৎকৃষ্ট, মন অপেক্ষা অভিমান উৎকৃষ্ট, অভিমান অপেক্ষা বুদ্ধি উৎকৃষ্ট, বুদ্ধি অপেক্ষা প্রকৃতি উৎকৃষ্ট, প্রকৃতি অপেক্ষা স্বয়ং আত্মা উৎকৃষ্ট—যিনি ব্যাপক, অলিঙ্গ; তাঁহাকে জানিলে জীব বিমুক্ত হয়, অমৃত হয়।"

"ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপ মস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাঽভিকৢপ্তো
য এতদ্বিদু রমৃতাস্তে ভবন্তি ॥" কঠ।

ব্রহ্মের রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। চক্ষুদ্বারা কেহ তাঁহাকে দেখিতে পারে না। অন্তঃকরণস্থিত বুদ্ধি ও মননরূপ সম্যগ্দর্শন দ্বারা তিনি অভিপ্রকাশিত হন। যে তাঁহাকে জানিতে পারে, সে অমৃত হয়, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করে।

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ।
ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ ॥" শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।

সেই পরম দেবতাকে জানিলে সর্ব্বপাশ ছিন্ন হয়, ক্লেশ সকল বিদূরিত হয় ও জন্মমৃত্যু শেষ হয়, অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়।

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি! আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।" বৃহদারণ্যক উপনিষৎ।

হে মৈত্রেয়ি! সেই আত্মাকে দেখিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, ধ্যান করিতে হইবে; তাঁহাকে দেখিতে পারিলে, শ্রবণ করিতে পারিলে ও ধ্যান করিতে পারিলে এই বিশ্ব জগৎ সকলই জানা হয়, অর্থাৎ মোক্ষলাভ হয়।

"বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।
তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সৌম্য
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেবাবিবেশেতি॥" প্রশ্নোপনিষৎ।

"হে সৌম্য। যাহাতে সমস্ত দেবগণের সহিত বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, প্রাণ সমূহ এবং ভূতগণ সম্প্রতিষ্ঠিত আছেন, সেই অক্ষর ব্রহ্মকে যে ব্যক্তি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মক হয়েন"—অর্থাৎ তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

"পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতং।
এতদ্যো বেদ নিহিতং গুহায়াংসোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য॥"
মুণ্ডকোপনিষৎ।

"সেই পুরুষই বিশ্ব, কর্ম্ম, তপ, ব্রহ্ম এবং পরম অমৃত। যিনি এই ব্রহ্মকে জানেন, হে সৌম্য! তিনিই অবিদ্যাগ্রন্থি অর্থাৎ মায়াপাশ ছিন্ন করেন—মুক্ত হন।"

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
হস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥" মুণ্ডকোপনিষৎ



যেরূপ নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া স্ব স্ব নাম ও রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে লয় হইয়া যায়, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন, তিনি স্বীয় নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব-হীন হইয়া সেই পরাৎপর পরম পুরুষের স্বরূপে লীন হইয়া যান।

"স যো হ বৈ তৎপরং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।
নাস্যা ব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি।
তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি।"
মুণ্ডকোপনিষৎ।

"যিনি সেই পরব্রহ্মকে জ্ঞাত হয়েন, তিনি ব্রহ্মেই পরিণত হয়েন। শোক পাপ উত্তীর্ণ হইয়া এবং হৃদয়গুহাগ্রন্থি সকল হইতে বিমুক্ত হইয়া তিনি অমরত্ব লাভ করেন।"—অর্থাৎ তাঁহার মুক্তি হয়।

নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপে রাশি রাশি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। উক্ত শ্রুতি-বাক্য সকলের দ্বারা স্পষ্টই দেখা যায়, মানুষ যখন নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে পারে, তখন সে সর্ব্ব প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া ব্রহ্ম-স্বরূপে লীন হইয়া যায়। উল্লিখিত শ্রুতি সকলের মধ্যে যেখা-নেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে, আবার সেখানেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্ম হইয়া যায়। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানুষত্ব, "আমিত্ব" ( individuality ) ছাড়িতে

হয়। বাস্তবিক পক্ষে "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এরূপ কখনও কেহ বলিতে পারে না। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি "আমি" থাকিব, ততক্ষণ আমি ব্রহ্মকে জানিতে পারিব না।

নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান হইলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়

আমিত্ব বর্জ্জন না করিতে পারিলে, সেই অখণ্ড, অনন্ত পুরুষকে জানা যায় না। আবার যখন তাঁহাকে জানা যায়, তখন আর আমার "আমিত্ব" থাকিতে পারে না।* তখন "আমি" আর এক ব্রহ্ম হইয়া যায়। সুতরাং "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" এরূপ বলা অসম্ভব। আর যিনি মনে করেন, "আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি" প্রকৃত পক্ষে তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। এই জন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্॥"

"যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি† ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই, তাঁহারই ব্রহ্মকে জানা হইয়াছে। আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হয় যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি, তাঁহার ব্রহ্মকে জানা হয় নাই। উত্তম জ্ঞানবান ব্যক্তির বিশ্বাস এই যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানি নাই; যে ব্যক্তি তাদৃশ জ্ঞানবান্ নহে, তাহার এই বিশ্বাস যে, আমি ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়াছি।"

উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম, নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞানের অন্য নাম ব্রহ্মস্বরূপে লীন হওয়া বা মুক্তিলাভ করা।

* প্রকৃত পক্ষে এখানে "জানা" শব্দের অর্থ "হওয়া"—কারণ সে অবস্থায় জ্ঞানের ক্রিয়া থাকে না। "বিজ্ঞাতার মরে কেন বিজানীয়াৎ?"

† বলা বাহুল্য এস্থলে "আমি" শব্দ পারিভাষিক মাত্র। ইহা মূলে নাই।



মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে আমাদের ব্রহ্মসম্বন্ধে যে কিছু জ্ঞান, তাহা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম জগৎ সংশ্লিষ্ট, সুতরাং সাকার।

নিরাকারবাদী বলেন, তাঁহার প্রচারিত নিরাকার ব্রহ্মবাদ শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রুতি যে ব্রহ্মজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, তিনিও নাকি তাহাই প্রচার করেন। শ্রুতি যে ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছেন, তিনিও নাকি সেই নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া থাকেন।* কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান যে কি জিনিষ তাহা তিনি একবারও ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখেন না। শ্রৌত ব্রহ্মজ্ঞান ও নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। শ্রুতির নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়; কিন্তু নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মানুষ মানুষই থাকিয়া যায়। নিরাকারবাদীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অতি সোজা; এমন কি আবালবৃদ্ধবনিতা, সর্ব্ব "সাধা-

নিরাকার বাদীর ব্রহ্মজ্ঞান ও শ্রুতির ব্রহ্মজ্ঞান এক নহে

* নগেন্দ্র বাবু বলেন,—

"আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা সমর্থিত হইয়াছে কি না, যাঁহারা যথার্থই জানিতে চান, তাঁহাদিগকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি, উপনিষৎ পাঠ করুন। একাদশখানি উপনিষৎ অমূল্য সত্যরত্নের ভাণ্ডার। বেদের শিরোভূষণ উপনিষৎ পাঠ করুন। আমি যতদূর জানি তাহাতে আপনাদিগকে বলিতে পারি যে পরমাত্মার স্বরূপ ও সন্নিকর্ষ বিষয়ে উপনিষদে যেমন চমৎকার উপদেশ আছে, এমন আর কোথায়ও নাই।"

"যে বলে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা আধুনিক ব্যাপারে, সে কেবল আপনার মূর্খতার পরিচয় দেয় এমন নহে; অথবা সে কেবল অলীক কথা বলিয়া রসনাকে কলঙ্কিত করে এমন নহে; প্রাচীন ভারতের যাহা সর্ব্বপ্রধান গৌরব, তাহার প্রতি সে কুঠারঘাত করে।"—ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা ১ম খণ্ড ২য় সংস্করণ, ১৬৬—১৬৮ পৃষ্ঠা।

রণেই” ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই লাভ করিতে পারে। কিন্তু শ্রৌত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা বড় সোজা বলিয়া বোধ হয় না। শ্রৌত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে, শ্রৌত ব্রহ্মোপাসনা করিবার পক্ষে, অধিকারী অনধিকারী ভেদ আছে। শ্রুতিপ্রতিপাদিত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান যে অতি দুঃসাধ্য, দুর্লভ পদার্থ, সকলের জ্ঞানের আয়ত্ত নহে, তাহা শ্রুতি নিজেই বলিতেছেন,—

> “ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বাল
> প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।” কঠ।

ব্রহ্মবিদ্যা বালকের নিকট, বিষয় মদে মত্ত ব্যক্তির নিকট, কিংবা বিত্তমোহে মুগ্ধ ব্যক্তির নিকট প্রকাশিত হন না।

> “শ্রবণায়াপি বহুভি র্যো ন লভ্যঃ
> শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ
> আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা
> আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥” কঠ।

“যে পরমাত্মার কথা অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পায় না ; এবং যাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না, তাঁহার বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা বিরল ; এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারেন এরূপ লোকও বিরল।”

> “ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
> সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।



> অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
> অণীয়ান্ হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥”—কঠ।

“সামান্য নরের শিক্ষায় বহু চিন্তা দ্বারাও সে পরমাত্মাকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্য্যের শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই। কেন না সেই পরমাত্মা অণুপ্রমাণ হইতেও সূক্ষ্ম এবং তর্কের অতীত।”

> “নাবিরতো দুশ্চরিতা ন্নাশান্তো ন সমাহিতঃ।
> নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ ॥”—কঠ।

যে দুষ্কর্ম্মপরায়ণ সে আত্মাকে পাইতে পারে না। যে ইন্দ্রিয়লৌল্যসম্পন্ন সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত থাকে, সে তাঁহাকে লাভ করিতে পারে না। যাহার চিত্তের একাগ্রতা জন্মে নাই, সে তাঁহাকে পাইতে পারে না। তবে কে তাঁহাকে পাইতে পারে ? যে ব্যক্তি এই সকল দোষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন।

> “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
> ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
> যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ
> তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥”—কঠ।

“কেবল বেদাদি শাস্ত্রের পুনঃপুনঃ আলোচনা দ্বারা আত্মাকে জানিতে পারা যায় না। কেবল মেধা বা গ্রন্থার্থ-ধারণাশক্তি দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। নিয়ত বেদার্থ শ্রবণের দ্বারাও

আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু সেই আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। কেবল তাঁহারই নিকট আত্মা স্বরূপে প্রকাশিত হন।”

এই সকল শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা আমরা দেখিলাম, যাহা শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান তাহা লাভ করিবার অধিকারী সর্ব্ব-সাধারণে হইতে পারে না। ব্রাহ্মগণ সাধারণতঃ যে যে প্রণালীতে নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন, শ্রুতিপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞান কদাচ সে প্রণালীতে লাভ করা যাইতে পারে না। নিরা-কার ব্রহ্মজ্ঞান আবালবৃদ্ধবনিতা সর্ব্বসাধারণের নিকট বক্তৃতার বিষয় নহে। নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে পারেন, এরূপ লোকও অতি বিরল।

কঠোপনিষদে আছে, নচিকেতা যমের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভের প্রার্থী হইলে, যম তাঁহাকে প্রথমে বলিলেন,—

“দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুবিজ্ঞেয়মণুরেষ ধর্ম্মঃ।
অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ
মা মোপরোৎসীরতি মা সৃজৈনম্॥”

দেবতারাও এবিষয়ে সংশয় যুক্ত ছিলেন, কারণ এই ধর্ম্ম সুবিজ্ঞেয় নহে, ইহা অতীব সূক্ষ্ম। হে নচিকেতা তুমি আমাকে এই বিদ্যালাভের জন্য উপরোধ করিও না, তুমি অন্যবর প্রার্থনা কর। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের অভিলাষ ত্যাগ কর।

নচিকেতা বলিলেন, “এই বিদ্যা যখন সুবিজ্ঞেয় নহে, তখন



কে আর আমাকে এবিষয়ে উপদেশ দিবে? তোমার ন্যায় উপদেষ্টা আর আমি কোথায় পাইব। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক তুমিই আমাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দান কর।”

যম তখন নচিকেতা ব্রহ্মবিদ্যালাভের অধিকারী কিনা তাহা পরীক্ষা করিলেন। নচিকেতাকে পৃথিবীর রাজ্য, বহু পশু, হস্তী, অশ্ব, ধনরত্ন, প্রভৃতি কাম্য বস্তু দানের অঙ্গীকার দ্বারা প্রলুব্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নচিকেতা সে সমস্ত অনিত্য ক্ষণস্থায়ী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। এইরূপ পরীক্ষা দ্বারা যম যখন বুঝিলেন নচিকেতার নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক হইয়াছে, তিনি প্রেয় অপেক্ষা শ্রেয়কেই লাভ করিতে অভিলাষী, তিনি অবিদ্যার প্রার্থী না হইয়া বিদ্যাকেই প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিলেন।

এইরূপে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ীকে বিত্ত দানের লোভ দেখাইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন। মৈত্রেয়ী বলিলেন,—

“যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণাস্যাৎ কথং তেনামৃতা স্যামিতি।”—ভগবন্ ধনসম্পৎপূর্ণ এই সমস্ত পৃথিবী যদি আমার হস্তগত হয়, তবে তাহা দ্বারা কি আমি অমৃতত্ব লাভ করিব?

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—“যথৈবোপকরণবতং জীবিতং তথৈব তে জীবিতং স্যাদমৃতত্বস্য তু নাশোস্তি বিত্তেনেতি।”—না, অমৃতত্ব লাভ করিবে না। তবে জগতে বিত্তোপভোগকরণসম্পন্ন ধনীদিগের জীবন যেরূপ হইয়া থাকে, তোমার জীবনও সেইরূপ সুখসম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু বিত্ত অথবা বিত্তসাধ্য কর্ম্মদ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।”

ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী হইতে হইলে কি প্রকার সাধনার প্রয়োজন, শ্রুতি তাহা বলিতেছেন,—

"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভি গচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ –মুণ্ডক

কর্ম্মলব্ধ লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেন; কর্ম্মদ্বারা নিত্যবস্তু লাভ করা যায় না। সেই নিত্যবস্তু জানিবার জন্য হোমকাষ্ঠ হস্তে বেদজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট যাইবেন।

"তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদং সত্যং
প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাং॥"—ঐ

সেই বিদ্বান (গুরু) সম্যকরূপে প্রশান্ত চিত্ত, শমগুণান্বিত শিষ্যকে সমাগত দেখিয়া যদ্দারা সেই অক্ষয়, সত্য পুরুষকে জানা যায় সেই ব্রহ্মবিদ্যা যথাবৎ বলিলেন।

এই শ্রুতিবাক্যের অনুবাদ করিয়া বেদান্ত বলিতেছেন,—

"অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলস্বান্তঃ-সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা।"—বেদান্তসার।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী কে? না, যিনি বিধিপূর্ব্বক (১) বেদ-

(১) অর্থাৎ অধ্যাপক মোক্ষমুলর, কিংবা তাঁহার শিষ্য বা অনুশিষ্যগণ আমরা যেরূপ বেদপাঠ করি, সেরূপ নহে।



বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিয়া, আপাততঃ অখিল বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, যিনি ইহজন্মে কিংবা পূর্ব্বজন্মে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন পূর্ব্বক, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম, যাগযজ্ঞাদি নৈমিত্তিক কর্ম্ম, পাপক্ষালন নিমিত্ত চান্দ্রায়নাদি প্রায়শ্চিত্ত, চিত্তের একাগ্রতালাভের জন্য সগুণ ব্রহ্ম-উপাসনাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত ও নিতান্ত নির্ম্মলচিত্ত হইয়াছেন, যিনি একমাত্র ব্রহ্মই নিত্যবস্তু, ও অন্যসকল অনিত্য পদার্থ বলিয়া দৃঢ়রূপে বুঝিয়াছেন, যিনি ইহ-কালে কিংবা পরকালে বিষয় ভোগ হইতে সম্পূর্ণরূপে নিস্পৃহ হইয়াছেন, যিনি শম (২), দম (৩), উপরতি ৪), তিতিক্ষা (৫), সমাধান (৬), শ্রদ্ধা (৭), এই সকল গুণ-সম্পন্ন হইয়াছেন, যাঁহার মোক্ষলাভের ইচ্ছা জন্মিয়াছে (৮), এই সকল লক্ষণ বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী।

(২) যেমন তীব্র ক্ষুধা হইলে একমাত্র খাদ্যবস্তুর প্রতি ইচ্ছা জন্মে, অন্য কারণ বশতঃ কোন একটু বিলম্ব সহ্য হয়না, সেইরূপ যেগুণ অন্য বিষয় হইতে মনকে রুদ্ধ করিয়া একমাত্র ব্রহ্মসাধনের (শ্রবণ, মননাদির) দিকে পরিচালিত করে, তাহার নাম শম।

(৩) যে গুণের দ্বারা চক্ষুকর্ণাদি বাহ্য ইন্দ্রিয় সকল অন্য বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হইয়া একমাত্রব্রহ্মসাধনে নিযুক্ত থাকে।

(৪) যে বৃত্তি দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে একমাত্র ব্রহ্মসাধনে নিরোধ করিয়া রাখা যায়। অথবা নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের সন্ন্যাসধর্ম্ম স্বীকার পূর্ব্বক পরিত্যাগ।

(৫) শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান অপমান, স্তুতি নিন্দা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা।

(৬) বিষয় হইতে নিগৃহীত মনের ব্রহ্মে সমাধি।

(৭) গুরু ও বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস।

(৮) আপত্তি হইতে পারে, মোক্ষলাভের ইচ্ছা ত সকলেরই আছে, তাহা আবার জন্মিবে কি? আর মোক্ষেচ্ছা একটা উপার্জ্জিত গুণের মধ্যেই বা কেন গণ্য হইবে? বলা বাহুল্য মোক্ষলাভ কি, তাহা যিনি জানেন না, তাঁহার এইরূপ প্রশ্ন সম্ভব। বিষয়ানুরাগ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত না হইলে কখনও মোক্ষেচ্ছা জন্মিতে পারে না।

যে মহাত্মা এই সকল গুণগ্রামসম্পন্ন হইবেন, তিনি কি কখনও তোমার আমার ন্যায় সংসারে স্থির হইয়া থাকিতে পারেন ? কখনই না। তাই বেদান্ত বলিতেছেন,—

“অয়মধিকারী জনমমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো দীপ্তশিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি।”

যিনি এইরূপ অধিকারীর লক্ষণ বিশিষ্ট হইবেন, তিনি, যেরূপ কাহারও মস্তকে আগুন জ্বালিয়া দিলে, সে এক মুহূর্ত্তও স্থির থাকিতে না পারিয়া প্রবলবেগে জলরাশির মধ্যে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ এই সংসার-অনল-সন্তপ্ত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর চরণতল আশ্রয় করিবেন।

ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারীর পক্ষে যে সকল সাধনের আবশ্যকতা বলা হইল, তাহা যে নিতান্ত অসাধ্য সাধন, অথবা লোকদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ হইতে ভয় দেখাইয়া তাড়াইয়া দেওয়ার কৌশল বিশেষ, তাহা বলা যায় না। পুরাণ-ইতিহাসে পূর্ব্বতন মুনিঋষিগণের সাধনপ্রণালী ও জীবনবৃত্তান্ত পাঠ করিলে এইরূপ ব্রহ্ম-সাধনার ভূয়োভূয়ঃ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, শুকদেব, ব্যাস, সনৎকুমার প্রভৃতি মহাত্মগণের জীবনী পাঠ করিলে আমরা কি দেখিতে পাই ?* আমরা দেখি, এই সকল মনীষিগণ বিষয়-কামনা সকল হৃদয় হইতে সমূলে উৎপাটিত

* বালক নচিকেতা ও যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ী পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সাধনার ফলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছিলেন।



করিয়া কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক বনবাসী হইয়াছিলেন। দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে দমন করিবার জন্য আজীবন যম, নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি ধর্ম্মানুশীলন পূর্ব্বক কামনা-পরিশূন্য হইয়া কেবল সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক মন, বুদ্ধি, অভিমান প্রভৃতি বৃত্তিকে বিনাশ করিয়া অবশেষে সেই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত-স্বভাব-সম্পন্ন পরমাত্মাতে লীন হইয়াছিলেন। যদি পুরাণ ইতিহাসকে আজগুবি কথা (myth) বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও, তাহাতে আপত্তি নাই। এই সকল তপস্তেজঃসম্পন্ন মনীষিগণের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিলেও, শ্রুতি-প্রতিপাদিত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইলে, যেরূপ অশেষ ত্যাগ-স্বীকার, কঠোর ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ও অসীম কৃচ্ছ্রসাধন আবশ্যক, এই সকল জীবন বৃত্তান্ত যে তাহার উদাহরণ (concrete example) সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই।

“আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!” এই শ্রুতির অর্দ্ধাংশ উদ্ধৃত করিয়া কেহ কেহ বলেন, শ্রুতিই উপদেশ দিয়াছেন নিরাকার ব্রহ্মকে দেখিবে, শুনিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে ; তবে সাকার উপাসনার প্রয়োজন কি ? যাহারা মূর্খ, তাহাদের জন্যই শাস্ত্র সাকার উপাসনা বিধান করিয়াছেন। এস্থলে দুঃখের বিষয় এই যে, “কাণ টানিলে মাথা আসে” তাহা তাঁহারা দেখিতেছেন না। আত্মাকে দেখিবে, শুনিবে, মনন করিবে, ধ্যান করিবে, এ উপদেশ কাহাকে দেওয়া

হইয়াছে ? যাঁহার সাকার, সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতে করিতে চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছে, যিনি অধিকারী, তাঁহাকে। প্রথমতঃ সাকার উপাসনা করা ভিন্ন আত্মজ্ঞানের অধিকার জন্মিতে পারে না। এই জন্য আত্মজ্ঞানলাভের পূর্ব্বে সাকার উপাসনার একান্ত আবশ্যকতা। সাকার উপাসনা দ্বারা নির্ম্মলচিত্ত অধিকারী ব্যক্তি আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন করিতে করিতে অবশেষে আত্ম-স্বরূপে লীন হইয়া যান। তাই সেই শ্রুতিই বলিতেছেন,—

"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে, শ্রুতে, মতে, বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"

"ব্রহ্মকে দেখিলে, শুনিলে, বুঝিলে, জানিলে, সকলই জানা হয়"—অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যান।

শ্রুতির শাসন না মানিয়া যদি কেহ নিজেকে নিরাকার উপাসনার অধিকারী মনে করেন, তবে তাহাতে অন্যের ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

শ্রুতির উপদেশসত্ত্বেও যদি কেহ মনে করেন তিনি শ্রবণ মননাদি দ্বারা ব্রহ্মোপাসনার অধিকারী, তবে তিনি সেইরূপ উপাসনা করুন, তাহাতে অন্য কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, যে অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিলে মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়, তাহা হইতেছে সিদ্ধাবস্থা। এতদ্ভিন্ন একটি সাধনাবস্থা আছে; তাহাতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা উপযোগী নিরাকার ব্রহ্ম জ্ঞান হয়; কিন্তু তখন মানুষ ব্রহ্ম হইতে অনেক তফাৎ থাকে। যে সকল শ্রুতিতে মানুষ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞতালাভ কিংবা অমৃতত্বলাভ করে, এরূপ বলা



হইয়াছে, তাহা সিদ্ধাবস্থা লক্ষ্য করিয়া। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ ইত্যাদি" ও "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" প্রভৃতি শ্রুতিতে সাধনাবস্থার কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মের সাধন ও নিরাকার উপাসনা শ্রুতিবিরুদ্ধ না হইয়া বরং শ্রুতিপ্রতিপাদিত হইল।

সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থা।

ইহার উত্তর কঠিন নহে। শ্রুতি সাধনের যে অবস্থাতে কিংবা যেরূপ অধিকারে নির্গুণোপাসনার উপদেশ দিয়াছেন, তাহা সিদ্ধাবস্থা হইতে বড় তফাৎ নহে। পঞ্চদশীকার বলেন,—

"ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ।"
"নির্গুণোপাসনং পক্কং সমাধিঃ স্যাৎ শনৈস্ততঃ।
যঃ সমাধি নিরোধাখ্যঃ সোঽনায়াসেন লভ্যতে॥"

ধ্যানদীপ—১২২, ১২৬।

অর্থাৎ নির্গুণোপাসনা অতি উচ্চ অধিকারের কথা, তাহা অভ্যাস করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। নির্গুণোপাসনা পরিপক্ক হইলে "সবিকল্প সমাধি" লাভ হয় ও তৎপরে ক্রমশঃ অনায়াসে "নির্বিকল্প সমাধি" লাভ করা যায়।

অতএব আমরা দেখিলাম, শ্রুতি যে সাধনাবস্থায় আত্মাকে দর্শন, শ্রবণ ও ধ্যান করিবার কথা বলেন, তাহা বহুজন্মব্যাপী ধর্ম্মানুশীলনের ফল, এবং তাহা সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারাই লাভ হইতে পারে, তাহা অনুষ্ঠানকালে সাধক সিদ্ধাবস্থা হইতে অতি

অল্পদূরে থাকেন। প্রচলিত "নিরাকার উপাসনা" কদাচ এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত নির্গুণোপাসনা নহে।

আর একটি কথা এখানে বলিয়া রাখি। আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক এই সকল শ্রুতির সহিত "নেদং যদিদমুপাসতে" এই শ্রুতির কোন বিরোধ নাই। ইহা অধ্যাত্মযোগের বিবৃতিতে স্পষ্ট করিয়া বুঝান যাইবে।

## নিরাকার উপাসনা।

এই পুস্তকের প্রথমে বলা হইয়াছে, নিরাকারব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না—ইহা শ্রুতির মত। কিন্তু এখন শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নির্গুণ উপাসনার প্রণালীর কথা বলা হইল। কোন কোন শাস্ত্র-গ্রন্থে, এমন কি কোন কোন শ্রুতি দ্বারাও নির্গুণ উপাসনার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে এখন কথা হইতেছে, শাস্ত্রোক্ত নির্গুণ উপাসনা কি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা নহে? নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা না হইতে পারিলে, শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ থাকিবে কেন?

শ্রুতি প্রতিপাদিক নির্গুণ উপাসনার অপর নাম অধ্যাত্ম-যোগ।

"অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি।"

ধীর ব্যক্তি অধ্যাত্ম যোগের দ্বারা দেবতাকে জানিয়া হর্ষশোক হইতে বিমুক্ত হন। সেই অধ্যাত্ম যোগ কাহাকে বলে?

## অধ্যাত্ম যোগ কি?

উল্লিখিত কঠোপনিষদ্‌বাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য



বলেন, "বিষয়েভ্যঃ প্রতিসংহৃত্য চেতসঃ আত্মনি সমাধানম্।" অর্থাৎ রূপরসাদি বিষয় হইতে চিত্তের সংযত করিয়া আত্মায় সমাধি করা। শঙ্করাচার্য্য এই অর্থ কোথায় পাইলেন? ইহা কি তাঁহার স্বকপোলকল্পিত? না তাহা নহে। সেই কঠোপনিষদেই অন্যত্র আছে,—

নিরাকার উপাসনার অপর নাম অধ্যাত্মযোগ।

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাঙ্গগতিম্॥
তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্॥"

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়, ও যখন বুদ্ধি ও বাহ্যবিষয়ে ব্যাপারশূন্য হয়, সেই অবস্থাকে পণ্ডিতগণ পরমাগতি বলিয়া থাকেন। এইরূপ স্থির অচল ইন্দ্রিয় ধারণাকেই যোগ বলা হয়। অর্থাৎ আধ্যাত্মযোগে ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি বহির্জ্জগৎ হইতে সঙ্কুচিত ও প্রতিনিবৃত্ত হইয়া কেবল এক পরমাত্মায় লীন হইয়া থাকে। এই কথা সেই শ্রুতি অন্যত্র আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন,—

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসশ্চ পরা বুদ্ধি বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥
মহতঃ পরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥
এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেত্তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥"

ইন্দ্রিয় হইতে রূপরসাদি সূক্ষ্ম, রূপরসাদি হইতে মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম, বুদ্ধি অপেক্ষা মহত্তত্ত্ব সূক্ষ্ম, মহত্তত্ত্ব অপেক্ষা প্রকৃতি সূক্ষ্ম, প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষ সূক্ষ্ম, পুরুষ অপেক্ষা সূক্ষ্ম আর কিছুই নাই, তিনিই সকলের চরম অবস্থা, তিনিই সকলের চরম গতি। তিনি সর্ব্বভূতে প্রচ্ছন্নভাবে রহিয়াছেন, তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশ্য নহেন। কেবল সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্বনিরূপণক্ষম বুদ্ধি দ্বারা তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন। কি প্রণালীতে তাঁহাকে দর্শন করা যায়? তাঁহাকে দর্শন করিতে হইলে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট ব্যক্তি ইন্দ্রিয়শক্তিকে মনে সংযত করিবে, মনকে বুদ্ধিতে সংযত করিবে, বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে সংযত করিবে, মহত্তত্ত্বকে পরমাত্মায় সংযত করিবে। বলাবাহুল্য এই ইন্দ্রিয়াদি সংযমনই অধ্যাত্মযোগ বা নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা। এই সকল শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য কি একবার দেখা যাউক।

আমি চাই সর্ব্বোপাধিশূন্য, নামরূপবিহীন, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন, নির্গুণব্রহ্মস্বরূপে মিলিত হইতে। আমি জড় জগতে তাঁহাকে দেখিতে পারি না, কারণ জড় জগৎ তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে—তিনি জড়জগতে "গূঢ়"—অপ্রকাশিত আছেন। আমি মানসিক জগতে তাঁহাকে দেখিতে পারি না, কারণ আমার

অধ্যাত্ম যোগের বিশেষ বিবরণ



মন তাঁহাকে ভাবিতে গিয়া জড়জগতের চিত্র দ্বারা তাঁহাকে ঢাকিয়া ফেলে। মোট কথা, আমার চিত্তবৃত্তির সাহায্যে আমি যেখানেই তাঁহাকে দেখিতে যাইব, সেখানেই তাঁহার সাকার ভিন্ন নিরাকার রূপ দেখিতে পারিব না। এমন কি যদিও তিনি আমার হৃদয়-কন্দরে বিরাজমান রহিয়াছেন, তথাচ আমি তাঁহাকে দেখিতে পারিতেছি না,—কেবল আমার এই চিত্তের জন্য। তাঁহার স্বরূপদর্শনে আমার চিত্ত এক প্রধান অন্তরায়। আমার মন কেবলই বাহিরের দিকে ছুটিয়া যাইতে চাহে—আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল সর্ব্বদাই রূপ রসাদির সহিত গাঁথা রহিয়াছে,—আমি কিছুতেই তাহাদিগকে অন্যদিকে ফিরাইতে পারি না। এক রকম ধরিতে গেলে, সেই রূপরসাদি লইয়াই, আমার চক্ষু কর্ণের অস্তিত্ব। রূপরসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ ছিন্ন হইলে, তাহাদের মন হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। আবার যতক্ষণ রূপরসাদির সহিত তাহাদের সম্বন্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমার নিরাকার ব্রহ্মদর্শনও হইবে না। সুতরাং নিরাকার ব্রহ্মকে জানিতে হইলে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকলকে স্বস্ব বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হইবে। তাই শ্রুতি বলিতেছেন,—

'ইন্দ্রিয় সকলকে মনে লয় কর।'

করিলাম। কিন্তু নিরাকার ব্রহ্মকে জানিবার জন্য আমার ইন্দ্রিয়সংযমই যথেষ্ট হইল না। আমার গন্তব্য পথের এখনও অনেক বাকী। যাহাতে রূপ রসের একটু নাম গন্ধও নাই,

আমি চাই সেই ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে। আমার ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল এখন আর বাহিরের দিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ধাবমান হয় না বটে, ইন্দ্রিয়শক্তি সংযত হওয়াতে বহির্জ্জগতের নব নব ভাব সকল আমার চিত্তপটে এখন আর অঙ্কিত হয় না বটে, কিন্তু এখনও পূর্ব্বসঞ্চিত ভাব সকল আমার স্মৃতিতে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে, এখনও আমি কোন কিছু চিন্তা করিতে বসিলে সেই সকল ভাবের আলোড়ন বিলোড়ন হইতে থাকে। এই সকল ভাব রূপরসাদির প্রতিকৃতি, ইহারা থাকিতে কখনও আমি নিরাকার ব্রহ্মের উপলব্ধি করিতে পারিব না। ইহারা তাঁহার স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব আমাকে সেই সকল চিত্র পুছিয়া ফেলিতে হইবে। তাই শ্রুতি আদেশ করিতেছেন,

'মনকেও লয় কর।'

মনকে লয় করিলাম। আমি এখন ইন্দ্রিয় শক্তিকে সংযত করিলাম, মনকে সংযত করিলাম, কিন্তু তবুও আমার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইল না। আমার অহংভাব, আমিত্ব, আমি বলিয়া পৃথক্ অস্তিত্ব * এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। এই আমিত্ব বজায় থাকিতে, আমি সেই পরব্রহ্মে বিলীন হইতে পারিব না। অনন্ত পরমাত্মসাগরে আমি একটি ক্ষুদ্রতরঙ্গ ; তরঙ্গের এই তরঙ্গত্ব থাকিতে সে সমুদ্রের অনন্তত্বে ডুবিতে পারিবে না। তরঙ্গকে সাগর হইতে হইলে, তাহার সেই তরঙ্গ নাম ছাড়িতে হইবে,

* শ্রুতিতে মনের পরই বুদ্ধি। সংখ্যাদি দর্শন শাস্ত্রে এই দুইটির মধ্যে 'অভিমান' বা 'অহঙ্কার' একটি স্তর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।



বায়ু-বিক্ষোভ হইতে মুক্ত হইতে হইবে। সেই জন্য আমার আমিত্ব বিসর্জ্জন করা আবশ্যক, অভিমান-সংযম করা আবশ্যক। আমিত্ব বিনষ্ট হইলে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য যে সাম্যের ধ্বজা উড়াইয়া একদিন ফরাসী জাতি নর-রক্তে পৃথিবী প্লাবিত করিয়াছিল, আমি সে সাম্যের কথা বলিতেছি না। যে সাম্যের ফলে,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"—গীতা।

পণ্ডিতগণ বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুরও চণ্ডালে সমদর্শী হন,—ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মনুষ্য, পশু, পাপ পুণ্য সমস্তই এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দময় দর্শন করিতে সমর্থ হন— তাহাই প্রকৃত সাম্য। প্রথমোক্ত সাম্য অহঙ্কার-মূলক ; "তুমি যে মানুষ, আমিও সেই মানুষ—তোমার যে অধিকার, আমারও সেই অধিকার হওয়া উচিত," ইহাই সেই সাম্যের মূলমন্ত্র। শেষোক্ত সাম্য অহঙ্কার-বিনাশের ফল ; "তুমি আমি সকলেই সচ্চিদানন্দময়—আমার কোন পৃথক্ অস্তিত্ব নাই" এইরূপ জ্ঞানমূলক। ইহা "অভিমান" সংযমের দ্বারা হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মলাভের জন্য অভিমানকে লয় করিতে হইবে।

কিন্তু জীবের আমিত্ব দূর হইলেই সে ব্রহ্মে সমাধি করিতে পারে না, সে ব্রহ্ম হইতে পারে না। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একত্ব, সাম্য সম্পাদিত হইলেও, সৃষ্ট ও স্রষ্টার প্রভেদ থাকিয়া যায়। এইজন্য যে শক্তি দ্বারা কর্ত্তা আর কার্য্যের

পৃথক্ অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে, যে জ্ঞান থাকিলে জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, সেই "বুদ্ধি" বা "মহত্তত্ব" কে ও * সংযত করা আবশ্যক। এই বুদ্ধি বৃত্তিই (Finite consciousness) অভিমান (Self consciousness or ego) কে ব্রহ্মের (Divine Consciousness) সহিত সংযোগ করিয়া রাখিয়াছে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"বুদ্ধিকেও সংযত কর।"

এই বুদ্ধির পর আর একটি স্তর "অব্যক্ত" বা "প্রকৃতি"। প্রকৃতি সংসার বীজ-স্বরূপ—যেমন বটকণিকাস্থিত বটবৃক্ষশক্তি। ইহা সর্ব্বপ্রকার কার্য্যকারণের আধারভূত। যখন জীব এই প্রকৃতিতে অবস্থান করে, তখন সে নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, শিব, অদ্বৈত ব্রহ্মের সমীপবর্ত্তী হয়। কিন্তু যদিও সে সৃষ্ট পদার্থের রাজ্য অতিক্রম করিয়া স্রষ্টার সমীপে অগ্রসর হইয়াছে, তথাচ এখনও সে সম্পূর্ণরূপে স্রষ্টা হইতে পারে নাই। প্রকৃতিস্তরে থাকিতে তাহার পুনর্ব্বার সংসারাভিমুখে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। বটবৃক্ষশক্তি হইতে বটবৃক্ষ জন্মিবার আশ্চর্য্য কি? এইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন;—

"প্রকৃতিকেও লয় কর।"

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ইন্দ্রিয়ের লয়, মনের লয়, অভিমানের লয়, বুদ্ধির লয়, মহত্তত্ত্বের লয়, প্রকৃতির লয়—এই লয়ের পর লয়, এই জীবজগতের মহাপ্রলয় সংসাধন করিলে

* জীব বিশেষে বা ব্যষ্টিভাবে যাহা "বুদ্ধি", জগতে বা সমষ্টিভাবে তাহা "মহত্তত্ব।"



তবে মানুষ নিরাকার ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে—ব্রহ্মে সমাধি করিতে পারে। অতএব যখন ব্রহ্মে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা সমাধি করিতে পারে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। তখন মায়ামোহাচ্ছন্ন জীব মায়ামোহ কাটাইয়া সচ্চিদানন্দময় হইয়া যায়। তণ্ডুল ও জলপূর্ণ ঘট হইতে তণ্ডুল উঠাইয়া লইলে জল থাকে; জল নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলে ঘট একমাত্র আকাশ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে—সেই ঘটাকাশ মহাকাশ হইতে কেবল এক উপাধি ভেদে পৃথক্; বস্তুতঃ পৃথক্ নহে। ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলিলে—জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের দেহত্যাগ হইলে,—সেই সান্ত আকাশ অনন্ত আকাশে, ঘটাকাশ মহাকাশে মিশিয়া যায়, জীব শিব হইয়া যায়। যে সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিলে, ইন্দ্রিয়াদি বৃত্তি সংযমন দ্বারা জীব এইরূপে জীবত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সমাধি করিতে পারে, তাহাকেই অধ্যাত্মযোগ বলে। ইহা স্থান বিশেষে জ্ঞানমার্গ, জ্ঞানযোগ, বুদ্ধিযোগ, আত্মসমাধি ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাতঞ্জল দর্শনের প্রথমপাদ, সাংখ্যদর্শন, ন্যায়দর্শন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়েও ইহার বিশেষ বিবরণ আছে।

এখন একবার পূর্ব্বকথিত জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির কথা স্মরণ করা যাউক। এই অধ্যাত্মযোগ কোন অবস্থার সাধনা? পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে আমাদের জাগ্রদবস্থায় আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়গ্রহণ করি। স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয় সকল বিষয়ব্যাপার হইতে প্রতি-

সংহৃত হইয়া মনে লীন হয়; মন ও বুদ্ধি সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত লইয়া ক্রিয়া করে। আমাদের সুষুপ্তি অবস্থায় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি সকলই এক প্রকৃতিতত্ত্বে লীন হইয়া যায়; তখন থাকেন কেবল প্রকৃতি ও পুরুষ বা আত্মা। অতএব উল্লিখিত অধ্যাত্ম-যোগে, ইন্দ্রিয়লয় স্বপ্নাবস্থার সাধন; মন ও বুদ্ধির লয় সুষুপ্তি-অবস্থার সাধন। মন ও বুদ্ধি লয়ের পর যে সমাধি তাহাও সুষুপ্তি অবস্থার সাধন, কারণ সুষুপ্তির পর আর জ্ঞানের অবস্থা নাই। সেই সমাধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া জীব ব্রহ্মের চতুর্থাবস্থা বা তুরীয় ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া যায়। শ্রুতি এই অধ্যাত্মযোগের উপদেশ দিয়া বলিতেছেন,—

> "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
> ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
> দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি॥"

"হে জীবগণ! তোমরা উঠ, জাগ্রত হও, বর সকল প্রাপ্ত হইয়া তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি কর। যেমন ক্ষুরের নিশিত ধার দিয়া গমন করা দুঃসাধ্য, সুধীগণ বলেন, এই ব্রহ্মজ্ঞানের পথ সেইরূপ দুর্গম।"

শ্রুতি এইরূপে অধ্যাত্মযোগের মতবাদ ( theory ) প্রকটিত করিলেন। তাহার অনুষ্ঠান প্রণালী (practice) বিধিবদ্ধ করিবার ভার পড়িল দার্শনিকদিগের উপর। তত্ত্বদর্শিঋষিগণ শ্রুতির আদেশ অনুসারে অধিকারি-ভেদে মানবচরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া এই যোগমার্গের সাধন প্রণালী বিধিবদ্ধ করিলেন। এইরূপে ষড়দর্শনের উৎপত্তি হইল।



## নির্গুণোপাসনার প্রণালী।

পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট "অধিকারী" ভিন্ন এই সাধন মার্গে কাহার ও অধিকার নাই, ইহা সকল দর্শনশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া অনুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহার চিত্তশুদ্ধি না হইয়াছে, সাকার উপাসনা দ্বারা যাঁহার চিত্তের একাগ্রতালাভ না হইয়াছে, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, তদ্ভিন্ন সকলই মিথ্যা,—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন, জন, টাকাকড়ী, ঘরবাড়ী এ সকল নিতান্ত অসার ও অকিঞ্চিৎকর, ইহাদের কাহারও প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, যাঁহার হৃদয়ে এইরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে দৃঢ়মূল না হইয়াছে, যাঁহার চিত্ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধনে সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত না হইয়াছে,—শাস্ত্র বলেন তাঁহার নির্গুণোপাসনায় অধিকার নাই। উক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট অধিকারী সাধক "অহং ব্রহ্মাস্মি" আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বিশ্বাস কঠোর সাধনা বলে অন্তরে বদ্ধমূল-করিবেন। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে, আমিই নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাব, পরমানন্দ, অনন্ত, অদ্বিতীয়, ব্রহ্ম এইরূপ চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয়। *

চিত্তের একাগ্রতা লাভ

যোগাঙ্গ সাধন।

এই অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হওয়ার পূর্ব্বে সাধককে ( ১ ) "শ্রবণ," "মনন," "নিদিধ্যাসন" ও "সমাধি" অথবা (২) সমাধির অঙ্গভূত "যম," "নিয়ম," "আসন,"

* "এবমাচার্য্যোণাধ্যারোপাপবাদপুরঃসরং তত্ত্বংপদার্থৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেহ-ববোধিতেহধিকারিণোহহং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবপরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্মাস্মীতি অখণ্ডা-কারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরুদেতি।"—বেদান্তসার।

"প্রাণায়াম," "প্রত্যাহার," "ধারণা," "ধ্যান" ও "সবিকল্প সমাধি" অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম অর্থাৎ বেদান্ত মতে জ্ঞানমার্গে অধিকার লাভ হওয়ার পরে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই জ্ঞানের বিচার দ্বারা পরমাত্মায় সমাধি লাভ করা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থাৎ সাঙ্খ্য অথবা যোগশাস্ত্র মতে যমনিয়মাদি যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা সমাধি লাভ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিদেব বলেন,—

"যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে
জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক খ্যাতেঃ।" পাতঞ্জলদর্শন—২।২৮

অর্থাৎ যোগাঙ্গাদি ( যমনিয়মাদি—"যমনিয়মাসন প্রাণয়ামপ্রত্যাহার-ধারণাধ্যানসমাধয়োহষ্টাবঙ্গানি"—পাতঞ্জলদর্শন ) অনুষ্ঠান করিতে করিতে চিত্তের রজস্তমোভাগ বিদূরিত হয়। তখন অবিদ্যা, অস্মিতা, অনুরাগ, বিদ্বেষ মৃত্যুভয় এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যাই ক্ষয় হইয়া যায়। মানবগণ যেমন এক একটী অঙ্গের অনুষ্ঠানে সমর্থ হইবে, ততই অবিদ্যামল কাটিয়া যাইতে পারিবে। অবশেষে সমাধির অনুষ্ঠানের দ্বারা যখন আত্মা আর বুদ্ধ্যাদি জড়-পদার্থ এতদুভয়ের পার্থক্য অনুভূত হয়, তখনই চিত্ত শুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়।"

সমাধি

সমাধি দুই প্রকার "সম্প্রজ্ঞাত সমাধি" ও "অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি।" সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন প্রকার পদার্থের চিন্তা বা অনুভূতি থাকে। এই সমাধিদ্বারা শ্রুতিকথিতানুরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, অভিমান ও বুদ্ধির সংযম হইয়া থাকে। এই সকল সংযমাবস্থাভেদে ইহা "সবিতর্ক," "সবিচার" "সানন্দ" ও "অস্মিতামাত্র" এই চারিভাগে বিভক্ত। ( "বিতর্ক-বিচারানন্দা স্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ"—পাতঞ্জল দর্শন, ১ম পাদ, ১৭ সূত্র )। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা কোন প্রকার ধ্যান, জ্ঞান,



চিন্তা থাকে না। তখন চিত্ত কেবল নিরলম্বভাবে থাকে। ( "তদভ্যাসপূর্ব্বকং হি চিত্তং নিরবলম্বনভাবম্‌প্রাপ্তমিব ভবতি ইত্যেষ নির্ব্বীজঃ সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ"—পাতঞ্জলদর্শন ভাষ্য )।

এই সমাধি দ্বারা সর্ব্বোপাধি-পরিশূন্য আত্মা বা চৈতন্য মাত্রই অবশিষ্ট থাকেন। তখন নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, জীবের মুক্তি হয়।

উল্লিখিত নিতান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা বুঝা গেল, শাস্ত্রীয় নির্গুণোপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ কি জিনিষ। শ্রুতিতে যাহাকে অধ্যাত্মযোগ বলা হইয়াছে, অন্যান্য শাস্ত্রে তাহাকেই নির্গুণো-পাসনা বলা হইয়াছে। অধ্যাত্মযোগকে নির্গুণোপাসনা বলার কারণ নির্গুণ বা নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা বা উপাসনা নহে; * তাহার কারণ

নির্গুণোপসনায় ঈশ্বরের উপাসনার প্রয়োজন নাই।

এই সাধন প্রণালীতে সগুণ বা সাকার ঈশ্বরের ( Personal God ) উপাসনার প্রয়োজন নাই। প্রকৃত অধিকারী সাধক কেবল স্বীয় ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধ্যাদি নিরোধ দ্বারা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন, তাঁহার সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিবার কোনও আবশ্য-কতা নাই। এইজন্য সাংখ্যদর্শনে "ঈশ্বর অসিদ্ধ" বলিয়া ঈশ্বরো-পাসনার অনাবশ্যকতা স্বীকৃত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই সাধন-

---

* উপাসনার কোন অবস্থাতেই নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞান বা উপাসনা হইতে পারে না। সমাধি অবস্থায়ও মন বুদ্ধ্যাদি সূক্ষ্ম জড়পদার্থ অবলম্বনে ব্রহ্মের জ্ঞান হয় সুতরাং সেরূপ জ্ঞানও নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান নহে। কেবল অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে নিরবলম্বভাবে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কার হয়; কিন্তু তখন আবার জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানের ভাব থাকে না।

প্রণালীকে "আত্মোপাসনা" বলাই সঙ্গত। ইহা কদাচ ঈশ্বরোপাসনা নহে। এই সাধন প্রণালীকেই লক্ষ্য করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!"

'হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকে (ঈশ্বরকে নহে) দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, মনন করিবে, ধ্যান করিতে হইবে।"—অবশ্য মনোবুদ্ধ্যাদি সগুণ অবলম্বনের সহিত বুঝিতে হইবে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"

আত্মাকেই প্রিয় জানিয়া উপাসনা কর।

এতএব আমরা দেখিলাম, শাস্ত্রে যাহাকে নির্গুণোপাসনা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রুতি প্রতিপাদিত "অধ্যাত্মযোগ";—তাহা কদাচ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের উপাসনা নহে। ব্রহ্ম উপাস্য নহেন, তাহা, "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি, নেদং যদিদমুপাসতে" এই শ্রুতির দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই শ্রুতিতে ব্রহ্ম অর্থ "শান্ত শিব অদ্বৈত তুরীয়" পদার্থ; তাঁহার উপাসনা হইতে পারে না। কারণ অধ্যাত্মযোগ দ্বারা প্রকৃতিতত্ত্বের পরবর্ত্তী সেই চতুর্থাবস্থায় উপনীত হইলে উপাস্য উপাসক ভাব থাকে না। সুতরাং এই শ্রুতির সহিত উল্লিখিত অধ্যাত্মযোগ-প্রতিপাদক শ্রুতির কোনই বিরোধ নাই।

এখন শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ বা নিরাকার উপাসনার সহিত নিরাকারবাদীর প্রচারিত নিরাকার উপাসনার তুলনা করা যাউক। নিরাকারবাদী বলেন,—

নিরাকারবাদীর নিরাকার উপাসনা ও অধ্যাত্মযোগ এক নহে।



"আমরা পদার্থের গুণ ভিন্ন আর কিছুই জানিতে পারি না। আকৃতি, বিস্তৃতি, বেধ, বর্ণ প্রভৃতি গুণ ভিন্ন জড়ের আর কিছুই জানি না। সেইরূপ জ্ঞান, ভাব, ইচ্ছা ভিন্ন মনের আর কিছুই জানি না। গুণাধার পদার্থকে আমরা জানিতে পারি না। সাকারকে জানি গুণ দ্বারা, নিরাকারকেও জানি গুণ দ্বারা। আসল চৈতন্যকেও জানি না, আসল জড় যদি কিছু থাকে, তাহাকেও জানিনা। পরমেশ্বরকেও সেইরূপ তাঁহার গুণ দ্বারা জানি। গুণাতীত ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারি না। আমরা জ্ঞান, শক্তি, মঙ্গল-ভাব প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই পূজা করিয়া থাকি। সাকার ও নিরাকার উভয় প্রকার পদার্থেই যখন আমাদের গুণগ্রহণের ক্ষমতা রহিয়াছে, তখন নিরাকারের উপাসনা হইবে না কেন?" ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—১ম খণ্ড, ১১২—১২৩ পৃষ্ঠা।

অর্থাৎ গ্রন্থকার নিজেই স্বীকার করিতেছেন, নির্গুণ ঈশ্বরের উপাসনা হইতে পারে না। তাঁহার মতে সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই নিরাকার উপাসনা। কিন্তু এদিকে শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্রের মতে রূপ ও গুণের অতীত ব্রহ্মের উপাসনাই (অধ্যাত্মযোগ) নির্গুণ বা নিরাকার উপাসনা। উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা শাস্ত্রীয় নির্গুণোপাসনার যদি কিঞ্চিন্মাত্র আভাস প্রদান করিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবে পাঠক ইহা অনায়াসেই বুঝিবেন, নিরাকারবাদীর নিরাকার-উপাসনা কদাপি শ্রুতি-প্রতিপাদিত ও অন্যান্য শাস্ত্রোক্ত নির্গুণোপাসনা নহে। "জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, শক্তিময়, দয়াময়" ঈশ্বরের উপাসনা কদাচ "অধ্যাত্মযোগ" নহে। নিরাকারবাদিগণ তাঁহাদের স্বকপোলকল্পিত নিরাকার উপাসনা প্রচার করিতে গিয়া নির্গুণোপাসনা-প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকল যে উদ্ধৃত করেন,

তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া বোধ হয়। "জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, শক্তিময়, দয়াময়" ঈশ্বরের উপাসনা যে প্রকৃতপক্ষে সাকার উপাসনা—ঈশ্বরে যেরূপ গুণ আছে, সেরূপ আকারও আছে, ঈশ্বরের গুণ চিন্তা করিতে হইলে তাঁহার আকারও চিন্তা করা হয়, ইহা ইতিপূর্ব্বে বিশদরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে সে সকল যুক্তির পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

---

## মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত নিরাকার উপাসনা কি ?

অনেক নিরাকারবাদী মহানির্ব্বাণতন্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁহাদের নিরাকার উপাসনা সমর্থন করেন। অতএব মহানির্ব্বাণতন্ত্রে আধুনিক নিরাকার উপাসনার সাপক্ষে কোন কথা আছে কি না, দেখা আবশ্যক। যে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথা উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রেই শিব, আদ্যাশক্তি প্রভৃতি দেবতার পূজার বিধান ও উপাসনা প্রণালী বিস্তৃত রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং নিরাকারবাদী যদি মহানির্ব্বাণতন্ত্রকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করেন, তবে তাঁহাকে তৎপ্রচারিত শিব ও আদ্যাশক্তির সাকার উপাসনাও অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে হইবে। আমরা দেখাইব, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে যে ব্রহ্মোপাসনার বিষয় উল্লেখ আছে, তাহা প্রকৃতপক্ষে সাকার উপাসনা।

নিরাকারবাদিগণ উপনিষদের দোহাই দিয়া, যে নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচার করেন, তাঁহাকে যে কেবল এক



মাত্র যোগিগণ অধ্যাত্মযোগ বা সমাধিযোগ দ্বারা লাভ করিতে পারেন, তিনি যে "দয়াময়" "শক্তিময়," "জ্ঞানময়" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বোধ্য নহেন ("নির্ব্বিশেষ"), "দয়াময়" "শক্তিময়," "জ্ঞানময়" ঈশ্বরের যে প্রণালীতে নিরাকার উপাসনা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা তিনি প্রাপ্তব্য নহেন, ইহা মহানির্ব্বাণতন্ত্র তৃতীয় উল্লাসের প্রথমেই বলিতেছেন,—

"জ্ঞেয়ং ভবতি তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদ্ বিশ্বময়ং পরং।
যথাতথ-স্বরূপেণ লক্ষণৈর্ব্বা মহেশ্বরি॥
সত্তামাত্রং নির্ব্বিশেষং অবাঙ্মনসগোচরং।
অসত্ত্রিলোকী সন্ধানং স্বরূপং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্॥
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।
দ্বন্দ্বাতীতৈ র্নির্ব্বিকল্পৈ র্দেহাধ্যাসনবর্জ্জিতৈঃ॥
যতো বিশ্বং সমুদ্ভূতং যেন জাতঞ্চ জীবতি।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্ম লক্ষণৈঃ॥
স্বরূপ-বুদ্ধ্যা যদ্বেদ্যং তদেব লক্ষণৈঃ শিবে।
লক্ষণৈ রাপ্তুমিচ্ছূনাং বিহিতং তত্র সাধনম্।"—তৃতীয় উল্লাস।

হে মহেশ্বরি! সচ্চিদানন্দ বিশ্বময় পরব্রহ্মকে দুই প্রকারে জানা যায়। প্রথমতঃ স্বরূপ জ্ঞান দ্বারা, ও দ্বিতীয়তঃ তটস্থ লক্ষণ দ্বারা। তাঁহার স্বরূপ অবস্থায় তিনি কেবল সৎস্বরূপে উপলব্ধ হন, তখন তাঁহাকে কোন বিশেষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না, তখন তিনি বাক্য মনের অগোচর; তদবলম্বনে এই অসৎ জগৎ সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তাঁহার এই স্বরূপ অবস্থা সর্ব্বত্র সমদর্শী, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বের ( Relative idea ) অতীত, নাম

জাত্যাদিরহিত, দেহে আত্মজ্ঞানবর্জ্জিত যোগিগণ সমাধি যোগ ( নির্ব্বিকল্প সমাধি ) দ্বারা জানিতে পারেন। আর তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানিতে হইলে তাঁহাকে জগতের সহিত সংশ্লিষ্ট ভাবে জানিতে হয়, অর্থাৎ তিনি এই জগতের স্থষ্টিকর্ত্তা, তিনি এই জগতের পালনকর্ত্তা, ও তিনি এই জগতের সংহারকর্ত্তা এই ভাবে তাঁহাকে জানিতে হয়। বস্তুতঃ তিনি এক, অখণ্ড, অদ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া এই স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা যাঁহাকে জানা যায়, তটস্থ লক্ষণ দ্বারাও সেই তাঁহাকেই জানা হয়। যাঁহারা তাঁহাকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের জন্য নিম্নলিখিত সাধনপ্রণালী বিধিবদ্ধ করা হইল।

ইহার পরে জগৎ-সংশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে কি প্রণালীতে উপাসনা করিতে হয়, তাঁহার দীক্ষা গ্রহণের প্রণালী, পূজার পদ্ধতি, গায়ত্রী, ধ্যান, জপ, স্তব প্রভৃতি বিস্তাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

জগৎ-সংশ্লিষ্ট ভাবে ঈশ্বরচিন্তা যে সাকার চিন্তা, জগতের সহিত তাঁহাকে ভাবিতে হইলে জগতের নাম ও রূপ তাঁহাতে আরোপিত করিয়া যে তাঁহাকে চিন্তা করা ভিন্ন চলে না, জগতের মধ্যে ঈশ্বর উপাসনা যে সাকার উপাসনা, তাহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে অতি বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। স্থতরাং এস্থলে সে সকল যুক্তির পুনরুল্লেখ নিস্প্রয়োজন।

আর এক কথা এই, মহানির্ব্বাণতন্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা যে প্রণালীতে করিবার উপদেশ রহিয়াছে, ব্রাহ্মসমাজে



প্রচলিত নিরাকার উপাসনার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে নিরাকার উপাসনার অধিকারীকে সদ্-গুরুর নিকট যথাশাস্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। সে নিরাকার উপাসনায় মন্ত্র-উচ্চারণ, গায়ত্রী-জপ, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি দ্বারা ষোড়শোপচারে পূজা, হোম প্রভৃতি প্রচলিত সাকার উপাসনার সর্ব্বপ্রকার অঙ্গই বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু নিরাকারবাদিগণ সে সকলকে পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘৃণা করেন। স্থতরাং মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত তথা-কথিত নিরাকার ব্রহ্মকে প্রোটেষ্টাণ্ট্ খৃষ্টান্‌দিগের অনুকরণে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করিয়া তাঁহারা মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মো-পাসনার ফললাভে কি প্রকারে আশা করিতে পারেন?

মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনা নিরাকার উপাসনা নহে, প্রকৃত পক্ষে সাকার উপাসনা

এইরূপে আমরা এই অধ্যায়ে দেখিলাম, শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্র-প্রতিপাদিত নিরাকার বা নির্গুণোপাসনার অর্থ অধ্যাত্মযোগ দ্বারা আত্মার সমাধি করা। সেই সমাধি দ্বারা যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখন মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। শাস্ত্রীয় নিরাকার উপাসনা সগুণ ঈশ্বরের ( personal God ) উপাসনা নহে। সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা করিতে করিতে নির্গুণোপাসনার অধিকার জন্মে। সগুণ উপাসনা ও শমদম প্রভৃতি সাধন দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে তবে নির্গুণোপাসনার জন্য চিত্তভূমি প্রস্তুত হয়। সর্ব্ব-সাধারণে এই নির্গুণ উপাসনার কদাচ অধিকারী হইতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান কি জিনিষ, তাহা সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য নহে।

শ্রুতি বলেন, নিরাকার ব্রহ্মের কথা "অনেকে কর্ণেও শ্রবণ করিতে পারে না ; এবং তাঁহার বিষয় শ্রবণ করিয়াও অনেকে বুঝে না। তাঁহার বিষয় যিনি শিক্ষা দিতে পারেন, সেরূপ বক্তা অতি বিরল এবং উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলেও তাঁহার বিষয় বুঝিতে পারেন, এরূপ লোকও বিরল।" "সামান্য নরের শিক্ষায় বহু-চিন্তা দ্বারাও সে পরমাত্মাকে জানা যায় না। অসামান্য আচার্য্যের শিক্ষা ভিন্ন উপায় নাই।" অতএব শাস্ত্র যদি সত্য হয়, শ্রুতি যদি সত্য হয়, তবে এ কথা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে, ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনা কদাচ শ্রুতিপ্রতিপাদিত নির্গুণ উপাসনা নহে। কোন নিরাকারবাদী শাস্ত্রোক্ত নির্গুণো-পাসনা প্রণালী অবলম্বন করিবার অধিকারী কি না, তাহা তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জীবনের কথা। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে, তাঁহাদের প্রকাশ্য উপাসনা, বক্তৃতা, উপদেশ ও প্রবন্ধাদিতে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং সচরাচর দেখা যায়, তাঁহারা শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষার কোন ধার ধারেন না, এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতি সাধনাঙ্গকে কুসংস্কারমূলক বলিয়া যথেষ্ট ঘৃণা করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "জ্ঞানযোগ" "অধ্যাত্মযোগ" প্রভৃতি বড় বড় কথা অনেক সময়ে ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাহার অর্থ বা গুরুত্ব সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কেবল আমাদের সরল, স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারাই হইতে পারে ;



তাহাতে চিত্তশুদ্ধির কোনই আবশ্যকতা নাই। কেহ কেহ বলেন, চিত্তের একাগ্রতা ধ্যান ধারণারও কোন আবশ্যকতা নাই। এইরূপে আমরা দেখিলাম, ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনার সহিত শাস্ত্রীয় নির্গুণ উপাসনার কোনই সংশ্রব নাই।

---

# নবম অধ্যায়।

## সাকার উপাসনা ও ভক্তিযোগ।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি, জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে মোক্ষ-লাভ করিতে হইলে, শ্রুতির আদেশ অনুসারে ইন্দ্রিয়কে মনে লয় করিতে হইবে, মনকে বুদ্ধিতে লয় করিতে হইবে, বুদ্ধিকে প্রকৃতিতে লয় করিতে হইবে, প্রকৃতিকে ব্রহ্মে লয় করিতে হইবে। এই লয়ের পর লয়, জীব-জগতের এই মহাপ্রলয় সংসাধন করিলে তবে জীব ব্রহ্মে লীন হইতে পারে। কিন্তু এই লয় যে কত কঠোর সাধনা ও উগ্রতপস্যা দ্বারা সংসাধিত হইতে পারে, তাহা শাস্ত্রোক্ত মুনি ঋষিগণের জীবনী পাঠ করিলে জানা যায়। স্বয়ং শ্রুতিই বলিতেছেন,—

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়োবদন্তি।"

মনীষিগণ বলেন, এই জ্ঞানমার্গ শাণিতক্ষুরধারাসমাকীর্ণ পথের ন্যায় বড়ই দুর্গম। এই জন্য সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে কদাপি কেহ এই দুর্গম পথের অধিকারী হইতে পারেন; আবার সহস্র সহস্র অধিকারীর মধ্যেও কদাচিৎ কেহ এই পথে কৃতকার্য্য হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারেন। গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন,—

জ্ঞানমার্গের অধিকারী সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে একটি কিনা সন্দেহ।



"মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপিসিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

হাজার হাজার মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন করে, আবার সহস্র সহস্র যত্নশীল লোকের মধ্যে কদাচিৎ কেহ আমাকে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ( জ্ঞানযোগদ্বারা ) জানিতে পারে।

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥"

শত শত জন্ম সাধনার পরে তবে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি আমাকে পাইতে পারেন। "বাসুদেব সর্ব্বময়" এইরূপ জ্ঞানলাভ করিলে মুক্তি হয়; কিন্তু যাঁহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, সেরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ।

অতএব এই কঠোর সাধনমার্গ যদি কেবল লক্ষের মধ্যে একটির উপযোগী হইল, তবে অবশিষ্ট লোকের উপায় কি? তোমার আমার ন্যায় ইন্দ্রিয়াসক্ত, বিষয়ী, তপোজ্ঞানহীন লোকের কি কোন উপায় নাই? অবশ্যই আছে। পরম উদার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পরমজ্ঞানী যোগী সাধককে আশ্রয় দিয়াছেন, সেইরূপ ঘোরসংসারীকেও ক্রোড় পাতিয়া দিয়াছেন। পরম কারুণিক ভগবান্ জ্ঞানি-মূর্খ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই চরণতলে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছেন। কেবল তাহাই নহে, গীতায় ভগবান্ সাধনের সুগমতার জন্য জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ভক্তিমার্গের আসন উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন! অর্জ্জুন প্রশ্ন করিতেছেন,—

সাধারণ সাধকের জন্য সাকারোপাসনাই বিহিত।

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥" ১২।১।

হে ভগবন্! যাঁহারা ( একাদশ অধ্যায়ে কথিত ) তোমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন সাকার, সগুণ ঈশ্বর রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ, না যাঁহারা জ্ঞানমার্গ অবলম্বন করিয়া তোমার অব্যক্ত, অক্ষর রূপের উপাসনা করেন, তাঁহারাই শ্রেষ্ঠ * ? ইহার উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

গীতোক্ত সগুণ ও নিগুর্ণোপাসনা।

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়াপরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্য মব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং।
অব্যক্তাহি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

যাঁহারা পরমশ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাতে মন সমর্পণ করিয়া ( ভক্তিযোগের দ্বারা ) নিত্যযোগযুক্ত হইয়া আমার ( সাকার রূপের ) উপাসনা করেন, তাঁহারাই আমার মতে উৎকৃষ্টতর যোগী। কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিবৃত্তি সকলকে সম্পূর্ণরূপে

* গীতা হইতে উদ্ধৃত এই কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদে যাঁহাদের সন্দেহ হইবে, তাঁহাদিগকে শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামীর টীকা ও মধুসূদন সরস্বতীর টীকা পড়িতে অনুরোধ করি।



সংযমন বা নিরোধ করিয়া, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আমার অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রবিদ্যমান, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষর রূপের উপাসনা করেন, সেই সর্ব্বভূতের হিত অনুষ্ঠানে রত মহাত্মাগণ ( জ্ঞানযোগিগণ ) আমাকেই প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ( আমার সাকাররূপের যাঁহারা উপাসনা করেন, সেই উল্লিখিত ভক্তযোগিগণ অপেক্ষা ) এই নির্গুণোপাসকদিগের অধিকতর ক্লেশ হইয়া থাকে। কারণ, অক্ষর, অব্যয় রূপের উপাসকদিগের একেবারেই দেহাভিমান পরিত্যাগ করিতে হয়; তাহাতে তাঁহাদের নিরতিশয় কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়।

এস্থলে অর্জ্জুনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল, যখন জ্ঞানযোগিগণ এত কষ্টকর সাধনা করেন, তখন তাঁহাদের ফলও অধিকতর হইবে। ভক্তযোগিগণ কি তাঁহাদিগের ন্যায় মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হয়েন? তদুত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন,—

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্॥"

যাঁহারা মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত কর্ম্মফল আমাতে সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ধ্যান করিয়া উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই সকল মৎসমর্পিতচিত্ত ভক্তদিগকে নিশ্চয়ই অচিরাৎ মৃত্যু-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি, অর্থাৎ তাঁহারাও মোক্ষলাভ করেন, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ময্যেব মন আধৎস্বময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥"

অতএব হে ধনঞ্জয়! তুমি আমাতে (সাকার ঈশ্বরে) মন সমর্পণ কর, আমার প্রতি বুদ্ধি নিবিষ্ট কর; তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই স্থায়িভাবে পাইবে।

গীতার এই ভগবদুক্তিতে আমরা সাকার উপাসনার মূলতত্ত্ব পাইতেছি ও সাকার উপাসনার সহিত নির্গুণোপাসনার পার্থক্য কি, তাহাও দেখিতে পাই।

সাকারোপাসনা ভিন্ন সাধকের গতি নাই।

পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা দেখিয়াছি, জ্ঞানমার্গের অধিকারী হইতে হইলে সাকার উপাসনার প্রয়োজন; এখানে ভগবান বলিতেছেন, ভক্তিমার্গ বা সাকার উপাসনার দ্বারা মোক্ষলাভ পর্য্যন্তও হইতে পারে। অতএব যে পথেই যাওয়া যাউক না কেন, সাকার উপাসনা ভিন্ন গতি নাই। এখন দেখা যাউক,

## সাকার উপাসনা কাহাকে বলে?

সাকারোপাসনা ও নিরাকারোপাসনার পার্থক্য কি?

ব্রহ্মের নাম ও রূপ, গুণ ও ঐশ্বর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য, দেহ ও মনের তদুদ্দেশ্যে যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, তাহাকে সাকার উপাসনা বলে। নির্গুণোপাসক ব্রহ্মকে ত্রিগুণাতীত বলিয়া জানেন, সগুণ ব্রহ্ম স্বীকার করেন না, সাকার উপাসকের নিকট সগুণ, সাকার ঈশ্বর (Personal God)ই একমাত্র উপাস্য। নির্গুণোপাসকের নিকট ব্রহ্ম



এক অখণ্ড, অনন্ত-চৈতন্য পদার্থ; সাকারোপাসক ব্রহ্মের ব্যক্তিত্ব স্বীকার করেন। নির্গুণোপাসকের লক্ষ্য নিস্তরঙ্গ-সাগরবৎপ্রশান্ত নামরূপাদিবিকাররহিত, নির্গুণ, নিরাকার, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাবসম্পন্ন পরমাত্মায় লীন হওয়া। সাকার উপাসকের লক্ষ্য জগৎ-সংশ্লিষ্ট, জগতের নাম রূপাদি সর্ব্ব-প্রকার গুণবিশিষ্ট, সগুণ, সাকার, ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন লীলাময় ভগ-বানের সহিত মিলিত হওয়া। নির্গুণোপাসনার মূলমন্ত্র ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিকে লয় করা; সাকার উপাসনার মূলমন্ত্র সে সকলকে লয় না করিয়া তাহাদের বিষয়ীভূত সগুণ সাকার ঈশ্বরে তাহাদিগকে সমর্পণ করা। নির্গুণোপাসনা সম্বন্ধে শ্রুতির উপদেশ,—

"যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ স্তদ্যচ্ছেজ্ জ্ঞান আত্মনি।"

ইন্দ্রিয় শক্তিকে মনে লয় কর, মনকে বুদ্ধিতে লয় কর। সগুণোপাসনা সম্বন্ধে গীতায় ভগবানের উপদেশ,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।"

অর্থাৎ আমাতে (সগুণ ঈশ্বরে) মন অর্পণ কর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর। নির্গুণোপাসক রূপরসাদিবিকারময় জগৎ হইতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরে নিবেশ করেন; সাকার উপাসক জগতের মধ্যে সর্ব্ব রূপ ও গুণের আধার ভগবানের লীলাবিগ্রহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন মন চরিতার্থ করেন। নির্গুণোপাসক রূপরসাদি বিকার পদার্থের প্রতিবিম্ব হইতে মনকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়া বুদ্ধিতে সংযত করেন; সাকার উপাসক হৃদয়পদ্মে ভগবানের মন-প্রাণ-বিমোহন অসীমলাবণ্যময়

স্বপ্রকাশস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় চারুমূর্ত্তি ধ্যান করিয়া কৃতার্থ হন। নির্গুণোপাসকের অদ্বৈতবুদ্ধিতে রূপ-রসাদি প্রপঞ্চময় জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইয়াছে; সাকার উপাসকের দ্বৈতজ্ঞানে জগতের পৃথক্ অস্তিত্ববোধ রহিয়াছে। নির্গুণোপাসক জড়জগতের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছেন, সাকার উপাসক জড়ের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, জড়ের সাহায্যে, চৈতন্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করেন। নির্গুণোপাসক নাম ও রূপকে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন; সাকার উপাসক তাহাদিগের আপাততঃ অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া তাহদের সাহায্যে তাহাদের মধ্যে তাহাদের সহিত মিলিতভাবে ভগবানকে দেখিতে চেষ্টা করেন। নির্গুণ সাধনা অন্তর্মুখীন; সাকার সাধনা বহির্ম্মুখীন। নির্গুণোপাসনার প্রণালী বিশেষ হইতে সামান্যে উন্নতি (Inductive); সাকার উপাসনা সামান্য হইতে বিশেষে পরিণতি (Deductive)। নির্গুণোপাসনা জ্ঞানবৃত্তি-(Knowledge) মূলক; সগুণোপাসনা ভাববৃত্তি-(Feeling) মূলক।

চতুর্থ অধ্যায়ে Knowing (জ্ঞান), Feeling (অনুভূতি) ও Willing (ইচ্ছাশক্তি)র যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা একবার এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রের জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্মযোগ যথাক্রমে এই Knowing, Feeling ও Willing তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। Knowing অর্থে জ্ঞানলাভ, অর্থাৎ যে সকল বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাদের অবস্থাবোধ। যাহা

জ্ঞানযোগ Knowing তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।



সৎ বা সত্য, যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার নিরূপণ। সাধারণ দ্বৈতবুদ্ধিতে, জড়পদার্থের অস্তিত্ব আছে; সুতরাং জড়পদার্থের জ্ঞানলাভ বলিলে, তাহার আকার, বর্ণ, দূরত্ব, নিকটত্ব প্রভৃতি অবস্থার নিরূপণ। কিন্তু অদ্বৈত বুদ্ধিতে কেবল একটি বস্তুর অস্তিত্ব আছে—"একমেবাদ্বিতীয়ম্"। এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের অস্তিত্ব নাই। জগৎ মিথ্যা, কাল্পনিক, মায়াবিজৃম্ভিত। তাহার পৃথক কোন অস্তিত্ব নাই, তাহার অস্তিত্ব কেবল আত্মায়। এই মিথ্যা জগৎকে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া কেবল আত্মাকে সত্যস্বরূপ জানাই প্রকৃত জ্ঞান লাভ। ইহাই পূর্ব্ববাখ্যাত জ্ঞানযোগ। সুতরাং দ্বৈতজ্ঞানসম্ভূত জড়পদার্থের জ্ঞান হইতে আরম্ভ করিয়া অখণ্ড, অদ্বৈত চৈতন্য পদার্থের জ্ঞান পর্য্যন্ত, সমস্ত আমাদের অন্তরে নিহিত (Inborn) এক জ্ঞানশক্তিরই কার্য্য। হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানযোগ আমাদের জ্ঞানশক্তির (Knowledge) এক বিস্তৃত, বিরাট সম্প্রসারণ।

Feeling এর অর্থ অনুভূতি; সুখদুঃখাদিবোধ। আমাদের কতকগুলি অনুভূতি সুখদায়ক; যেমন, দয়া, স্নেহ, প্রেম, ভক্তি। আর কতকগুলি দুঃখদায়ক; যেমন, ক্ষুধা, পিপাসা, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি। যে গুলি চিত্তের সুখজনক, তাহাতে চিত্ত আসক্ত হইয়া থাকে; আর যে গুলি ক্লেশকর, তাহা পরিত্যাগ করিতে চাহে। কিন্তু সকল লোকের চিত্ত সমান উপাদানে গঠিত নহে। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিনটি গুণের মধ্যে কাহারও চিত্তে

ভক্তিযোগ feeling তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত

কোন একটি প্রবল থাকে। যাঁহার চিত্ত সত্ত্বগুণ প্রধান, তাঁহার যে বিষয়ে সুখ বোধ হয়, যাঁহার চিত্তে রজোগুণ ও তমোগুণ প্রধান, তাঁহার সে বিষয়ে সুখবোধ হয় না। আবার যাঁহার চিত্ত রজোগুণ প্রধান, তাঁহার যে বিষয়ে সুখবোধ হয়, সত্ত্বপ্রধান ও তমঃপ্রধান চিত্তে তাহা সুখকর নহে। একজন রজোগুণপ্রধান ইংরেজ আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শীকারের জন্য বনে জঙ্গলে বাঘ ভালুকের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া নিরতিশয় সুখকর মনে করেন; কিন্তু তাঁহাকে যদি এক ঘণ্টাকাল স্থিরভাবে গির্জ্জায় বসিয়া ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করিতে বলা হয়, তখন তাঁহার ভয়ানক কষ্ট বোধ হইবে। কিছু দিন হইল, কলিকাতার কোন গির্জ্জার একজন প্রচারকের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া কোন ইংরেজ ভদ্রলোক খবরের কাগজে লিখিয়াছিলেন,—উক্ত প্রচারকের অপরাধ তিনি ঠিক ১৫ মিনিটের অধিককাল ব্যাপিয়া এক দীর্ঘ (?) Sermon দিয়াছিলেন,—গির্জ্জা-ঘরে টানাপাখার তলে যে ভয়ানক গরম, তাহাতে ১৫ মিনিটের অধিককাল ধর্ম্মকথা শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হইবে কেন? যাহা হউক, এই রজোগুণপ্রধান ইংরেজের যে সাত্ত্বিক ক্রিয়াতে ভয়ানক কষ্ট বোধ হয়, একজন সাত্ত্বিক-প্রকৃতি নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ তাহাতে পরম সুখ বোধ করেন। এইরূপ লোকের প্রকৃতি অনুসারে সুখদুঃখজনক পদার্থের ভেদ হইয়া থাকে। যে যে প্রকৃতির লোক, সেই প্রকৃতিতে যে সকল পদার্থ সুখকর, তাহাতে তাহার আসক্তি জন্মিয়া থাকে।

অনুভূতির আসক্তিজনকতা যেরূপ একটি গুণ, উহা সেইরূপ



লোকের আত্মবিস্মৃতি জন্মায়াই দেয়। উহার মাদকতায় মুগ্ধ হইয়া লোক চৈতন্য হারায়। উহার যখন উত্তেজনা হয়, তখন অন্যান্য চিত্তবৃত্তি সকল নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। আমাদের শরীরে যখন একটি গুরুতর আঘাত লাগে, তখন আমরা সেই আঘাতের পীড়ায় এতদূর অভিভূত হইয়া পড়ি যে, অন্য কোন বিষয়ের অনুভূতি বা জ্ঞান থাকে না। আমাদের কোন একটা যন্ত্রণাদায়ক পীড়া উপস্থিত হইলে, আমরা অন্য কোন বিষয় ভাবিতে কিংবা কিছু করিতে পারি না। এইত গেল শারীরিক অনুভূতির কথা। আমাদের মানসিক অনুভূতির মাদকতা আরও বেশী। কাম, ক্রোধ, লোভ, এই সকল অনুভূতির উত্তেজনায় লোকে কি না করিয়া থাকে? কত সময় কত লোকে জীবনের মায়া ভুলিয়া, শত শত বিপদ্‌কে তুচ্ছ করিয়া, সামাজিক ও পারত্রিক দণ্ডকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া, এই অনুভূতির উত্তেজনায় কত অপকর্ম্মই না করিয়া থাকে। আবার অন্যদিকে দেখা যায়, লোকে যাহা কিছু সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, তাহাও এই অনুভূতির উত্তেজনায়। পৃথিবীতে যে সকল দয়াবীর, দানবীর, ধর্ম্মবীর, যুদ্ধবীর নিজের স্বার্থ বলি দিয়া পরোপকারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাও এই অনুভূতির উত্তেজনায়।

যত প্রকার Feeling (অনুভূতি) আছে, তাহার মধ্যে স্নেহ বা প্রেমের বল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অনুভূতির যে প্রধান দুইটি গুণ,—আসক্তি ও মাদকতা, তাহা এই প্রেমে যেরূপ তীব্রভাবে জন্মিয়া থাকে, এরূপ আর কোন অনুভূতিতেই

জন্মে না। এই প্রেম সংসারে পিতামাতা ও সন্তান, স্বামী ও স্ত্রী, বন্ধু, ভ্রাতা ইহাদিগকে যেরূপ কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রেমের বলে মানুষ যে আপনাকে ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, পরের জন্য প্রাণদান পর্য্যন্ত করিতে পারে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এখন এই প্রেমকে নিয়মিত করিয়া যদি ভগবৎ-চরণে সমর্পণ করা যায়, তাহাতে লোক সংসারে থাকিয়াও সংসার ভুলিতে পারে। ভগবৎ-প্রেমের আসক্তি যতই বাড়ে, মাদকতা যতই প্রবল হয়, ততই সর্ব্বদা বিষয়দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও বিষয়বাসনার গ্রন্থি সকল শিথিল হইয়া যায়, এবং পরিশেষে মানুষ ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ও প্রকৃতির সীমা অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের সহিত মিলিত হইয়া যায়। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তিতে॥"

যাঁহারা সতত প্রীতিপূর্ব্বক ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করেন, তাঁহাদিগকে আমি বুদ্ধিযোগ বা জ্ঞানযোগ প্রদান করিয়া থাকি; তদ্দ্বারা তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হন। ভক্তিসাধনের যে পরিণাম, জ্ঞানযোগেরও সেই একই পরিণাম। এস্থলে জ্ঞান ও ভক্তির সামঞ্জস্য। এই ভক্তিযোগ আমাদের অন্তরে নিহিত অনুভব বৃত্তির (Feeling) অনুশীলন দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিলাম, অনুভববৃত্তির অনুশীলন দ্বারা ভক্তিযোগ সাধিত



হয়। এখন দেখা যাউক, কর্ম্মযোগের সহিত ইচ্ছা শক্তির কি সম্বন্ধ।

কর্ম্মযোগ willing তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত

আমাদের (Willing) বা ইচ্ছাশক্তির মূলে কোন একটি (Motive) বা কামনা থাকে। ইচ্ছাশক্তি-রূপ বাষ্পযান (Engine) কামনা রূপ বাষ্প (Steam) এর দ্বারা পরিচালিত। কামনা দ্বারা ইচ্ছাশক্তি নিয়ন্ত্রিত হয়। যাহার যেরূপ কামনা, তাহার ইচ্ছা সেই কাম্যবস্তু লাভে পরিচালিত হয়। সুতরাং এই কামনাই ইচ্ছাশক্তির মূলবস্তু। এই কামনাই মানুষের মনকে বিষয়বস্তুর প্রতি পরিচালিত করে। আমরা যাহা কিছু করি, সকলই এই কামনা দ্বারা পরিচালিত হইয়া করি। আমরা যে রজ্জু দ্বারা এই সংসারের সহিত আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, এই কামনাই তাহার মূল গ্রন্থি। এখন এই কামনা গ্রন্থি যদি ছিন্ন করা যায়, তবে সংসারের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন হইয়া যায়। বিষয়ের সহিত আমাদের বন্ধন ছিন্ন হইলে, আমরা ক্রমে মন, অভিমান, বুদ্ধি প্রভৃতি স্তর অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভ করিতে পারি। এই বিষয়-গ্রন্থিচ্ছেদনের উপায়, কামনা-শূন্য হইয়া কার্য্য করা। সংসারে থাকিতে হইলে আমরা কখনও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারি না। কিন্তু সেই কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিলে, তদ্দ্বারা আমাদের সেই কর্ম্মজনিত ফলাফলের জন্য দায়ী হইতে হয় না, সুতরাং তাহার ফলস্বরূপ পাপপুণ্য ভোগও করিতে হইবে না। নিষ্কাম-

ভাবে কর্ম্ম করাকেই কর্ম্মযোগ বলে। এই কর্ম্মযোগ ইচ্ছা শক্তির অনুশীলন দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মযোগ ইচ্ছাশক্তির (Willing) অনুশীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্ম্ম-যোগ যথাক্রমে জ্ঞানশক্তি, অনুভবশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির অনু-শীলনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অনুভবশক্তিই আলোচ্য বিষয়, তাহার অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, দেখা যাউক।

অনুভূতির দুইটি গুণ—আসক্তি ও মাদকতা

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, অনুভবশক্তির একটি প্রধান গুণ আসক্তি, অন্যটি মাদকতা। আসক্তি জন্মিবার কয়েকটি বিশেষ উপায় আছে। প্রথমতঃ যে বস্তুতে আমাদের আসক্তি জন্মিবে, তাহা আমাদের প্রকৃতির অনুকূল হওয়া আবশ্যক। ইহার দৃষ্টান্ত উপরে দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ সেই প্রকৃতির অনুকূল বস্তুকে সর্ব্বদা ধ্যান বা ধারাবাহিকক্রমে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা আবশ্যক। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয়ের ধ্যান করে, তাহাতে তাহার আসক্তি জন্মিয়া যায়। বিষয় সম্বন্ধে যে কথা ঠিক, ঈশ্বর সম্বন্ধেও সেই কথা ঠিক। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার অনুভূতি জন্মিবার মূল কারণ কোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা বিষয়ের জ্ঞান। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু বা ব্যক্তির অবলম্বন ভিন্ন অনুভূতির উদ্রেক হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয় অধ্যায়ে Feeling এর বিবরণে বিশেষরূপে দেওয়া



হইয়াছে। কোন বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি এইরূপে আসক্তি জন্মিলে, সেই আসক্তি মাদকতায় পরিণত হয়। আসক্তির বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মন সম্পূর্ণরূপে মাতিয়া যায় ও অন্যান্য বিষয় ও ব্যক্তির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকে না। মন যে প্রকার অনুভূতিতে অনুরক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তেজনা হইলে, অন্যান্য অনুভূতি তদ্দ্বারা পরাভূত হইয়া পড়ে ও অবশেষে সেই একই মাত্র অনুভূতি মনের উপর আধিপত্য করিতে থাকে।

ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, সর্ব্বপ্রকার অনুভূতির মধ্যে প্রেমের বল অধিক। এই প্রেম ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিয়া যদি তাহার অনুশীলন করা যায়, তবে তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া যায়। এখন এই ভগবৎ-প্রেমের অনুশীলন কি প্রকারে হইতে পারে, তাহা দেখা যাউক। ইহাই ভক্তিযোগ। এই ভক্তি-যোগের অনুষ্ঠান সাকার উপাসনা।

---

## ভক্তিযোগের বিশেষ বিবরণ।

অন্যান্য অনুভূতির ন্যায়, ভক্তির পরিস্ফুটনের জন্য কোন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, সাকার, সগুণ অবলম্বনের আবশ্যক। সেই অবলম্বনই হিন্দুর ইষ্টদেবতা বা Personal God.

অন্যান্য অনুভূতির ন্যায়, প্রেম জন্মিবার পূর্ব্বে প্রেমের বস্তু আমাদের প্রকৃতির অনুকূল হওয়া আবশ্যক। সেই জন্য শাস্ত্রের আদেশ, ইষ্টদেবতা নির্ব্বাচন করিতে হইলে গুরু শিষ্যের

প্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। অন্যান্য অনুভূতির ন্যায়, প্রেমের আসক্তি জন্মাইতে হইলে, সেই প্রেমের বস্তু ভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ ধারাবাহিকক্রমে চিন্তা করা আবশ্যক। ইহাই সাকার উপাসনায় ইষ্টদেবতার ধ্যান, ধারণা। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

ভক্তির বিকাশের জন্য সাকার অবলম্বন চাই, তাহাই হিন্দুর ইষ্টদেবতা।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাংধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু-সংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিত-চেতসাম্॥"

গীতা, ১২।৬-৭

অর্থাৎ যাঁহারা একান্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমুদায় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎ-পরায়ণ হইয়া আমাকে ধ্যান করতঃ উপাসনা করেন, হে পার্থ! আমি সেই মদর্পিত-চিত্ত ব্যক্তিগণকে মৃত্যুযুক্ত সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ভক্তির অনুশীলনের জন্য সদ্‌গুরু নির্ব্বাচিত সাকার ঈশ্বরমূর্ত্তিকে ধ্যান ও ধারণা দ্বারা পূজা করা আবশ্যক। পূজা অর্থে কেবল ভগবন্মূর্ত্তির পদতলে পুষ্প বিল্বপত্র নিক্ষেপ, কিংবা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া নহে; ভগবান্‌কে আপনার করিয়া লইয়া, মন প্রাণ এবং যাবতীয় কার্য্য তাঁহাতে অর্পণ করা। তাঁহাকে আপনার করিয়া লইতে হইলে, তাঁহার সহিত একটি লৌকিক সম্বন্ধ স্থাপন

পূজার অর্থ কি?



করা আবশ্যক। আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই, স্নেহ বা প্রেম, কোন না কোন একটি লৌকিক ভাব অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয়। যাহার সহিত কোন শোণিত-সম্বন্ধ নাই, তাহাকে ভাল-বাসিতে হইলে, ভাই, ভগ্নী, মাতা, পিতা প্রভৃতি শোণিত-সম্বন্ধ জনিত ভাব তৎপ্রতি আমরা আরোপ করিয়া থাকি। তাহার কারণ, মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু এই সকল শব্দ স্বভাবতঃ স্নেহমাখা, মধুর; এই সকল শব্দের সহিত স্নেহের মাধুর্য্য হৃদয়ে সিঞ্চিত হয়। তৎপরে ক্রমে এই সকল নামে ডাকিতে ডাকিতে (Association) অভ্যাস দ্বারা যাঁহার সহিত পূর্ব্বে কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাঁহার প্রতি মন স্নেহরসে আপ্লুত হয়। ঈশ্বর-প্রীতিও ঠিক এইরূপে হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্রে বলেন,—

"আদৌ সম্বন্ধস্থাপনম্"। ভক্তিসূত্র।

অর্থাৎ ভক্তিলাভের প্রথমে ভগবানের সহিত একটি সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে।

সম্বন্ধস্থাপন কাহাকে বলে? কোন একটি নির্দ্দিষ্ট ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে অভ্যাস করা। একদিন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম, উপাসক এক মুহূর্ত্তে ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন, আবার তাহার পরমুহূর্ত্তেই মাতা বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ইহাতে বুঝা গেল, তাঁহার সম্বন্ধস্থাপন হয় নাই ও তাঁহার মাতা ও পিতা বলিয়া আহ্বান কেবল কথার কথা মাত্র, কদাচ হৃদয়স্পর্শী নহে। কারণ

আগে সম্বন্ধ স্থাপন আবশ্যক।

যে হৃদয় একবার পিতৃভক্তিতে আপ্লুত হইয়াছে, তাহা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পরমুহূর্ত্তেই কি প্রকারে মাতৃভক্তিতে অভিষিক্ত হইতে পারে? আমরা কি কখনও আমাদের লৌকিক মাতাকে পিতা কিংবা পিতাকে মাতা বলিয়া ডাকিতে পারি? সে যাহা হউক, ঈশ্বরের সহিত লৌকিক সম্বন্ধস্থাপন ভক্তিযোগের প্রথম সোপান। ভক্তিরসভেদে এই সম্বন্ধ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। কেহবা ভগবান্‌কে মাতৃভাবে দেখেন, কেহবা পিতৃভাবে দেখেন, কেহ বা বন্ধুভাবে, কেহ বা পুত্রভাবে, কেহ বা প্রভুভাবে, কেহ বা কান্তভাবে ভালবাসিয়া থাকেন। পূর্ব্বতন সাধকগণের মধ্যে নন্দ ও যশোদা পুত্রভাবের উপাসক; অর্জ্জুন বন্ধুভাবের উপাসক; ব্রজগোপিকাগণ কান্তভাবের উপাসক; হনুমান্ প্রভুভাবের উপাসক; রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি মাতৃভাবের উপাসক ছিলেন।

এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপনের পর ঈশ্বরে চিত্তবৃত্তি সমর্পণ করিতে হইবে। চিত্তবৃত্তি সমর্পণের অর্থ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয় ও মানসিক বৃত্তি সকল ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা। চক্ষু দেখিবে কেবল তাঁহারই রূপ; কর্ণ শুনিবে কেবল তাঁহারই গুণানুকীর্ত্তন; নাসিকা আঘ্রাণ করিবে কেবল তাঁহারই গাত্রগন্ধ; জিহ্বা আস্বাদন করিবে কেবল তাঁহার প্রসাদ; ত্বক্ অনুভব করিবে কেবল তাঁহারই সুস্নিগ্ধ করস্পর্শ। মন কেবল তাঁহারই গুণ স্মরণ করিবে; বুদ্ধি কেবল তাঁহারই গুণের বিচার করিবে। এমন কি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ এ সকলের

চিত্তবৃত্তি সমর্পণ।



ক্রিয়াও কেবল তাঁহারই উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইবে। তাই মহর্ষি নারদ বলেন,—

"তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং
তস্মিন্নেব করণীয়ং, তস্মিন্নেব করণীয়ম্"।—ভক্তি-সূত্র।

তাঁহাতে (ভগবানে) আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক সমস্ত চেষ্টা অর্পণ করিয়া, কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি তাঁহাতেই করিবে, তাঁহাতেই করিবে। ভক্ত রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন,—

"শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগর ফির, মনে কর, প্রদক্ষিণ শ্যামা মারে।
যত শোন কর্ণপুটে, সবই মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে।
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে,
ওরে আহার কর, মনে কর আহুতি দেই শ্যামা মারে।"

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু করিবে, যাহা কিছু খাইবে, যে কিছু হোম করিবে, যে কিছু দান করিবে, যে কিছু তপশ্চরণ করিবে, তৎসমস্তই আমাতে অর্পণ করিবে।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

যিনি আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান

করেন, আমি সেই সংযমাত্ম-ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত উপহার সকল গ্রহণ করি।

ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধি যেরূপ ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য, বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিও সেইরূপ ভক্তিযোগ দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে। বস্তুতঃ

বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি।

বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি না হইলে ঈশ্বরানুরাগ জন্মিতে পারে না। তাই ভক্তিযোগে ধ্যান, ধারণা দ্বারা যেরূপ ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ ভগবানের প্রতি কর্ম্ম সমর্পণ ও ভোগ্যবস্তু নিবেদন দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিরও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

"বিষয়াকৃষ্টচিত্তস্য যন্মহৌষধমুচ্যতে।
সর্ব্বেন্দ্রিয়াপ্যবস্তূনাং ভগবত্যৈ সমর্পণম্॥"

যাহার চিত্ত সর্ব্বদা বিষয়ের দ্বারা সমাকৃষ্ট হয়, তাহার নিমিত্ত উপযুক্ত মহৌষধ বলিতেছি,—ইন্দ্রিয়ের উপভোগ্য যে কোন দ্রব্য আছে, তৎসমস্তের দ্বারাই জগদম্বার অর্চ্চনা করিবে—তবেই বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইবে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ভক্তিযোগের সাধন-প্রণালীতে—(১) ঈশ্বরকে ধ্যান, ধারণা করা আবশ্যক; (২) চিত্তবৃত্তি তাঁহাতে অর্পণ করা আবশ্যক; (৩) ভোগ্যবস্তু তৎপ্রতি অর্পণ করা আবশ্যক। ঈশ্বরের মূর্ত্তি সর্ব্বদা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সংসারের যাহা কিছু কার্য্য, সকলই তাঁহার উদ্দেশ্যে নিষ্পন্ন করা, ও তৎপ্রতি যাবতীয় ভোগ্য বস্তু নিবেদন করা, ইহাই এক কথায় ভক্তিযোগের সাধন-প্রণালী। তিনি সগুণ, সাকার—তিনি



মানসিক ক্রিয়ার বিষয়ীভূত,—তিনি মানুষের ন্যায় ভোগ্যবস্তু গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বপ্রকার মানবীয় ধর্ম্ম-

ভগবানের প্রতি অনুরাগ সঞ্চার।

বিশিষ্ট, ভক্তের নিকট তিনি মাতা, পিতা, পুত্র কি সখা। ভক্ত তাঁহার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁহার স্তুতি করেন, তাঁহার রূপ গুণে মুগ্ধ না হইলে কখনও তাঁহাকে ভালবাসা চলে না। সেই অতুলরূপের মোহে পাগল হইয়া একদিন ভক্ত কমলাকান্ত গাইয়াছিলেন,—

"তাই কালরূপ ভালবাসি;
কালী জগন্মোহিনী মা এলোকেশী।
মাকে সবাই বলে কাল কাল, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥"

সেই রূপরাশিতে মজিয়া রামপ্রসাদ গাইয়াছিলেন,—

"কাল রূপ অনেক আছে, এবড় আশ্চর্য্য কাল।
যাকে হৃদয় মাঝে রাখিলে পরে, হৃদয় পদ্ম করে আলো॥
রূপে কালী, নামে কালী, কাল হইতে অধিক কাল।
ওরূপ যে দেখেছে, সে মজেছে, অন্যরূপ লাগে না ভাল॥"

কাল শ্যামরূপের বিরহে অধীর হইয়া একদিন ব্রজগোপিকা-গণ কাল যমুনাজলে ও কৃষ্ণমেঘে শ্যামরূপ দেখিয়া অধীর হইয়াছিলেন। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গদেবও সেই কালরূপে মজিয়াছিলেন। সাধক কোন একটি বিশেষ মূর্ত্তি, বিশেষ রূপ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরকে ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে তন্ময় হইয়া যান। ভক্ত যে রূপে মন প্রাণ ঢালিয়া দেন, সেই রূপ ভিন্ন আর কিছুতেই তাঁহার মন আকৃষ্ট হয় না।

ঈশ্বরের সর্ব্বরূপত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ত্ব তাঁহার চক্ষুতে কেবল সেই একই রূপের অন্তরালে চাপা পড়ে।

অনুরাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তন্ময়তা ও মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ

যতই অনুরাগ বাড়িতে থাকে, যতই শিশুর ন্যায় প্রেম গাঢ় হয়, ততই ভক্ত জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা ভুলিয়া গিয়া সরল হইয়া মানুষের ভাব সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আরোপ করেন। তিনি ঈশ্বরকে মানুষের ন্যায় জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে খাওয়ান, শোওয়ান, সাজান, তাঁহাকে ভয় দেখান, গালি দেন, কতই আবদার করেন। রামপ্রসাদ অভিমান ভরে বলিতেছেন,—

"মা ব'লে ডাকিস্‌নারে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে এসে দেখা দিত, সর্ব্বনাশী বেঁচে নাই"

আবার—

"মা মা ব'লে আর ডাকব না।
ওমা দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলাম গৃহবাসী, করিলে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি খাব।
মা বলে আর কোলে যাব না ॥"

রামপ্রসাদ আবার ভর্ৎসনা করিতেছেন,—

"মা হওয়া কি মুখের কথা।
কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা;
যদি না বুঝে সন্তানের ব্যাথা ॥"



ভক্ত আবার আবদার করিয়া বলিতেছেন,—

"এবার কালী তোমায় খাব।
( তারা গণ্ডযোগে জন্ম আমার )
গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় যে মাখেকো ছেলে;
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা! দুটোর একটা করে যাব ॥"

"সখ্যরসে গৌরবসম্ভ্রমের অভাব, আত্মসমজ্ঞান, ভগবানে সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাঁহার সহিত গলাগলি, কোলাকুলি, প্রেমের বিবাদ, অভিমান, ক্রীড়া, কৌতুক; ভক্ত

ব্রজগোপীগণের মহাভাব

"কাঁধে চড়ে, কাঁধে চড়ায় করে ক্রীড়া রণ;
কৃষ্ণ সেবে, কৃষ্ণ করায় আপন সেবন।" *

"বৃন্দাবনের গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুর রসের পরম আদর্শ। তাঁহাদিগের বিরহোন্মাদ এক গৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহারও ভিতরে দেখিতে পাই না। ঠাকুর ক্রীড়া করিতে করিতে কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছেন; পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, লুকোচুরি খেলা ভগবানের চিরাভ্যস্ত; গোপিকাগণ উন্মাদিনী হইয়া বনময় তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছেন, আবার সচেতন বোধে বৃক্ষদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন,—

"হে অশ্বত্থ, হে প্লক্ষ, হে ন্যগ্রোধ, প্রেম-হাসি-মাখা দৃষ্টি দ্বারা আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া, নন্দনন্দন কোথায় গমন করিয়াছেন, তোমরা দেখিয়াছ কি? হে কুরুবক, অশোক, নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, যাঁহার হাস্যদর্শনে মানিনীর মানভঙ্গ হয়, সেই কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছেন? হে কল্যাণি, গোবিন্দ-চরণাশ্রিত তুলসি! তোমার অতি প্রিয় অচ্যুত যিনি অলিকুলমালিনী

* "ভক্তিযোগ"—স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত—২৭১ পৃষ্ঠা।

তোমাকে পাদপদ্মে ধারণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে দেখিয়াছ কি? হে মালতি, মল্লিকে, জাতি, যূথিকে, করস্পর্শে তোমাদিগকে আনন্দিত করিয়া মাধব এদিকে গিয়াছেন কি? হে চূত, হে পিয়াল, হে পনস, হে কবিদার, জম্বু, অর্ক, বিল্ব, বকুল, কদম্ব, নীপ, হে যমুনাতীরবাসী তরুগণ, তোমরা ত পরের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছ; আত্মহারা এই হতভাগিনীদিগকে ফেলিয়া কোন পথে গিয়াছেন, দেখাইয়া দাও।" ভাগবতের অনুবাদ। *

এস্থলে ব্রজগোপিকাগণ ভগবান্‌কে যে ভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই ভাবে না দেখিতে পাইয়া তাঁহার বিরহে আকুল হইতেছেন; কিন্তু ভগবান্ যে সর্ব্বত্রই আছেন, একথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এইরূপ কোন একটি বিশেষ ভাবে, বিশেষ আকৃতিতে, ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে করিতে, ভক্ত শেষে দেখিতে পারেন, তাঁহার আরাধিত দেবতা জগন্ময়, বিশ্বরূপ। তখন আর পূজা অর্চ্চনার প্রয়োজন থাকে না। মহাত্মা অর্জ্জুন ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে মানবীয়ভাবে উপাসনা করিতে করিতে অবশেষে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—

সান্তভাব হইতে অনন্ত ভাবের বিকাশ—বিশ্বরূপ দর্শন।

"ভক্ত্যাত্বনন্যয়াশক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" ১১।৫৪

হে অর্জ্জুন! কেবল একমাত্র ভক্তিদ্বারা আমাকে এইরূপে

* "ভক্তিযোগ"—২৮০, ২৮১ পৃষ্ঠা।



(বিরাট্ রূপে) দেখিতে, তত্ত্বতঃ জানিতে ও আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়। ভক্ত রামপ্রসাদ এইভাবে উপনীত হইয়াছিলেন,—

"মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ্‌লেনা॥
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তা জাননা॥"

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও এইভাবে উপনীত হইয়াছিলেন,—

"তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, যাঁহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৃক্ষসকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন "প্রসাদি ফুলে কি ক'রে পূজা করিব।" তদবধি পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।" *

এইরূপে যে ভক্তিযোগের সাধনা কালীমূর্ত্তির ধ্যান ও ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি ষোপচার পূজায় আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা অবশেষে সাধককে বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করাইয়া জগৎকে ব্রহ্মময় করিয়া দেখাইল। †

এইরূপে আমরা দেখিলাম, ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ ভিন্ন ভক্তিযোগের সাধন হয় না। ইহার কারণ কি, তাহা দেখা যাউক।

* "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত," বাবু রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ৪৭—৪৮ পৃষ্ঠা।

† যাঁহারা বলেন, সান্তমূর্ত্তি উপাসনা দ্বারা অনন্ত উপনীত হওয়া যায় না, তাঁহাদের এমত সম্পূর্ণ ভুল।

## ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ।

এ সম্বন্ধে নিরাকারবাদী বলেন,—

"মানুষ যে আপনার দুর্ব্বলতা ও পরিমিত ভাব উপাস্যদেবতায় আরোপ করে, ইহা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতেছি। দেবতা আহার করেন, বস্ত্র পরিধান করেন, নিদ্রা যান, মল মূত্র পরিত্যাগ করেন, বিবাহ করেন, বংশরক্ষা করেন, স্ত্রী পুরুষে ঝগড়া করেন, যুদ্ধ করেন, তোষামোদ বাক্যে ভুলিয়া যান, সময়ে আত্মবিস্মৃত হইয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়া ফেলেন, আবার তজ্জন্য অনুতাপ করেন, ক্রোধে অন্ধ হন, আবার স্তুতিবাক্যে জল হইয়া যান।"

"মানুষ অনেক পরিমাণে আপনার উপাস্য দেবতায় আপনার দুর্ব্বলতা ও ক্ষুদ্রতা আরোপ করে, স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলিয়া কি পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, মঙ্গলময়, প্রেমময় বলিতে পারিব না? বিশুদ্ধ জ্ঞান, নির্দ্দোষ যুক্তি নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে যে, এক জ্ঞানময়ী, মঙ্গলময়ী, সর্ব্বব্যাপিনী অনন্ত শক্তি এই জগতের উৎপত্তি ও স্থিতির মূলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। কোন প্রকার নাস্তিকতা এই মহান্ সত্যকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

"পরমেশ্বরকে জ্ঞান, প্রেম প্রভৃতি গুণবিশিষ্ট বলিলে কি তাঁহার গৌরব হ্রাস করা হয়? কে বলিল যে, জ্ঞানময়, প্রেমময় প্রভৃতি বিশেষণ শব্দ ব্যবহার করিলে পরমেশ্বরকে মানুষের গুণ দেওয়া হয়? দেবতাতে মানুষের গুণ আরোপ করা হয় না, মনুষ্যে দেবত্ব স্বীকার করা হয়। মানব প্রকৃতির অভ্যন্তরে যে ব্যক্তি দেবত্ব দেখিতে না পায়,—তাহার তুল্য অন্ধ আর কে আছে? পরমেশ্বরকে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময় বলিলে তাঁহার গৌরব হ্রাস করা হয় না, মানুষের গৌরব বৃদ্ধি করা হয়।"*

* ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা—১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ—৭৭।৭৮ পৃষ্ঠা।



উক্ত গ্রন্থকারই আবার অন্যত্র ইহার বিপরীত বলিতেছেন,—

"তর্কচূড়ামণি বলেন, জ্ঞান, দয়া প্রভৃতি সকলই মানবীয় ভাব। সুতরাং ঐ সকল গুণ ঈশ্বরে আরোপ করা উচিত নহে। কিন্তু মানবীয় ভাব কি পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্য কোন ভাব কি আমরা কল্পনাতেও গ্রহণ করিতে পারি? আমাতে যাহা আদবে নাই, আমি তাহা কোন ক্রমেই বুঝিতে বা ভাবিতে পারি না। মানবীয় বা পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্যভাবের সহিত আমাদের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। উহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের মনের সীমার বাহিরে অবস্থিতি করে। মানবীয় ভাব ব্যতীত অন্য ভাব গ্রহণ করা মানবের পক্ষে অসাধ্য।"*

ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ ভিন্ন উপাসনা হইতে পারে না।

মাননীয় ও পার্থিব ভাব ব্যতীত অন্যভাব যদি আমাদের মনের সীমার বাহিরে রহিল, যদি আমাদের কল্পনারও অতীত হইল, তবে পরমেশ্বর যে জ্ঞানময়, প্রেমময়, দয়াময়, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিতে পারি? আমাদের কি মন ছাড়া অন্য কোন চিত্তবৃত্তি বা ইন্দ্রিয় আছে, যদ্দ্বারা আমরা ঈশ্বরের এই সকল গুণ বুঝিতে পারি? বস্তুতঃ উক্ত নিরাকারবাদী এস্থলে নিজের কথায় নিজে ধরা পড়িতেছেন। তিনি যে "বিশুদ্ধ জ্ঞান" "নির্দ্দোষ যুক্তি" দ্বারা ঈশ্বরের এই সকল অমানুষিক (?) গুণ প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা কি? দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, সেরূপ যুক্তি বা প্রমাণ প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। তিনি মনুষ্যে দেবত্ব আছে বলেন; কিন্তু মানুষের গুণ ভিন্ন অন্য

* "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা—১৩০ পৃষ্ঠা।

গুণ যখন আমরা কল্পনাও করিতে পারি না, তখন সেই দেবত্ব জানিবার উপায় কি? বর্ত্তমান যুগের গৌরব, পরমজ্ঞানী, মহাপণ্ডিত ইমারসন ( Emerson ) বলেন,—

"Man can paint, or make or think nothing but man." *Representative men.*

মানুষ, মানুষ ভিন্ন আর কিছু চিত্রিত করিতে পারে না, সৃজন করিতে পারে না, ও ভাবিতে পারে না।

মহর্ষি ব্যাসকেও মানবীয় ধর্ম্ম আরোপ করিতে হইয়াছিল।

একথা সম্পূর্ণ সত্য। মহর্ষি ভগবান্ ব্যাসকেও ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্ম আরোপ করিয়া উপাসনা করিতে হইয়াছিল; তজ্জন্য তিনি অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন,—

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎকল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাঽখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা"
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতা-দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥

অর্থাৎ হে ভগবন্! তুমি ( স্বরূপতঃ ) রূপবিবর্জ্জিত; কিন্তু আমার মন তোমার স্বরূপধ্যানে অশক্ত বলিয়া, আমি তোমার রূপ কল্পনা করিয়া ধ্যান করিয়াছি। তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত; কিন্তু তোমাকে স্তুতি করিতে গিয়া সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি। তুমি সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান আছ; কিন্তু তীর্থযাত্রাদিদ্বারা আমি সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নষ্ট করিয়াছি। হে



জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটি বিকলতাদোষ ( আমার অক্ষমতা জনিত দোষ ) ক্ষমা কর।*

মানুষ নিজের চৈতন্যাবলম্বনে ঈশ্বর চৈতন্য ধারণা করে।

ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিয়াছি, আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় যে কিছু জ্ঞান, তাহা জগতের মধ্য দিয়া, জগতের সহিত মিলিত ভাবে, জগতের নাম ও রূপের সহিত মিশ্রিতভাবে না হইয়া পারে না। জগতের মধ্যে জড় আছে, আর চৈতন্য আছে। জগতের চৈতন্যাংশ মনুষ্যাদি প্রাণীতে প্রকাশিত হয়। সর্ব্বপ্রকার প্রাণী অপেক্ষা আবার মনুষ্যে চৈতন্যের অধিকতর বিকাশ দেখা যায়। মানুষ আপ্ত বাক্য দ্বারা বিশ্বাস করে— ঈশ্বর চৈতন্যস্বরূপ; সুতরাং তাহার নিজের মধ্যে যে চৈতন্য আছে, সেই চৈতন্যের সহিত ঈশ্বরের সাদৃশ্য বুঝিতে পারে। মানুষ নিজের চৈতন্য অবলম্বনে ঈশ্বরচৈতন্য বুঝিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের মধ্যে চৈতন্যের প্রকাশ মন ও মানসিক গুণের অবলম্বনে ভিন্ন হয় না। (†) মানুষ দেখে যে, যেখানে মানসিক গুণ সেখানেই চৈতন্য; সুতরাং মানুষ বিশ্বাস করে, যেখানে

---

* এস্থলে আপত্তি হইতে পারে, ব্রহ্ম নিগুর্ণ, অরূপ, অনির্ব্বচনীয় ও সর্ব্বব্যাপী, এ সকল জ্ঞান কি প্রকারে হইল? তাহার উত্তর, যুক্তি দ্বারা নহে, আপ্তবাক্যে বিশ্বাস দ্বারা।

(†) তাই চণ্ডীতে ভগবতীকে স্তব করা হইয়াছে,—
"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

চৈতন্য থাকিবে, সেখানে মানসিক গুণও অবশ্য থাকিবে। মানসিক গুণ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য কিরূপ, তাহা মানুষের জ্ঞানের অতীত, মনের সীমার বাহিরে, মানুষ তাহা কল্পনায় ও আনিতে পারে না। এইরূপে আবার মানসিক গুণ ছাড়া চৈতন্য কিরূপ, তাহা যেমন মানুষ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ শারীরিক বা ভৌতিক গুণ ( material attributes ) ছাড়া চৈতন্য কিরূপ, তাহাও মানববুদ্ধির অগোচর। কারণ মন ছাড়া চৈতন্য যেমন মানুষের কল্পনাতেও আসে না, শারীরিক গুণ ছাড়া মনও আবার তাহার কল্পনাতে আসে না।

মানসিক ও দৈহিক গুণ বাদ দিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্য আমাদের ধারণা হইতে পারে না।

যা দেবী সর্ব্বভূতেবু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেবু ক্ষুধা রূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেবু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেবু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেবু স্মৃতিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেবু দয়ারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

অর্থাৎ যিনি সকল ভূতের মধ্যে চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, ক্ষুধারূপে, তৃষ্ণারূপে, শ্রদ্ধারূপে, স্মৃতিরূপে, দয়ারূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।



এইরূপে মানুষ যখন ঈশ্বরকে বুঝিতে চেষ্টা করে, তখন ঈশ্বরের প্রতি তাহার নিজের দৈহিক ও মানসিক গুণ সকল আরোপ করে।* কিন্তু তাহার এই আরোপ একেবারে মিথ্যা আরোপ নহে, মানুষের বর্ত্তমান অবস্থায় বিরাটরূপী ঈশ্বরের এই সব রূপগুণ সত্য। তৎপরে মানুষ যখন নিজের মন লইয়া ঈশ্বরের সাধনায় প্রবৃত্ত হয়, বিশেষতঃ ভক্তি-সাধনা আরম্ভ করে, তখন মন তাহার স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া রূপরসাদিতে অনুরক্ত হইতে চায়। রূপরসাদির প্রতিকৃতি ভিন্ন মনের গ্রহণীয় বিষয় কিছুই নাই, সে প্রথম হইতেই রূপরসাদির সহিত ব্যবহারে অভ্যস্ত, রূপরসাদি ছাড়া সে আর

সুতরাং মানুষ তাহার নিজের গুণ আরোপ না করিয়া কখনও ঈশ্বরকে ভাবিতে পারে না।

* তাই চণ্ডীতে দেবগণ স্তব করিতেছেন,

"দুর্গায়ৈ দুর্গপারায়ৈ সারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
খ্যাত্যৈ তথৈব কৃষ্ণায়ৈ ধূম্রায়ৈ সততং নমঃ।"

যিনি দুর্গা, দুর্গম ( বিপদ ) হইতে পার করেন, যিনি সারস্বরূপা, যিনি সর্ব্বকারিণী, খ্যাতিরূপা, কৃষ্ণবর্ণা, ধূম্রবর্ণা, তাঁহাকে সতত নমস্কার।

"অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্যৈ নমোনমঃ!"

যিনি অতি সৌম্যা অথচ অতি রুদ্রা বা কোপনস্বভাবা তাঁহাকে নমস্কার।"

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু কান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।"
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

যে দেবতা সর্ব্বভূতের মধ্যে কান্তি ও লক্ষ্মী (শোভা) স্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। বলা বাহুল্য, উল্লিখিত স্থলে দৈহিক রূপ আরোপ করা হইয়াছে।

কিছুই চায় না। ব্রহ্মে রূপরসাদি নাই বলিলে, সে মানিবে না; রূপরসাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্ম তাহার সীমার বাহিরে; রূপরসাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্মে সে কখনও অনুরক্ত হইতে পারে না। সুতরাং রূপরসাদি বিশিষ্ট ব্রহ্মের বিরাটরূপ ও তদাকৃতি সাকার মানুষ রূপেই সে সহজে অনুরক্ত হইতে পারে। মন স্বভাবতঃ রূপরসাদিতে অনুরক্ত; ব্রহ্মেই সেই রূপরসাদি বিশিষ্ট সাকার রূপের উপাসনা করাতে ক্রমে তাহার সেই রূপরসাদির অনুরক্তি ব্রহ্ম-অনুরক্তিতে পরিণত হয়। মানুষের বিষয়ানুরাগ স্বাভাবিক; ব্রহ্মের মধ্যে সেই বিষয়ানুভব করাতে সেই বিষয়ানুরাগ ক্রমে ব্রহ্মানুরাগে পরিণত হয়। মানুষের পক্ষে ব্রহ্মে মানবীয় ভাবের আরোপ করা স্বাভাবিক; আবার ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগ যতই বৃদ্ধি হয়, ততই সেই মানবীয় ভাব আরও গাঢ়তর হইতে থাকে। কারণ, অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা, প্রীতি সম্পূর্ণ মানবীয় ভাব; তাহা মানব হৃদয়ে মানবীয় কারণের সাহায্য ভিন্ন স্ফূরিত হইতে পারে না।* ভক্ত কখনও ঈশ্বরের ঐশ্বরিক গুণ সকল সর্ব্বদা মনে রাখিয়া তাঁহাকে আপনার বলিয়া ভালবাসিতে পারে না। ভক্তের নিকট ঈশ্বরের ঐশীশক্তি চাপা পড়িয়া থাকে। ঈশ্বরের অনন্ত ঐশ্বর্য্য স্মরণ করিলে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম মানুষের সাধ্য কি যে, তাঁহার নিকট সে নিজের ক্ষুদ্র হৃদয় লইয়া অগ্রসর হইতে

* এইজন্যই কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঈশ্বরের প্রতি মানবীয় ভাবের আরোপ করিয়া অনেক গান রচনা করিয়াছেন। তাঁহার "গীতাঞ্জলি দ্রষ্টব্য। তাঁহার "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়" কবিতাটিতেও এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে।



পারে? ভক্তগণ যতই ভক্তির উচ্চশিখরে আরোহণ করেন, ততই ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদের সাধারণ মানুষের ন্যায় ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণবিরহে অধীর হইতেন; কৃষ্ণের সর্ব্বব্যাপিত্ব তাঁহার নিকট চাপা পড়িয়াছিল। ভক্ত রাম-প্রসাদ কালীকে গালি দিতেন, তাঁহাকে খাইতে চাহিয়াছিলেন; ভগবতীর ঐশ্বরিক ভাব তাঁহার নিকট চাপা পড়িয়াছিল। ইঁহারা ঈশ্বরে মানবীয় ভাবের আরোপ না করিয়া, সর্ব্বদা তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব মনে রাখিলে, কখনও তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না।

নিরাকারবাদীও ঈশ্বরে মানবীয় ধর্ম্মের আরোপ করেন।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, নিরাকারবাদী ঈশ্বরকে প্রেমময়, জ্ঞানময়, মঙ্গলময় বলিয়া তৎপ্রতি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, আর সাকার উপাসক ঈশ্বরে আহার, নিদ্রা, বস্ত্রপরিধান প্রভৃতি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, এই উভয়ের মধ্যে কেবল মাত্রার ( degree ) প্রভেদ, রকমের ( kind ) প্রভেদ নহে। নিরাকারবাদী পূর্ব্বকথিত জড়বিদ্বেষ কিংবা জড়ভীতির বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরকে কেবল কয়েকটি বিশেষ-গুণের সীমানা সহরদ্দের মধ্যে আটক করিয়া রাখিয়া তাঁহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিতে পারেন না, তাঁহার ইন্দ্রিয়মনের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে পারেন না। নিরাকার উপাসক উপাসনা করিতে বসিয়া ভয়ে ভয়ে ঈশ্বরের চিন্তা করেন, পাছে কোন জড়মূর্ত্তি আসিয়া তাঁহার মনে উপস্থিত হয়।* কিন্তু মনের ধর্ম্ম এই যে, চিন্তা করিতে

* এই সব মূর্ত্তি চিন্তার ভয়ে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ঘোর অন্ধকার চিন্তা করিতে

হইলেই জড়বস্তুর চিত্র তাহাতে প্রতিফলিত হইবে,—চিন্তার অর্থ জড়বস্তুর চিত্র সকল মনে সজ্জিত করা। সুতরাং নিরাকারবাদীর মন উপাসনার সময় এইরূপ জড়চিত্রের সহিত সংগ্রাম করিতে নিযুক্ত থাকে, তাহাতে ভাবের উদয় হইতে পারে না। ভাবের উদয় হইলেও সেই ভাব কোনরূপ স্থায়িমূর্ত্তি কিংবা অন্য অবলম্বনের অভাবে ঘনীভূত হইয়া জমাট বান্ধিতে পারে না। এই জন্য ব্রাহ্মসমাজে শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ কিংবা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত মহাত্মার উদ্ভব হওয়া একেবারেই অসম্ভব। ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা সাধন ক্ষেত্রে সমধিক অগ্রসর হইয়াছেন তাঁহারা অবশেষে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যেমন ৺বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ৺রামানন্দস্বামী প্রভৃতি। একবার সুপ্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার Religion in solid and liquid এই নামে এলবার্ট হলে একটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, নিরাকারবাদীদিগের ঈশ্বরভক্তি সাধারণতঃ তরল ভাবাপন্ন (in a liquid state); তাঁহারা উপাসনার সময় কাঁদিয়া আকুল হইলেন, যাই উপাসনা মন্দির হইতে বাহির হইলেন, অমনি মনে তাহার কোনই চিহ্ন থাকিল না। ঈশ্বরভক্তির কঠিনতা (solidity) অভ্যাস করিবার জন্য তিনি সকলকে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিরাকারবাদী উক্ত সীমানা-সহরদ্ধ ভাঙ্গিয়া না দিলে কখনও সেই কঠিন, গাঢ়, জমাটবান্ধা ভক্তিরসের আস্বাদ পাইবেন না।

বলেন,—"অন্ধকারের ভিতর নিরাকার সাধনা, তাহা না হইলে সাকার পুজা হয়।"—ব্রহ্মগীতোপনিষৎ



## প্রচলিত সাকার উপাসনা।

প্রচলিত সাকার উপাসনা ভক্তিযোগের সাধনা। কেবল ভক্তিযোগের নহে, জ্ঞানযোগেরও সাধনা। জ্ঞানযোগের অধিকারী হইতে হইলে, প্রথমে সগুণ, সাকার উপাসনা অভ্যাস করিয়া চিত্তের একাগ্রতা লাভ করা আবশ্যক। ইহা জ্ঞানযোগের অধিকারিতত্ত্বে বিস্তৃতরূপে বুঝান হইয়াছে। সেই জন্য প্রচলিত সাকার উপাসনা যেমন ভক্তিযোগের সাধনা, তেমন জ্ঞানযোগেরও সাধনা। সাকার উপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে যখন জ্ঞানযোগের অধিকার জন্মে, তখন সাধক বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গ অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন, ও নির্জ্জন গিরিগুহা, বিজন অরণ্য, পবিত্র তীর্থক্ষেত্র প্রভৃতি সাধনোপযোগী স্থান আশ্রয় করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। উপাস্য দেবতার ভেদ অনুসারে আধুনিক হিন্দু সমাজ প্রধানতঃ পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত; যথা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য। উপাস্য দেবতার ভেদ হওয়ার কারণ বহু দেবতার স্বীকার নহে; একই দেবতার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভাব অবলম্বনে উপাসনা। ইহা ইতিপূর্ব্বে পঞ্চম অধ্যায়ে বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। ভক্তিরসের পার্থক্য অনুসারে ইহার কোন কোন সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপাসনা-প্রণালী আবার পাঁচভাগে বিভক্ত; যথা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। এই সর্ব্বপ্রকারের উপাসকগণ

সাকার উপাসক পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত

গুরুর নিকট নিজ নিজ মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাকার উপাসনা দ্বারা ভক্তির সাধন করিয়া থাকেন।*

নিত্য ও কাম্য উপাসনা।

সাকার উপাসনা প্রণালী প্রধানতঃ দুই প্রকার, নিত্য ও কাম্য। নিত্য উপাসনা, যেমন সন্ধ্যা ও পূজা যাহা প্রত্যেক উপাসক প্রত্যহ অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য; যাহা না করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়। কাম্য উপাসনার সেরূপ কোন বাঁধাবাঁধি নাই, তাহা compulsory (কবিতা মূলক) নহে, optional (ইচ্ছাধীন)—তাহা ভগবানের কোনও বিশেষ আবির্ভাব উপলক্ষ করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কাম্য উপাসনা উৎসবময়, যেমন খ্রীষ্টানদিগের Christmas বড় দিন, মুসলমানদিগের মহরম, ব্রাহ্মদিগের মাঘোৎসব ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে এই সকল উৎসবময় কাম্য উপাসনা অনুষ্ঠানের দ্বারা নিত্য উপাসনা অধিকতর রুচিকর হয়। কাম্য উপাসনার পদ্ধতি এস্থলে বিবৃত করা অসম্ভব। নিত্য উপাসনার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া আবশ্যক। তদ্দ্বারা কাম্য উপাসনারও অনেকটা আভাষ পাওয়া যাইবে। নিত্য উপাসনাপদ্ধতি কিরূপ, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তিযোগের সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা একবার দেখা যাউক।

* বর্ত্তমান হিন্দু সমাজের যে শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে প্রকৃত শাস্ত্রানুসারে এই সকল সাধন প্রণালী অনুষ্ঠিত হইতেছে, এরূপ বলা যায় না। কিন্তু এস্থলে সে বিষয় বক্তব্য নহে। যাঁহারা শাস্ত্র ও গুরূপদেশানুসারে সাধন করিতে পারেন না, সে কেবল তাঁহাদের দোষ, শাস্ত্র ও তৎপ্রচারিত উপাসনা প্রণালীর দোষ নহে।



নিত্য উপাসনার প্রণালী।

নিত্য উপাসনা—সন্ধ্যা ও পূজাপদ্ধতি এস্থলে বিস্তারিত রূপে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক সে বিষয় অন্য পুস্তকে পড়িয়া লইবেন, কিংবা সে সম্বন্ধে উপযুক্ত লোকের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবেন। কেবল মোটামুটী কয়েকটি কথা এখানে বলা যাইতেছে। নিত্য উপসনাতে কোন পুরোহিতের আবশ্যক নাই, ইহা উপাসকের নিজেরই অবশ্য-কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান। ইহাতে সাধরণতঃ প্রতিমার প্রয়োজন নাই। নিত্য-উপাসনা-পদ্ধতিতে প্রধানতঃ পাঁচ প্রকার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়—

(১) চিত্তশুদ্ধির জন্য আচমন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান।

(২) ইষ্টদেবতার ধ্যান ও মানসপূজা।

(৩) ইষ্টদেবতার বাহ্যপূজা।

(৪) ইষ্টদেবতাকে বিশ্বরূপ জানিয়া জগতের সহিত তাঁহার পূজা।

(৫) মন্ত্রজপ, স্তব, প্রণাম, আত্ম-নিবেদন ইত্যাদি।

ইষ্টদেবতাকে হৃৎপদ্মে ধ্যান করিয়া মানস উপহার দ্বারা তাঁহার মানসপূজা করিতে হয়। তৎপরে কোন বাহ্য বস্তু অবলম্বনে তাঁহার বাহ্যপূজা করিতে হয়। বাহ্য অবলম্বন স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এই দুই শ্রেণীর। স্বাভাবিক অবলম্বন যথা— বৃক্ষ (তুলসী, বিল্বাদি), পুষ্প (জবা, পদ্মাদি), জল ইত্যাদি। কৃত্রিম অবলম্বন যথা শালগ্রাম, শিবলিঙ্গাদি। বাহ্য পূজাতে

দেবতাকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় দ্বারা অভ্যর্থনা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, গন্ধ, পুষ্প, পত্র, বস্ত্র প্রভৃতি ভোগ্যবস্তু নিবেদন করিতে হয়। এই প্রকারে ইষ্টদেবতার পূজা ভিন্ন, সূর্য্যাদি গ্রহ, ইন্দ্রাদি দেবতা, আকাশাদিভূত, মৎস্যাদি অবতার এইরূপ বিশ্বরূপ ঈশ্বর যে সময়ে যে ভাবে যে আকারে আবির্ভূত হইয়াছেন বা হইতেছেন, সে সকলেরও পূজা করিতে হয়। যেমন শিবপূজা করিতে বসিয়া উপাসককে ক্ষিতি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, যজমান, সূর্য্য, চন্দ্র এই অষ্ট মূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। শক্তিপূজা করিতে বসিয়া উপাসককে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অনৈশ্বর্য্য এই অষ্টবিধ ভাব ও অনেক দেবতার পূজা করিতে হয়। হিন্দুর ইষ্টদেবতা বিশ্বমূর্ত্তি, বিরাট্ পুরুষ; তাঁহার পূজাতে বিশ্ব-জগতেরও পূজা করিতে হয়। বিশ্বজগতের পূজা না করিলে প্রকৃতরূপে তাঁহার পূজা করা হয় না।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভক্তিযোগের উদ্দেশ্য রূপ-রসাদির মধ্যে থাকিয়া, রূপরসাদির সাহায্যে ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার দ্বারা মুক্তিলাভ। সেই অনুরাগ সঞ্চার দুই প্রকারে হয়—ঈশ্বরের ধ্যান দ্বারা ও বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির দ্বারা। বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তির উপায় ঈশ্বরে ভোগ্য বস্তু নিবেদন করা। উল্লিখিত সাকার উপাসনা পদ্ধতি দ্বারা এই দুই উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। ঈশ্বরের ধ্যান অর্থে তাঁহার কোন নির্দ্দিষ্ট রূপের ও ভাবের ধারাবাহিকক্রমে চিন্তা। ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিতে সেই রূপ ও ভাব প্রকটিত। ঈশ্বরের

ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার



ধ্যান যে কেবল সন্ধ্যা ও পূজার সময়ে করিতে হয়, এরূপ নহে। ঈশ্বরানুরাগ লাভ করিতে হইলে, সর্ব্বদা সর্ব্বক্ষণ হৃৎপদ্মে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। কেবল সন্ধ্যা ও পূজা করা তাঁহার উপাসনা নহে। সংসারের যাবতীয় কার্য্য তাঁহার কার্য্য বলিয়া সম্পাদন করিতে হইবে ও সে সকলও তাঁহার উপাসনার মধ্যে গণ্য হইবে। ইষ্ট দেবতার পূজা শেষ করিয়া তাঁহাকে এই মন্ত্র দ্বারা প্রণাম করিতে হয়,—

ধ্যানের আবশ্যকতা।

"প্রাতরারভ্য সায়ান্তং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি জগন্মাতঃ* 'স্তদেব তবপূজনম্॥"

"হে জগন্মাতঃ! প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে পুনর্ব্বার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত, আমি যাহা যাহা করি, সকলই তোমার পূজা হউক।"

উল্লিখিত সন্ধ্যা পূজা বিধিমত অভ্যাস করিলে তদ্দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়, ও ক্রমে ঈশ্বরে অনুরাগ সঞ্চার হয়। চিত্তশুদ্ধি, চিত্তের পবিত্রতা লাভ করিবার উপায় হিন্দুর সন্ধ্যাপূজার ন্যায় বোধ হয় আর কিছুই হইতে পারে না। হিন্দু উপাসক পবিত্র স্থানে, পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, পবিত্র আসনে, পবিত্র ভাবে, পবিত্র পুষ্প চন্দনাদি সম্মুখে রাখিয়া পূজা করিতে বসেন। ধূপের পবিত্র গন্ধে তাঁহার চিত্তে পবিত্র সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। ইহার পর

চিত্তশুদ্ধির আবশ্যকতা।

* পুরুষ দেবতা হইলে "জগন্মাতঃ" স্থলে "জগন্নাথ" এই পাঠ প্রযুজ্য।

পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যখন্ পরমদেবতার পরম পবিত্র চরণ-পদ্ম হৃদয়পদ্মে ধারণ করেন, তখন তাঁহার চিত্ত অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য এক মহান্ স্বর্গীয় ভাব ধারণ করে। সংসারের মলিনতা তখন সেই পবিত্র চরণস্পর্শে বিদূরিত হয়। ঈশ্বরের পবিত্রমূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতে বসিলে সাধ্য কি পাপের চিত্র সেখানে প্রবেশ করিতে পারে? বিষ্ণুপুরাণ বলেন,—

"যথাগ্নিরুদ্ধত-শিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্॥
ষষ্ঠ অংশ, ৭ম অধ্যায়, ৭৩।

যেমন বাতাসের সাহায্যে অগ্নি উচ্চশিখা ধারণ করিয়া অনায়াসেই শুষ্ক তৃণ ভস্মীভূত করে, সেইরূপ বিষ্ণুর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধ্যান করিলে তদ্দারা যোগিগণের সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়।

এইরূপে ভগবানকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকে লৌকিক আচার অনুসারে আবাহন, পাদ্য-অর্ঘ্যাদি অর্পণ করিতে হয়। তৎপরে সগন্ধ পবিত্রপুষ্প, পবিত্র জল, পবিত্র বিল্ব বা তুলসী পত্র সমর্পণ করিতে করিতে উপাসকের মন সেই পবিত্র ভাবে অভ্যস্ত হয়। পরে নৈবেদ্য অর্থাৎ উপাসক যাহা কিছু নিজে খাইতে ভালবাসেন, তাহাই পবিত্রভাবে ভগবান্‌কে অর্পণ করিলে সেই ভোগ্যবস্তু পবিত্র হইয়া যায়। তাহা যখন ভক্ত ভগবানের প্রসাদ বলিয়া নিজে গ্রহণ করেন, তখন সেই ভোগ্যবস্তু আস্বাদন দ্বারা তাহার প্রতি আসক্তি নিবৃত্ত হইয়া যায়। ভোগ্যবস্তু ঈশ্বরে সমর্পণ

বাহ্যপূজা।



করিবার উদ্দেশ্য ঈশ্বরের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্তি নহে, উপাসকের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিপূর্ব্বক চিত্তের পবিত্রতা লাভ। এইরূপে পূজা করিয়া উপাসক ভগবানের পবিত্র মন্ত্র জপ করেন। জপ অর্থে পুনঃ পুনঃ ভগবানের নাম বা মন্ত্র উচ্চারণ। মন্ত্র জপের সঙ্গে সঙ্গে রূপও চিন্তা করা আবশ্যক, তাহা হইলে শীঘ্র ফললাভ হয়। যেমন ভগবানের রূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা বা ধ্যান করিলে তৎপ্রতি অনুরাগ জন্মে, সেইরূপ তাঁহার নাম জপ করিলেও নামের প্রতি চিত্ত আসক্ত হয়। শাস্ত্র বলেন, "জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্জপাৎ সিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ"—একমাত্র জপ দ্বারাই সাধক সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। কলিযুগে একমাত্র মন্ত্র জপই সিদ্ধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়, অন্য যাগযজ্ঞের আবশ্যক নাই। বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার নামও নাই রূপও নাই। কিন্তু সাধকের হিতের জন্য তিনি রূপ ও নাম স্বীকার করিয়াছেন। এক জ্ঞানযোগী ভিন্ন কেহ কখনও তাঁহার স্বরূপ জানিতে পারে না। কিন্তু রূপ ও নাম ( colour and sound ) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, তাহা সকলেরই আয়ত্ত; সকলেই ইচ্ছা করিলে রূপ ও নামের অবলম্বনে তাঁহাকে উপাসনা করিতে পারে। তাই পরমকারুণিক ভগবান্ নিজে অরূপ ও অনামা হইয়াও কেবল ভক্তের উপকারের জন্য, সাধকের হিতের জন্য রূপ ও নাম স্বীকার করিয়াছেন। সাকার উপাসক সেই রূপ ও নামের ধ্যান করিয়া তদবলম্বনে তাঁহাতে আসক্ত হইতে পারেন। সাকার উপাসনায় রূপ ও নাম এই উভয়েরই

মন্ত্র জপ।

সাহায্য লওয়া হয়। কিন্তু নিরাকারবাদীর নাম অবলম্বনে উপাসনা করিতে কোন আপত্তি নাই, কেবল রূপের বেলায় আপত্তি। এই নামরূপময় জগতে রূপ ছাড়া নাম নাই ও নাম ছাড়া রূপ নাই। নাম চিন্তা করিতে গেলে তাহার সঙ্গে রূপ অবশ্যই আসিবে। ভগবান্ রূপ ও নামের প্রসাদ হাতে করিয়া আমাদিগকে ডাকিতেছেন "হে মানবগণ! কেবল তোমাদের উদ্ধারের জন্য আমি নিজে রূপ ও নাম গ্রহণ করিয়াছি, এই রূপ ও নামের হরির লুট তোমরা গ্রহণ কর, রূপ ও নাম লইয়া ভক্তিপূর্ব্বক সাধন করিলে অবশ্যাই আমি তোমাদিগকে দেখা দিব।" ভগবানের রূপ ও নাম বড়ই অমূল্য বস্তু। ভাই নিরাকারবাদী! মিথ্যা ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া আর কতকাল সেই অমূল্য রূপরত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিবে?

এই প্রকার উপাসক প্রত্যহ তিনবার সন্ধ্যা ও পূজা করেন। দিনের মধ্যে তিনবার তাঁহার চিত্ত এইরূপ পবিত্র রসে আপ্লুত হয়। দিনে তিনবার এই প্রকার পবিত্রতার তরঙ্গে অবগাহন করাতে মন দিনের অন্যান্য সময়েও পবিত্র-ভাব ছাড়িতে পারে না। দিনের মধ্যে তিনবার ভগবানের রূপ ও নাম ধ্যান করিলে, অন্যান্য সময়েও সেই রূপ ও নাম হৃদয়ে জাগরূক থাকে। বিষয়কার্য্য করিবার সময়েও সেই রূপ ও নামের মহিমা স্মরণ থাকাতে পবিত্রভাবে ভগবানের উদ্দেশ্যে বিষয় কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। এইরূপে সাকার উপাসক সংসারের যাবতীয় কার্য্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে

ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান



করিতে পারেন। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে সকল কর্ম্ম করা যায়, তাহাও তাঁহার পূজার মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অভ্যাস দ্বারা পরিশেষে নিষ্কাম কর্ম্মে অধিকার জন্মে। এখানে ভক্তিযোগ কর্ম্মযোগে পরিণত হয়। *

এই ভক্তিযোগের প্রধান উপকরণ হৃদয়ের বিশুদ্ধ, নির্ম্মল ভক্তি। সন্ধ্যা-পূজাদি সেই ভক্তি জন্মিবার সহায়তা করে। কিন্তু সন্ধ্যা-পূজাদি অনুষ্ঠান করিতে হইলেও আবার চিত্তে স্বভাবজাত একটু ভক্তি থাকা আবশ্যক। সন্ধ্যা-পূজাদি দ্বারা সেই সহজাত ভক্তি ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত হয়। লৌকিক ভাবে দেখিতে গেলে, একজন লোকের উপর আর এক জনের স্বভাবতঃ একটু পক্ষপাতিত্ব থাকে। তৎপরে আলাপ ব্যবহার দ্বারা ঘনিষ্ঠতা যতই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ততই সেই পক্ষপাতিতা অনুরাগে, বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ভক্তিপূর্ব্বক সন্ধ্যা-পূজাদি অনুষ্ঠান দ্বারাও এইরূপে ঈশ্বরের প্রতি পরম অনুরক্তি জন্মে।

পরানুরক্তি লাভ।

ভক্তিযোগের সাধকগণ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই শ্রেণীবিভাগ উপাসকের প্রকৃতি ও কামনা লইয়া। ইহার বিস্তৃত বিবরণ গীতার ষোড়শ ও সপ্তদশ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবেন। ইহার স্থূল মর্ম্ম এই, যে ব্যক্তি যে প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে যেরূপ

তিনশ্রেণীর ভক্ত সাধক—সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক।

* ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি, ভক্তিযোগের পরিণাম জ্ঞানযোগ। সেই জ্ঞানযোগের অবস্থা

শিক্ষা পাইয়াছে, যে যেরূপ সংসর্গে জীবন কাটাইয়াছে, তাহার উপাসনাও সেই প্রকারের হওয়াই স্বাভাবিক। ভক্তি বা ঈশ্বরানুরাগ হৃদয়ের বস্তু। তাহা বাহিরে কার্য্য দ্বারা প্রকাশ হয় মাত্র। যে ব্যক্তি যেরূপ কার্য্য করিতে অভ্যস্ত, সে সেই ভাবেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহার সেই ভাবেই ভক্তি প্রকাশ করা উচিত। পূজনীয় বা মাননীয় ব্যক্তিকে অভিবাদন, এক এক জাতীয় লোক এক এক ভাবে করিতেছেন। হিন্দুগণ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া করেন। মুসলমানগণ ভূমিতে করস্পর্শপূর্ব্বক সেলাম দ্বারা করেন। আবার পাশ্চাত্য জাতি করমর্দ্দন দ্বারা, কিংবা হস্ত দ্বারা মস্তক ঈষৎ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করেন। কিন্তু বাহিরের ক্রিয়া ভিন্ন হইলেও সকলেরই অভিবাদন করিবার সময়ে অন্তঃকরণের ভাব একই রূপ। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করা সম্বন্ধেও এই একই কথা খাটে। সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক একরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একভাবে ভগবানের সেবা করেন, রাজসিক প্রকৃতির লোক অন্যরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যরূপ সেবা করেন, আবার তামসিক প্রকৃতির লোক আর এক প্রকার বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আর এক প্রকারে তাঁহার সেবা করেন। এই সকল স্ব স্ব বিশ্বাসানুরূপ কার্য্য ভিন্ন হইলেও তদ্দ্বারা একমাত্র হৃদয়ের ভক্তিই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তন্মধ্যে আবার কতকগুলি অনুষ্ঠান,

লাভ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মযোগ সাধন করিতে হয়। বস্তুতঃ জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনের পরিণতি হইলে কোন ভেদ থাকে না।



কি সাত্ত্বিক, কি রাজসিক, কি তামসিক সকল প্রকার লোকেরই অনুষ্ঠেয় বলিয়া শাস্ত্রে স্থিরীকৃত হইয়াছে; উপরে যে সাকার উপাসনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা সকল প্রকার উপাসকেরই অনুষ্ঠেয়। এতদ্ভিন্ন অনেক অনেক স্থলে লোকাচার বা দেশাচার অনুসারে ভগবৎ-সেবার ইতর বিশেষ দৃষ্ট হয়। আর আমাদের সমাজে আজকাল যেরূপ উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাহা অনেক স্থলে শাস্ত্রের বিধান অতিক্রম করিয়া অজ্ঞলোকের মূর্খতা ও কুসংস্কার দ্বারা কলুষিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজের প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি সে সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। আধুনিক শাস্ত্র শিক্ষা দ্বারা তাহা ক্রমে দূরীভূত হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

সাধনক্ষেত্রের আবর্জ্জনা দূর করা কর্ত্তব্য।

## নিরাকারবাদীর আপত্তি খণ্ডন।

এখন প্রচলিত সাকার উপাসনা সম্বন্ধে নিরাকারবাদিগণ যে কয়েকটি আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিচার করা যাউক। একজন নিরাকারবাদী বলেন,—

"সাকার পূজা সমর্থন করিতে গিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্রচলিত প্রতিমাপূজা ব্রহ্মপূজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। লোকে প্রতিমাকে পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান মনে করিয়া তাঁহার পূজা করিয়া থাকে। একথা একভাবে সত্য। সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী সকলেরই লক্ষ্য সেই পরাৎপর পরম পুরুষ। কিন্তু যে ভাবে, যেরূপ বিশ্বাসে প্রতিমা পূজা, দেব দেবীর

প্রচলিত সাকারোপাসনা পূর্ণ ব্রহ্মের পূজা নহে।

পূজা এদেশে অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে উহাকে সত্যস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা বলিতে পারি না। প্রচলিত সাকার উপাসনা, দেবদেবী মূর্ত্তি পূজা কখনই পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা বলিয়া উক্ত হইতে পারে না।" *

উক্ত গ্রন্থকার এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার জন্য কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—

(ক) "কাশীর বিশ্বেশ্বর একখানি ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড। উহাতে ঈশ্বরের সত্তা আছে সত্য, কিন্তু উহা সেভাবে পূজনীয় নহে। তাহা যদি হইত, তবে রাস্তার একখণ্ড প্রস্তরও পূজিত হইত। অন্য কোনরূপ বিশ্বাস উহার মূলে আছে।"

(খ) "সাকারবাদিগণ যে দেবমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন, উহা তাঁহাদের বিশ্বাসানুসারে আহার করে, নিদ্রা যায়, শয্যায় শয়ন করে, এমন কি মশক দংশনের কষ্ট নিবারণের জন্য উহার মশারি প্রস্তত করিয়া দিতে হয়। * * ইহাই কি পূর্ণ পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা ?"

(গ) "প্রচলিত সাকারবাদ যে পরিমিত কল্পিত দেবদেবীর পূজা, সত্য স্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা নহে, ইহা সহজেই প্রতীত হয়। বাঙ্গালী জাতির সর্ব্ব প্রধান উৎসব দুর্গোৎসবের বিষয় আলোচনা কর। দুর্গোৎসবের সম্বন্ধে "সর্ব্বসাধারণের" বিশ্বাস এই—মা ভগবতী সম্বৎসরকাল পতিপুত্র লইয়া কৈলাসে বাস করেন ; বৎসরান্তে তিন দিনের জন্য বাঙ্গালী ভক্তের গৃহে আসিয়া থাকেন। সে জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা উপযুক্ত মন্ত্রোচ্চারণাদি পূর্ব্বক তাঁহাকে সপরিবারে আহ্বান করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে আবার তিনি এক বৎসরের জন্য চলিয়া যান। তখন বিসর্জ্জন করিতে হয়। ইহাই কি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগত, সত্যস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মেরউপাসনা ?"

(ঘ) "এ দেশের প্রচলিত পৌত্তলিকতা কেবল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—২৯ পৃষ্ঠা।



পূজা নহে। আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক পদার্থ সকলেরও পূজাও তাহার অন্তর্গত। চন্দ্র, সূর্য্য, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী সকলই এই পূজার অন্তর্গত।"

এদেশে প্রচলিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা যে এক ব্রহ্মেরই ভিন্ন ভিন্ন আকারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পূজা, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এ বিষয়ে "সর্ব্ব সাধারণের" বিশ্বাস যাহাই থাকুক, শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ প্রণালীর আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কোন কোন লোক অশিক্ষিত, মূর্খ, শাস্ত্রের মর্ম্ম কিছুই জানে না। শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া অনেক সময় মনঃকল্পিত ভাব দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। তাহাদের দোষে শাস্ত্রোক্ত সাকার-উপাসনা প্রণালীর দোষ দেওয়া অবৈধ। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, অজ্ঞান ও কুসংস্কারের জন্য যে সকল আবর্জ্জনা সমাজের মধ্যে জন্মিয়াছে, তাহা পরিষ্কার করিবার আবশ্যকতা হিন্দু সমাজের হিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন।

মূর্খ লোকের অজ্ঞান বশতঃ প্রচলিত উপাসনা প্রণালীতে আবর্জ্জনা জমিয়াছে।

এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার উপায় সাধারণের মধ্যে শাস্ত্রশিক্ষার বিস্তার। কিন্তু সাধারণের দেবদেবী পূজা সম্বন্ধে এইরূপ কুসংস্কার আছে বলিয়া, দেবদেবীর পূজা দেশ হইতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে নিরাকারবাদ সংস্থাপন করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। ব্রাহ্ম সমাজে প্রচলিত নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার মূলে সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, এ কথা নিশ্চিত যে, তাহা কখনও সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে না। বালক-

দিগের এমন কি ব্রাহ্ম সাধারণের মধ্যে কি প্রকারে নিরাকারবাদের প্রচার হইতেছে, তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি। যত দিন পর্য্যন্ত লোকের মন সুশিক্ষা দ্বারা দেবদেবী পূজার উচ্চভাব গ্রহণ করিতে না পারিবে, ততদিন তাহারা তাহাদের চিত্তের অনুকূল, সহজ বোধগম্য ভাব সকল কল্পনা করিয়া লইবে।

সুশিক্ষা দ্বারা তাহা দূর করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু একেবারে ভাব শূন্য হইয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের সে সকল মনঃকল্পিত ভাবে উপাসনা দ্বারাও সুফল ফলিতে পারে। এ বিষয়ে সমাজ-তত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সার বলেন,—

হার্ব্বার্ট্‌ স্পেন্‌সারের মত।

"During each stage of Evolution men must think in such terms of thought as they possess. While all conspicuous changes of which they can observe the origins, have men and animals as antecedents, they are unable to think of antecedents in general uuder any other shape, and hence creative agencies are of necessity conceived by them in these shapes. If during this phase these concrete conceptions were taken from them, and the attempt made to give them comparatively abstract conceptions, the result would be to leave their minds with none at all; since the substituted ones could not be mentally represented. Similarly with every successive stage of religious belief down to the east * * * And at the present time, the refusal to abandon a relatively concrete notion for a relatively abstract one,



implies the inability to frame the relatively abstract one; and so proves that the change would be premature and injurious. Still more clearly shall we see the injuriousness of any such premature change on observing that the effects of a belief upon conduct must be diminished in proportion as the vividness with which it is realized becomes less * * * During every phase of civilization, the actions of the unseen Reality as well as the resulting rewards and punishments, being conceivable only in such forms as experience furnishes, to supply them by higher ones before wider experiences have made higher ones conceivable, is to set up vague and unifluential motives for definite and influential ones. Even now, for the great mass of men, unable through lack of culture to trace out with due clearness those good and bad consequences which conduct brings round through the established order of the unknowable, it is needful that there should be vividly depicted pictures of future torments and future joys—pains and pleasures of a definite kind produced in a manner direct and simple enough to be clearly imagined. Nay, still more must be conceded. Few, if any, are yet fitted wholly to dispense with such conceptions as are current. The highest abstractions take so great a mental power to realize with any vividness, and are so inoperative upon conduct, unless they are vividly realized that their regulative effects must for a long period to come be appreciated on but a small minority."

*First Principles vol.* I. pp. 116—117.

ইহার স্থূল মর্ম্ম এই। মানব সমাজের ক্রমোন্নতির প্রত্যেক বিকাশাবস্থায় মানবগণ তাহাদের নিজ নিজ অভ্যস্ত ভাবে সকল বিষয় চিন্তা করে। সেই জন্য তাহারা সৃষ্টিকর্ত্তাকে সাধারণ মানুষের ভাবে বিশেষ বিশেষ (concrete) গুণ দ্বারা ভাবিয়া থাকে। যদি এই সকল বিশেষ বিশেষ মানবীয় ভাবে ঈশ্বর চিন্তা তাহাদিগের মন হইতে বিদূরিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম ( abstract ) ভাব স্থাপন করিতে চেষ্টা করা যায়, তবে তাহার ফল এই হয় যে, তাহারা সে সকল সূক্ষ্মভাবের ধারণা করিতে পারে না, সুতরাং তাহাদের মনে কোন ভাবই জন্মিতে পারে না। এইরূপ ভাব ক্রমোন্নতির প্রত্যেক অবস্থাতেই ঘটে। আধুনিক সময়ে এই সকল বিশেষ ভাবের পরিবর্ত্তে সূক্ষ্ম সাধারণ ভাব সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচলিত করিবার চেষ্টা বিফল দেখা যায়। তাহাতে বুঝা যায় এই—এইরূপ পরিবর্ত্তন অসাময়িক ও ক্ষতিকর। যখন এই সকল ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর লোকের চরিত্র নির্ভর করে, তখন যে পরিমাণে সেই ধর্ম্মবিশ্বাসের জ্বলন্ত ভাবের হ্রাস হইবে, সেই পরিমাণে লোকের চরিত্রও মন্দ হইবে। সভ্যতার প্রত্যেক অবস্থাতে পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের শাস্তি লোকে তাহাদের নিজ নিজ জ্ঞানের সীমা অনুসারে ধারণা করিতে পারে। বর্ত্তমান সমাজে এই সম্বন্ধে যে সকল জ্বলন্ত ভাব ও চিত্র সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা তাহাদের চরিত্রের উপর বিশেষরূপে প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। এ সকলের পরিবর্ত্তে অস্পষ্ট ও অস্ফুট ভাব সকল প্রচলিত



করিতে চেষ্টা করিলে তাহা সাধারণের বোধগম্য হইবে না, ও তদ্দারা তাহাদের চরিত্রের উপর কার্য্যকরী শক্তির হ্রাস হইবে। প্রচলিত ভাব সকল ছাড়িয়া দিয়া উচ্চতর ভাব গ্রহণ করিতে পারে, এরূপ লোক থাকিলেও নিতান্ত বিরল। উচ্চতম সূক্ষ্মভাব সকল পরিষ্কাররূপে ধারণা করিতে হইলে অতি উচ্চ মানসিক শক্তির প্রয়োজন ; সে সকল স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে না পারিলে আবার চরিত্রের উপর তাহাদের কার্য্যকারিতা থাকে না। সুতরাং অতি অল্প লোকেই সে সকল ধারণা করিয়া চরিত্রোন্নতি লাভ করিতে পারে।

অতএব প্রচলিত সাকার উপাসনার মধ্যে সাধারণ লোকের অজ্ঞতা ও কুসংস্কারমূলক ভাব সকল প্রবেশ করিয়া থাকিলেও তাহা দূর হওয়া তাহাদের জ্ঞানোন্নতি সাপেক্ষ। কিন্তু উক্ত গ্রন্থকার যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার মধ্যে সকলই যে কুসংস্কার ও অজ্ঞতামূলক বিশ্বাস তাহা বলা যাইতে পারে না। তাহা নিম্নে দেখা যাইতেছে।

(ক) কাশীর বিশ্বেশ্বর মূর্ত্তি প্রস্তর খণ্ড। আবার রাস্তার প্রস্তর খণ্ডও প্রস্তর খণ্ড। বিশ্বেশ্বর-প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় রাস্তার প্রস্তরখণ্ডেও শিবের পূজা হইতে পারে। রাস্তার প্রস্তর খণ্ডে প্রাণপ্রতিষ্ঠাদ্বারা শিবের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিলে তাহাতেও শিবের পূজা হইতে পারে। এরূপ পূজা সর্ব্বত্র হইতেছে। উড়িষ্যার অনেক গ্রামে বট

কাশীর বিশ্বেশ্বরের পূজা প্রস্তর খণ্ডের পূজা নহে, প্রস্তরে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের পূজা।

গাছের তলে অনেক সিন্দূর-লিপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেখা যায়। তাহারাও এক সময়ে রাস্তায়, ঘাটে, মাঠে পড়িয়াছিল। কিন্তু যখন সেই সকল প্রস্তরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা দ্বারা ভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা হইল, সেই সময় হইতে সে সকলের অবলম্বনে ভগবানের পূজা হইতে লাগিল। ভগবানের সত্তা সর্ব্বত্র সমভাবে উপলব্ধি করা বড়ই কঠোর-সাধনা-সাপেক্ষ।

"সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরং।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥" গীতা ১৩।২৮

"যিনি সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিতরূপে যথোক্তলক্ষণসম্পন্ন আত্মাকে দেখিতে পান, তিনিই জরা, মৃত্যু, সুখ, শোক ও কর্ত্তৃত্ব, হর্ত্তৃত্বাদি প্রকৃতির ধর্ম্মগুলি আত্মাতে আরোপিত করিয়া 'আমি আহত হইলাম, আমি হত হইলাম, ইত্যাদি রূপ মিথ্যা বিশ্বাস করিয়া আত্মঘাতক হন না। সুতরাং আত্মার নিত্যত্বদর্শী মহাত্মা পরমাগতি (মুক্তি) লাভ করিয়া থাকেন।"

সর্ব্বত্র সমভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিতে পারিলে মুক্তি লাভ হয়। সর্ব্বত্র ঈশ্বরকে দর্শনের অর্থ কেবল মনের বিশ্বাস নহে, প্রত্যক্ষ অনুভূতি (Realization). সেই সর্ব্বত্র সমদর্শন কেবল মুখের উপদেশে, কিংবা বক্তৃতার বাগাড়ম্বর দ্বারা শিক্ষা হয় না। তাহা বহুজীবনব্যাপী অনুশীলনের ফলে ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বত্রসমভাবে ঈশ্বরকে দর্শন করিবার পূর্ব্বে বিশেষ বিশেষ স্থলে তাঁহাকে দর্শন করিবার অভ্যাস করিতে হয়। বিশেষ বিশেষ স্থানে তাঁহাকে দর্শন করা অভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে সর্ব্বত্র সমদর্শন হইতে পারে। তাই বিশেষ বিশেষ স্থলে কৃত্রিম কিংবা



স্বাভাবিক পদার্থের মধ্যে তাঁহাকে দর্শন ও পূজা করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। সর্ব্বত্রসমদর্শী মহাপুরুষ কাশীর শিবলিঙ্গের মধ্যেও যে প্রকারে ঈশ্বরের সত্তা দর্শন করেন, অন্যান্য প্রস্তরখণ্ডেও সেইরূপ দর্শন করেন। কিন্তু তুমি আমি সেইরূপ পারি না বলিয়া আমাদের সর্ব্বত্র সমদর্শন শিক্ষার জন্য, বিশ্বেশ্বরমূর্ত্তিতে ও অন্যান্য মূর্ত্তিতে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। আরও একটি কথা, বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর মূর্ত্তি কিংবা জগন্নাথের কাষ্ঠময়মূর্ত্তি এ সকলের কি প্রকৃত কোনই মাহাত্ম্য, কোনই বিশেষত্ব নাই? যদি না থাকিবে, তবে এক বৎসর নয়, দশ বৎসর নয়, সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত—একজন নয়, শত জন নয়, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ—কোন্ আকর্ষণ রজ্জু দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া সহস্র সহস্র ক্রোশ দূর হইতে, সহস্র সহস্র বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, এমন কি জীবনকে তুচ্ছ করিয়া সেই কাষ্ঠ ও পাষাণের নিকট ছুটিয়া আসিয়া মস্তক অবনত করিতেছে? যদি বল কুসংস্কার, তবে বল দেখি ভাই, যাহা মিথ্যা, যাহা অসত্য, তাহা কতদিন টিকিতে পারে? তুমি আমি কুসংস্কারের দাস হইতে পারি, কিন্তু জ্ঞানীর শিরোমণি যাঁহারা, যাঁহাদের জ্ঞানালোকে আজ পাশ্চাত্য জগৎ আলোকিত হইতেছে, সেই সকল ঋষিগণ কেন তাহাতে ভুলিয়াছিলেন? বেশী দিনের কথা নয়, জ্ঞানি-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা ত্রৈলিঙ্গস্বামী কেন অন্য স্থান ভুলিয়া সেই কাশীর প্রস্তরখণ্ডের আশ্রয় লইয়াছিলেন? তুমি আমি জগন্নাথের মূর্ত্তিকে (hideous idol) বীভৎসমূর্ত্তি বলিয়া উপহাস করিতে পারি, কিন্তু এই দেখ

ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের সেই মূর্ত্তি দেখিয়া কি ভাব হইয়াছিল,—

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ;
অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব উদয় সমকাল।
মাংস ব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত ;
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত।
একেক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ;
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়।
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে তাতে রক্তোদ্গম,
জজ, গগ, জজ, গগ, গদগদ বচন॥"—চৈতন্য চরিতামৃত।

এই ভাবের রসে সাঁতার দিতে দিতে গৌরাঙ্গ শ্রীক্ষেত্রে জগদ্বন্ধুকে দেখিয়া গাইয়াছিলেন,—

"সেই পরাণনাথে পাইনু।
যাঁর লাগি মদনে ঝরিনু॥"*

আমাদের সামান্যবুদ্ধিতে এই সকল মহাভাব বোধগম্য হইতে পারে না। আমরা এই সকল দেবমূর্ত্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি না।

(খ) ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে নিরাকারবাদী ঈশ্বরকে যে প্রেমময়, মঙ্গলময়, জ্ঞানময় বলিয়া তৎপ্রতি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, আর সাকার উপাসক ঈশ্বরে আহার, নিদ্রা, শয়নাদি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, এই উভয়ে কেবল

* ভক্তিযোগ—২৭৮ পৃষ্ঠা।



মাত্রার প্রভেদ, রকমের প্রভেদ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহাও দেখিয়াছি, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা যতই গাঢ় হয়, ততই তাঁহার ঐশ্বরিক ভাব ভুলিয়া গিয়া সাধক তাঁহাকে আপনার আপনি করিয়া ফেলেন। ইহার দৃষ্টান্তও পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। সাকার উপাসককে ঈশ্বরের আহার নিদ্রার ব্যবস্থা করিতে দেখিয়া, উক্ত গ্রন্থকার বলিয়াছেন, "ইহাই কি পূর্ণ, পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা ?" মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য যখন কৃষ্ণ-বিরহে অধীর হইয়া মহাভাব প্রাপ্ত হইতেন, তখনও তিনি তাঁহাকে বলিতে পারিতেন—"ঈশ্বর ত সর্ব্বত্রই আছেন, এই কি আপনার পূর্ণ, পরাৎপর পরব্রহ্মের উপাসনা ?"* বলা বাহুল্য, ভক্ত যখন ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হন, ঈশ্বরকে আপনার আপনি করিয়া ফেলেন, তখন বাস্তবিকই তিনি ভগবান্‌কে মশকে দংশন করিবে এরূপ আশঙ্কা করেন, ভগবানের ক্ষুধায় কষ্ট হইবে বলিয়া আকুল হন, ভগবান্‌কে নানাভাবে সজ্জিত করিয়া মন প্রাণ চরিতার্থ করেন। আমার একজন সাধুর সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি শীতকালের রাত্রি লম্বা বলিয়া প্রত্যহ সকালে শীঘ্র শীঘ্র রন্ধন করিয়া তাঁহার গোপালকে ভোগ দিতেন। এই সকল ভাব উপলব্ধি করা তোমার আমার অসাধ্য। তবে একথা

সাকারোপাসক ঈশ্বরে আহার নিদ্রাদি মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, নিরাকারবাদী ও সেইরূপ মানবীয় ভাবের আরোপ করেন, উভয়েই তুল্য।

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,—"কোন স্বভাবভক্ত যখন মূর্ত্তি পূজার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন, তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত্তিকে অমূর্ত্ত করিয়া

বলিতে পারি না, যেখানে যেখানে দেবমূর্ত্তির এইরূপ সেবা করা হয়, সেখানেই সেই মহাভাব আছে। ভক্ত সাধকগণ যেভাবে উপাসনা করেন, অপর সাধারণও সেই প্রণালীর অনুবর্ত্তী হয়। ইহা ছাড়া আরও একটি কথা আছে। ভগবানে সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু নিবেদন দ্বারা বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তি হয়। এবিষয় পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে। সুতরাং যাঁহারা ভক্তিযোগ অভ্যাস করিতেছেন, তাঁহারাও ভগবান্‌কে ভোগ্যবস্তু সকল নিবেদন করেন।

(গ) অজ্ঞানী "সর্ব্বসাধারণের" দুর্গোৎসব সম্বন্ধে যে প্রকার বিশ্বাসই থাকুক, যাঁহাদের শাস্ত্রের সহিত একটুমাত্র পরিচয় হইয়াছে, যাঁহারা "চণ্ডীপাঠ" একবার মাত্র শুনিয়াছেন, তাঁহারাই দুর্গাপূজা যে সগুণ পরব্রহ্মের পূজা, তাহা নিশ্চিত-রূপে জানেন। মহামূল্য চণ্ডীগ্রন্থে দুর্গা-পূজার পৌরাণিক ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। যাহাতে লোকে

দুর্গা পূজা পরব্রহ্মেরই উপাসনা, তাহা পূজার মন্ত্রে ও চণ্ডীতে প্রকাশ।

---

দেখিতে পারেন, তাঁহার প্রত্যক্ষবর্ত্তী কোন সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না।......সে প্রতিভা চৈতন্যে ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল।"—সাকার ও নিরাকার। সমালোচক মহাশয় এখানে একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, উপাসক মাত্রেই মূর্ত্তি অবলম্বনে অমূর্ত্তের, সসীম অবলম্বনে অসীমের ভাবে বিভোর হইয়া উপাসনা করেন, ইহাতে বিশেষ কোন প্রতিভার আবশ্যক নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রীশ্রীচৈতন্য দেব ও স্বর্গীয় রামপ্রসাদ সেন প্রচলিত সাকার উপাসনা অবলম্বন করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছিলেন,—not in spite of সাকার উপাসনা but through সাকার উপাসনা। ইঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ করিলেই ভ্রম দূর হইতে পারে।



দুর্গাপূজার প্রকৃত উদ্দেশ্য বিস্মৃত না হয়, সেই জন্য দুর্গোৎসবের সময় চণ্ডীপাঠের ব্যবস্থা রহিয়াছে। দুর্গোৎসবে যে মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে, তাহা চণ্ডীতেই বর্ণিত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তি যে পরব্রহ্মেরই মূর্ত্তি, তাহা সেই চণ্ডীতেই উক্ত হইয়াছে।

"নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তি র্বহুধা শ্রুয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি স যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে॥"—চণ্ডী।

অর্থাৎ সেই জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্যা এবং উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্যা। তিনি সমুদায় বিশ্বই ব্যাপিয়া আছেন। তথাপি তাঁহার বহুপ্রকার উৎপত্তি আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই মহামায়া নিত্যা বলিয়া অভিহিতা হইলেও, দেবতাদিগের কার্য্যসিদ্ধির জন্য যখন আবির্ভূতা হন, তখন লোক মধ্যে (লৌকিক ভাষায়) তিনি উৎপন্না বলিয়া কথিতা হন। বাস্তবিক তাঁহার উৎপত্তি বিলয় নাই।

এইরূপে পরব্রহ্মস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি যে মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া মহিষাসুর নাশ করিয়াছিলেন, দুর্গোৎসবে তাঁহার সেই মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। দেবগণ তাঁহার সেই মূর্ত্তির স্তব করিয়াছেন,

"হেতুঃ সমস্তজগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈ
র্ন জ্ঞায়সে হরিহরাদিভি রপ্যপরা।
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত
মব্যাকৃতা হি পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা॥"

তুমিই বিকার-রহিতা, আদ্যা, পরমা প্রকৃতিরূপে প্রকাশিতা। তুমি সমস্ত জগতের হেতুভূতা। তুমি ত্রিগুণাত্মিকা হইলেও রাগদ্বেষাদিযুক্ত বিষ্ণু, মহেশ্বরাদি তোমার প্রকৃততত্ত্ব অবগত নহেন। তুমি সকলপদার্থের আশ্রয়ভূতা, অর্থাৎ সর্প যেমন রজ্জুর আশ্রয়ে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তোমার আশ্রয়েই এই মিথ্যা জগৎ সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। কিন্তু তুমি জগৎ-রূপে পরিণত হও নাই। জগৎ কেবল তোমার এক অংশকে আশ্রয় করিয়া সত্যের ন্যায় প্রতীত হইতেছে।

দেবগণ সেই আদ্যাশক্তিকেই অন্যত্র স্তব করিতেছেন,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

যে দেবতা সকলভূতের মধ্যে চেতনা বলিয়া কথিত হন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।

ইহাতেও যদি হিন্দুর দুর্গাপূজা ব্রহ্মোপাসনা নহে বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে পাঠক একবার সেই পূজার মন্ত্র আলোচনা করিয়া দেখুন।

যাঁহাদের সে বিষয়ে সুবিধা নাই, তাঁহাদের অবগতির জন্য নিম্নে কয়েকটি মহাস্নানের মন্ত্র উদ্ধৃত করা যাইতেছে। পুরোহিত এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দুর্গাদেবীর অভিষেক করেন,—

"দেবাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
ব্যোমগঙ্গাম্বুপূর্ণেন আদ্যেন কলসেন তু॥



মরুতশ্চাভিষিঞ্চন্তু ভক্তিমন্তঃ সুরেশ্বরীং।
মেঘতোয়াদিপূর্ণেন দ্বিতীয় কলসেন তু॥
সারস্বতাদিতোয়েন সংপূর্ণেন সুরোত্তমাং।
বিদ্যাধরাশ্চাভিষিঞ্চন্তু তৃতীয় কলসেন তু॥
যক্ষাস্ত্বামভিষিঞ্চন্তু লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
সাগরোদকপূর্ণেন চতুর্থ-কলসেন তু॥
বারিণা পরিপূর্ণেন পদ্মরেণু-সুগন্ধিনা।
পঞ্চমেনাভিষিঞ্চন্তু নাগাশ্চ কলসেন তু॥
হিমবদ্ধেমকূটাদ্যা অভিষিঞ্চন্তু পর্ব্বতাঃ।
নির্ঝরোদক-পূর্ণেন ষষ্ঠেন কলসেন তু॥
সর্ব্বতীর্থাম্বুপূর্ণেন সপ্তমেন সুরেশ্বরীং।
শক্রাদয়োঽভিষিঞ্চন্তু ঋষয়ঃ সপ্ত এব চ॥
বসবশ্চাভিষিঞ্চন্তু কলসেনাষ্টমেন তু।
অষ্টমঙ্গল-সংযুক্তে দুর্গে দেবি নমোঽস্তুতে॥"

(হে জগন্মাতঃ! আমি আর তোমাকে কি দিয়া অভিষেক করিব?) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতাগণ মন্দাকিনী জলদ্বারা প্রথম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে সুরেশ্বরি! মরুৎগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া মেঘাম্বুপূর্ণ দ্বিতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন। হে সুরোত্তমে! বিদ্যাধরগণ সরস্বতী আদি নদীর পবিত্র জলপূর্ণ তৃতীয় কলস দ্বারা তোমার অভিষেক করুন। যক্ষ ও লোকপালগণ সাগরোদক দ্বারা চতুর্থ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। নাগগণ পদ্মরেণুসুগন্ধি জল দ্বারা পঞ্চম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হিমালয়,

হেমকূট, প্রভৃতি পর্ব্বত সকল নির্ঝরোদক দ্বারা ষষ্ঠ কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। ইন্দ্রাদি দেবতাসকল ও সপ্তঋষি সর্ব্বতীর্থের জলদ্বারা সপ্তম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। বসুগণ অষ্টম কলস পূর্ণ করিয়া তোমার অভিষেক করুন। হে অষ্টমঙ্গলদায়িনি দুর্গে! তোমাকে নমস্কার।

এ মন্ত্র যিনি মনোযোগপূর্ব্বক একবার শুনিয়াছেন, তাঁহার মনে কি কখনও এরূপ সন্দেহ হইতে পারে যে, দুর্গাপূজা পরব্রহ্মের পূজা নহে? এই মন্ত্র দ্বারা যে মহাভাব সূচিত হইয়াছে, নিরাকারবাদীর রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীত দ্বারা তাহার ক্ষীণ আভাষ পাওয়া যায়;—

"তোমার আরতি করে নিখিল ভুবন;
নিরখি জুড়াই নাথ, যুগল নয়ন।
গগন-থালে কেমন দীপ জ্বলে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন হৃদয়রঞ্জন॥
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন।
ধূম মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ।
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ।
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন॥"

(ঘ) সাকার উপাসকগণ আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর স্বাভাবিক পদার্থ সকলের পূজা করেন বলিয়া উক্ত গ্রন্থকার তাঁহাদের



দোষ দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাকে খুসি করা বড়ই মুস্কিলের কথা। হিন্দুগণ যখন কৃত্রিম পদার্থের (প্রতিমার) অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা করেন, তখন তিনি বলেন,—স্বাভাবিক পদার্থের অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, প্রতিমা কল্পিত, মিথ্যা।

"সৃষ্ট পদার্থের অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এবং প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা এ উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কল্পনা ও সত্যে যত প্রভেদ, এ উভয়ের মধ্যে তত প্রভেদ। * * * * কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া জগৎ-কার্য্য অবলম্বনে জগদীশ্বরের পূজা যেমন স্বাভাবিক, একটা পুত্তলিকা অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর পূজা কখনই সেরূপ নহে।" *

এস্থলে তিনি বলিতেছেন, স্বাভাবিক পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা শ্রেষ্ঠ ও বিধেয়। কিন্তু আবার হিন্দুগণকে স্বাভাবিক পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরপূজা করিতে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন— "ছিছি! উহা পৌত্তলিকতা!"

স্বাভাবিক পদার্থ অবলম্বনে ভগবানের পূজা হয়, কোন জড় বস্তুর পূজা হয় না।

"আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ানক, স্বাভাবিক পদার্থ সকলের পূজাও তাহার (পৌত্তলিকতার) অন্তর্গত।" তিনি কি বলিতে চান, সাকার-উপাসকগণ সেই সকল পদার্থের পূজা করেন? সেই সকল পদার্থের অবলম্বনে ঈশ্বরকে পূজা না করিয়া সেই সকল পদার্থকেই ঈশ্বরবোধে পূজা করেন? তিনি এই ভ্রান্তবিশ্বাস কোথায় পাইলেন? তিনি বলেন,—

"তেজঃপুঞ্জ দিবাকর, সাকারবাদীর পূজনীয়। "জবাকুসুমসঙ্কাশং

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—২১, ২২ পৃষ্ঠা।

কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মিদিবাকরম্।" জবা কুসুমের ন্যায় বর্ণ, কশ্যপের পুত্র, মহাজ্যোতিবিশিষ্ট, অন্ধকার-বিনাশক, সকল পাপবিনাশকারী দিবাকরকে প্রণাম করি। সূর্য্যের প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সাকারবাদী কেমন ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করেন।"

সূর্য্যের এই প্রণামমন্ত্রের মধ্যে তিনি কোথায় পাইলেন যে, সাকারবাদী এই মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া জড় সূর্য্যমণ্ডলকে প্রণাম করেন? যে ঋষিগণ এই মন্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা কি এতই মূর্খ যে, তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন জড় সূর্য্যপিণ্ড পাপ নাশ করিতে পারে ও কশ্যপমুনির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল? বলা বাহুল্য, এই মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যের অধিষ্ঠিত দেবতাকেই প্রণাম করা হয়। যে মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের অর্ঘ্য দেওয়া হয়, সেখানে ইহা আরও স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

"নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥"

হে বিবস্বন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুর তেজস্বরূপ, জ্যোতির্ম্ময়, সুতরাং ব্রহ্মস্বরূপ। তুমি জগৎ সৃজন করিয়াছ, তুমি শুদ্ধ, তুমি সবিতা, তুমি কর্ম্মদান কর।

পাঠক এস্থলে স্পষ্টই দেখিতেছেন, সূর্য্যদেবকে ব্রহ্মজ্ঞানে ও জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাজ্ঞানে পূজা করা হইতেছে। এতদ্দ্বারা অভ্রান্তরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিন্দুউপাসক কখনও সূর্য্যকে জড়পিণ্ডজ্ঞানে পূজা করেন না। সূর্য্যের অধিষ্ঠিত দেবতাকে ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করেন। হিন্দুর সূর্য্যোপাসনা ব্রহ্মোপাসনা।



সূর্য্য সম্বন্ধে যে কথা খাটে, অন্যান্য স্বাভাবিক পদার্থ সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। উক্ত গ্রন্থকার বলেন,—

"কৃষ্ণনগরের নিকট দোগেছে গ্রামে একটা অদ্ভুত, বিশেষপ্রকার আকৃতিবিশিষ্ট শাল্মলীবৃক্ষ আছে। চতুঃপার্শ্বস্থ অবোধ গ্রামবাসিগণ উহাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন।"

অবোধ গ্রামবাসিগণ শাল্মলীবৃক্ষকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকেন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল। তিনি যদি একটু অনুসন্ধান করিতেন, তবে জানিতে পারিতেন, সেরূপ অবোধ লোক হিন্দুসমাজে কেহই নাই। অবশ্যই উক্ত শাল্মলী বৃক্ষ অবলম্বনে কোন দেবতার পূজা করা হয়। অন্ততঃ, যতস্থানে আশ্চর্য্য, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, স্বাভাবিক পদার্থে পূজা করিবার কথা আমরা জানি, সর্ব্বত্রই সেই সেই পদার্থ অবলম্বনে কোন দেবতার পূজা করা হয়। ফরিদপুর জেলার উত্তরাংশে মদাপুর গ্রামে একটা প্রাচীন বটবৃক্ষে "রাজরাজেশ্বরের" পূজা হইয়া থাকে। উক্ত জেলায় কুশলনাথ নামক স্থানে একটি পুরাতন বৃক্ষে "কুশলনাথ" শিবের পূজা হইয়া থাকে। উড়িষ্যার অন্তর্গত খোড়দা মহকুমার হটকেশ্বর নামক স্থানে একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে; সেই স্বভাবের অদ্ভুত পদার্থ অবলম্বনে "হটকেশ্বর মহাদেবের" পূজা হইয়া থাকে। উক্ত মহকুমার নিকট প্রসিদ্ধ বারুণীপর্ব্বতে একটি সুন্দর জলস্রোত ( নির্ঝর ) আছে। সেখানে "বারুণী" দেবতার পূজা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই সকল স্থলে বৃক্ষ, উষ্ণপ্রস্রবণ ও নির্ঝরের উপাসনা হয় না। সেই সেই জড়পদার্থ অবলম্বনে এক দেবতার পূজা হয়।

উক্ত গ্রন্থকার বলেন,—

"প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাসকে বিজ্ঞান বিনাশ করিতেছে। বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে গিয়া ছাত্র উপযুক্ত পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন একত্র করিলেন, অমনি জল উৎপন্ন হইল। এই প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় ছাত্র বুঝিতে পারিলেন যে জল মূলভূত নহে। কেবল তাহাই নহে; সেই সঙ্গে সঙ্গে জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণদেবতাও চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। যে ব্যক্তি নিজে জল সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার কি আর জলের কর্ত্তা বরুণ দেবতায় বিশ্বাস থাকা সম্ভব? বিশেষ পরিমাণে নাইট্রোজেন ও বিশেষ পরিমাণে অক্সিজেন্ একত্র করিলে বায়ুর উৎপত্তি হইল। অমনি পবনদেব চিরকালের জন্য চলিয়া গেলেন। সূর্য্য যে জড়পিণ্ডমাত্র, বিশেষ কোন দেবতা নহে, বিজ্ঞান উহা প্রকাশ করিতেছে। সূর্য্য কি কি পদার্থে নির্ম্মিত (Composition of the sun) পণ্ডিতেরা তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে নির্দ্ধারণ করিতেছেন।"

এস্থলে তিনি আর একটি গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। জলাধিষ্ঠাত্রী বরুণদেবতা আর জল যে এক, বায়ুর অধিষ্ঠাতা পবনদেব আর বায়ু যে এক, কিংবা সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা সূর্য্যদেব আর সূর্য্যমণ্ডল যে একই পদার্থ বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, তিনি তাহা কোথায় পাইলেন? জলের অধিষ্ঠাতা বরুণদেব আর জল যদি একই পদার্থ হইত; তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলের বিশ্লেষণ করিলে বরুণদেবেরও অস্তিত্ব নাশ হইত, এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে জলের সৃষ্টি করিলে, বরুণ দেবকেও সৃষ্টি করা হইত। কিন্তু বরুণদেব আর জলকে কেহ এক বস্তু বলিয়া কখনও বিশ্বাস করে না। যদি বল বৈজ্ঞানিক



প্রণালীতে যদি জল বিনাশ করা যায়, তবে বরুণদেব থাকিবেন কোথায়? তাহার উত্তর এই, পৃথিবীর সমস্ত জলরাশি উড়াইয়া দিতে পারে বিজ্ঞানের কি এতদূর ক্ষমতা আছে? বিজ্ঞান বলে সমুদ্রশোষণ হইতে পারে, ইহা অতি হাস্যকর কথা। দ্বিতীয়তঃ জড়-বিজ্ঞানই জ্ঞানের শেষ-সীমা নহে। জড়বিজ্ঞানের উপর আরও বিজ্ঞান আছে। তর্কের খাতিরে যেন মানিলাম, কোন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত কোন যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র, নদ, নদী, সকল শোষণ করিয়া ফেলিলেন ও বরুণদেবকে রাজ্যছাড়া করিলেন। কিন্তু এই স্থূল জলের উপর আবার সূক্ষ্ম জল আছে, স্থূল পঞ্চ মহাভূতের উপর আবার সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূত (পঞ্চতন্মাত্র) আছে। সাধ্য কি জড়বিজ্ঞান তাহার কাছেও ঘেঁসিতে পারে? ফলকথা এই, দুই পাতা বিজ্ঞান পড়িলে, সেই বিজ্ঞানজনিত গর্ব্বে স্ফীত হওয়া আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু যিনি বিজ্ঞান পাঠ শেষ করিয়াছেন, তিনি দেখেন সে বিজ্ঞানের উপর আরও বিজ্ঞান রহিয়াছে—তিনি বিজ্ঞান-সমুদ্রের তীরবর্ত্তী উপলখণ্ড সংগ্রহ করিয়াছেন মাত্র। অল্পজ্ঞানীর নিকট সকলই জড়পদার্থ, জগতের যাহা কিছু সকলই তাঁহার Observation ও Experiment এর (বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার) অন্তর্গত। মধ্যমজ্ঞানী দেখেন, এ জগতে কতক জড় ও কতক চৈতন্য—জড়ের সীমা যেখানে শেষ হইয়াছে, চৈতন্যের সীমা সেখানে আরম্ভ হইয়াছে—কেবল জড়ের উপরই Observation ও Experiment খাটে, চৈতন্যপদার্থ বুদ্ধির অগম্য। কিন্তু যিনি জ্ঞানের উচ্চতম

শিখরে আরোহণ করিয়াছেন তিনি দেখিতে পান,—জড় আদৌ নাই, কেবল এক অখণ্ড, অনন্ত, চৈতন্য পদার্থই বিদ্যমান রহিয়াছে; আমরা যাহাকে জড় বলি, তাহা কেবল আমাদের চক্ষুর দোষ, বুদ্ধির ভ্রম—তাঁহার নিকট এ বিশ্বজগৎ সকলই "একামেবাদ্বিতীয়ম্!"—এক অদ্বিতীয় চৈতন্য পদার্থ। তিনি দেখিতে পান,—

"অগ্নি র্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥"

অর্থাৎ—"যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আখ্যা লাভ করেন, সেইরূপ সর্ব্বভূতান্তর্গত একই আত্মা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু বিকারশূন্য তিনি সর্ব্বভূতের বাহিরে ও আশ্রয় ভাবে বিদ্যমান আছেন।"

তিনি দেখিতে পান—চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, জল, বায়ু, অগ্নি এ সকল স্থূলভূতের কোনই সত্তা নাই—ইহারা সকলেই এক অখণ্ড চৈতন্যপদার্থের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। কিন্তু এরূপ দেখা জ্ঞানের পরিপক্কাবস্থায় সম্ভব, তোমার আমার পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা সেই অখণ্ড, অনন্ত চৈতন্যপদার্থ দেখিতে পাই না বলিয়া, তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড ভাবে, অসীমকে সসীম ভাবে, চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলভূতের মধ্যে দেখিতে অভ্যাস



করি। তাই সেই অনন্ত, অখণ্ড চৈতন্যপদার্থ আমাদের দৃষ্টিতে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল প্রভৃতির আধিষ্ঠাতৃ-রূপে, চন্দ্রদেব, সূর্য্যদেব, পবনদেব, বরুণদেব নামে পূজিত হন।

## "বদ্ধ ও উদার।"

উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

"পৌত্তলিকের দেবতা কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে বদ্ধ। ব্রাহ্মের দেবতা পৃথিবীর সকল গ্রামে, সকল নগরে, কাশী, বৃন্দাবনের ন্যায় সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন। পৌত্তলিকের দেবতা বিশেষ বিশেষ মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে অধিষ্ঠিত, ব্রাহ্মের দেবতা সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মমন্দিরে অধিষ্ঠান করিতেছেন।"*

একথাগুলি শুনিতে বেশ। কিন্তু ইহার কোন অর্থ আছে কি? "পৌত্তলিকের দেবতা কাশীবৃন্দাবন তীর্থে বদ্ধ"—ইহার অর্থ কি? তিনি বলিতে চান, হিন্দুগণ কাশীবৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ ভিন্ন অন্য কোন স্থানে ঈশ্বরের পূজা করেন না বা করিতে পারেন না? প্রত্যহ হিন্দুগণ তিন বার ঈশ্বরোপাসনা করেন; তিনি কি বলিতে চান, ইহার প্রত্যেক বারে তাঁহারা রেলের গাড়ীতে চড়িয়া কাশী বৃন্দাবনে গিয়া উপাসনা করিয়া আসেন? তাহা যদি না হইল, হিন্দুগণ নিজ নিজ ঘরে বসিয়া উপাসনা করেন ইহা যদি ঠিক হয়, তবে তাঁহার এ কথার অর্থ কি? বাস্তবিক পক্ষে হিন্দুগণ জলে স্থলে, বনে জঙ্গলে, ঘরে বাহিরে, দেশে বিদেশে, পাহাড়ে

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—৫৪ পৃষ্ঠা।

পর্ব্বতে সর্ব্বত্রই ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার কথার কোনই অর্থ নাই ; ইহা চিন্তাশীল পাঠক অবশ্যই বুঝিবেন।

আর একটি কথা। "ব্রাহ্মের দেবতা পৃথিবীর সকল গ্রামে, সকল নগরে, কাশী বৃন্দাবনের ন্যায় সমভাবে অধিষ্ঠান করিতেছেন।" একথা বলিতে বেশ, শুনিতেও ভাল। কিন্তু ইহার অর্থ কি কেহ কখনও হৃদয়ঙ্গম করিবার কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন ? সাহস করিয়া বলিতে পারি, অধিকাংশ ব্রাহ্মই ইহার অর্থ বুঝিতে পারেন না। ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে দর্শন করা কি এতই সোজা কথা ? তাহা হইলে গীতায় একথা ভগবান্ বলিয়াছেন কেন যে, সর্ব্বত্রসমভাবে আমাকে দর্শন করিতে পারিলে মুক্তিলাভ হয় ? নিরাকারবাদিগণ কি সকলেই মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন ? বলিতে পারি না।

আরও একটি কথা। "পৌত্তলিকদের দেবতা বিশেষ বিশেষ মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।" এ কথা কি হিন্দু অপেক্ষা ব্রাহ্ম উপাসকের প্রতি বেশী খাটে না ? অনেক ব্রাহ্ম দেখিয়াছি, তাঁহারা বাড়ীতে কোনও উপাসনা করেন না ; তাঁহারা কেবল ব্রহ্মমন্দিরে সকলের সহিত মিলিত ভাবে উপাসনা করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে কি একথা খাটে না যে তাঁহারা ব্রহ্মকে মন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন ?

## "পরমেশ্বরকে অন্তরে পূজা করিতে চাই।"

নিরাকারবাদী বলেন,—

প্রিয়তম পরমেশ্বরকে অন্তরে পূজা করিতে চাই। তিনি অন্তরতম, প্রিয়তম, পুরুষ। অন্তরে তাঁহার পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতে চাই। পুত্তলিকা বাহিরে ; বাহিরের জিনিষ বাহিরে থাকুক্। আমার ইষ্টদেবতা অন্তরে, তিনি অন্তরতম, প্রিয়তম। পুত্তলিকা বাহিরে, কতদূরে। প্রভু নিকটে রহিয়াছেন ; প্রাণস্বরূপ প্রাণে রহিয়াছেন। বাহিরে জড়ের আশ্রয় লইতে যাইব কেন ? যতদিন মনুষ্য মূর্ত্তিপূজা করে, ততদিন সে বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া বেড়ায়। জড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না ; বাহিরের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে। মনুষ্য যখন আপনার অন্তরে প্রবেশ করে, সেখানে চৈতন্যস্বরূপ দেবতার পূজা করিয়া কৃতার্থ হয়।"*



যাঁহার হিন্দুসমাজে প্রচলিত সাকারউপাসনার সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান আছে, তিনি এরূপ কখনও লিখিতে পারেন না। হিন্দুগণ কি ইষ্টদেবতাকে অন্তরে পূজা করেন না ? তাঁহারা সর্ব্বদাই ত অন্তরে পূজা করিয়া থাকেন। তাঁহারা তিনসন্ধ্যা ইষ্টদেবতার যে উপাসনা করেন, তাহা কি অন্তরের পূজা না বাহিরের পূজা ? কে কবে প্রতিমাদর্শনে নিত্যসন্ধ্যা ও পূজা করিয়া থাকে ? আবার যখন প্রতিমা কিংবা বাহিরের কোন পদার্থ অবলম্বনে ইষ্টদেবতার পূজা করা হয়, তখন প্রথমতঃ ইষ্টদেবতাকে হৃদয়পদ্মে ধ্যান করিয়া "মানস-পূজা" করিতে হয়, ও তৎপরে বাহিরের পদার্থ অবলম্বনে তাঁহাকে পূজা করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, নিরাকারবাদিগণ এ সকলের কোনই খবর রাখেন না, অথচ এ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত নহেন।

* "সাকার নিরাকার উপাসনা"—৫৭ পৃষ্ঠা।

আর একটি কথা। "জড়বিগ্রহ তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। বাহিরের বিগ্রহ বাহিরেই থাকে।" নিরাকারবাদীই যখন জড়জগৎ অবলম্বনে ঈশ্বরউপাসনা করেন, তখন এই প্রকাণ্ড জড়জগৎটা কি তাঁহার ভিতরে পূরিতে চাহেন? বলা বাহুল্য তাহা কখনও পারিবেন না। এই জড়জগৎকে বাহিরে রাখিয়াই তাহার মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। জগৎ সম্বন্ধে যাহা খাটে, প্রতিমা সম্বন্ধেও তাহা খাটে। হিন্দু উপাসক কখনও প্রতিমাকে ভিতরে পূরিতে চান না, প্রতিমার অবলম্বনে ইষ্টদেবতার মূর্ত্তি অন্তরে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পূজা করেন। পূজা বাহিরের ক্রিয়া নহে, মনের ক্রিয়া। তাহা বাহিরে হয় না, ভিতরে হয়। প্রতিমা কি জড়জগৎ সেই ভিতরের ক্রিয়া উদ্দীপিত করে।

## পৌত্তলিকের কি মুক্তি নাই?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিরাকারবাদী বলেন,—

"রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ এ বিষয়ে যারপরনাই উদারমত প্রচার করিতেছেন। প্রত্যেক আত্মা মুক্তির অধিকারী। আমরা কখনও এরূপ বলি না, যে নিরাকার উপাসকই কেবল স্বর্গে যাইবে, আর আমাদের দেশবাসী কোটি কোটি নরনারী সকলেই নরকগামী হইবে। মুক্তি কাহারও একচেটিয়া নহে। কর্ম্মানুসারে নিশ্চয়ই ফলাফল হয়। যে পরিমাণে তোমাতে সত্য, প্রেম, ও পবিত্রতা সেই পরিমাণেই তুমি মুক্তির দিকে অগ্রসর। * * * কিন্তু একটী কথা বিশেষ করিয়া বলি। প্রেম ও পবিত্রতা ভিন্ন যেমন মুক্তি নাই, সত্য ভিন্নও তেমন মুক্তি নাই। অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব



কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে? মুক্তি-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, অপ্রেম, অপবিত্রতা ও অসত্য এ তিনকেই দূরে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তবে পৌত্তলিকতা লইয়া, মনুষ্য কেমন করিয়া সে মন্দিরে প্রবেশ করিবে। পাপাসক্তির শৃঙ্খল না ছিঁড়িলে মুক্ত হওয়া যায় না। সেইরূপ সকল প্রকার অসত্য, কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার শৃঙ্খল না ছিঁড়িলেও মুক্তির অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।" *

এই মত প্রমাণ করিতে গিয়া নিরাকারবাদী বলেন,—

"সাকারউপাসনা বিষয়ে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কি, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মূর্ত্তিপূজার অসারত্ব ও নিরাকার ব্রহ্মপূজার আবশ্যকতা প্রতিপাদক শ্লোক শাস্ত্রে রাশি রাশি রহিয়াছে। বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমগ্র শাস্ত্রের তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খ লোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা। তত্ত্বজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত মুক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই।" †

অতঃপর তিনি কতকগুলি শ্লোক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার বিচার পরে করা যাইতেছে। প্রথম কথা এই,—সাকার উপাসকের মুক্তি নাই, কারণ "অসত্যকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া, জীব কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের সম্মুখীন হইবে?"

সাকারবাদীর ন্যায় নিরাকারবাদীও জড়-জগতের সাহায্যে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন কি রূপে?

ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ বোধ হয়, এই, সাকার উপাসক অসত্য, কল্পিত প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরের পূজা করেন। সকলেই জানেন প্রতিমা অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা কেবল কাম্য

* "সাকার ও নিরাকার উপাসনা"—৫৭—৫৮ পৃষ্ঠা।
† ঐ—৫৮—৫৯ পৃষ্ঠা।

ক্রিয়ার মধ্যে গণ্য। কোন হিন্দু তিনসন্ধ্যায় প্রতিমা অবলম্বনে নিত্য উপাসনা করেন না। কাম্য ক্রিয়া ইচ্ছাধীন (Optional) অবশ্যকর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া গণ্য নহে। সুতরাং অসত্য প্রতিমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া উপাসনা হিন্দুগণের মধ্যে অতি অল্পলোকেই অল্প সময়ের জন্য করিয়া থাকেন। হিন্দুগণের প্রতিমা অবলম্বনের ন্যায় ব্রাহ্মগণ এই জড়জগৎ অবলম্বন করিয়া উপাসনা করেন। নিরাকারবাদী বলেন, নিরাকার উপাসনার প্রথমাবস্থায় এইরূপ অবলম্বন প্রয়োজনীয়। সুতরাং জড়-জগতের অবলম্বনে ঈশ্বরোপাসনা নিরাকারবাদীর অবশ্য-কর্ত্তব্য ( Compulsory ) বলিয়া গণ্য। এই জড় জগৎ যে মিথ্যা, অসত্য তাহা উক্ত গ্রন্থকার উৎকৃষ্ট যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। * এখন কথা হইতেছে, নিরাকারবাদী যদি এই অসত্য জড়জগতের অবলম্বনে সর্ব্বদা ঈশ্বর উপাসনা করিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া মুক্তির অধিকারী হইতে পারেন, তবে সাকারবাদী হিন্দু কখনও কোন সময়ে অসত্য জড়মূর্ত্তির অবলম্বনে ঈশ্বর-উপাসনা করিয়া মুক্তিপথের অধিকারী হইবেন না কেন? নিরাকারবাদী কি বলিতে চান, কালীমূর্ত্তির উপাসক মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংস মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গ মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? মূর্ত্তি উপাসক শঙ্করাচার্য্য, রামপ্রসাদ—আর কত নাম

* "পরমেশ্বর সার, সত্য, জগৎ অসার, অসত্য"—সাকার ও নিরাকার উপাসনা—১৮ পৃষ্ঠা।



করিব?—মুক্তিলাভের অধিকারী ছিলেন না? শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ইঁহারা মূর্ত্তি পূজার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বীয় প্রতিভা বলে মূর্ত্তি পূজার কুপ্রভাব কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন! কিন্তু তাহা প্রকৃত কথা নহে। তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠে জানা যায় মূর্ত্তি পূজাই তাঁহাদের সিদ্ধিলাভের সহায় ছিল, অন্তরায় ছিল না।

"বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র সমস্ত শাস্ত্রেরই তাৎপর্য্য এই যে, মূর্খলোকদিগের চিত্তের স্থৈর্য্যের জন্য মূর্ত্তিপূজা ;"—নিরাকারবাদী তাঁহার এই মত সমর্থন করিবার জন্য যে সকল শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটার দ্বারাও কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না। তাঁহার উদ্ধৃত—

> "নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্ত্তু মনীশ্বরাঃ।
> যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষ-নিরূপণৈঃ॥"

এই শ্লোকের অর্থ মহানির্ব্বাণতন্ত্রের তৃতীয় উল্লাসে ব্যাখ্যাত হইয়াছে (২৪৯ পৃষ্ঠা)। এস্থলে তাহার পুনরালোচনা নিষ্প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন কুলার্ণবের—

> "চিন্ময়স্যাপ্রেময়স্য নির্গুণস্যাশরীরিণঃ।
> সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥"

এই শ্লোকের অর্থ "মূর্খদিগের চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে" ইহা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। এখানে সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনার কথা বলা হইয়াছে; সাধক বলিতেই মূর্খ সাধক বুঝাইবে, ইহা অতি

অশ্রদ্ধেয় কথা। কি প্রকার সাধককে এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে বুঝান হইয়াছে। ৭৫ পৃষ্ঠা দেখুন।

নিরাকারবাদীর সংগৃহীত শ্লোকের দ্বারা তাঁহাদের মত সমর্থিত হয় না।

রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে নিরাকারবাদিগণ সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের লক্ষ লক্ষ শ্লোকের মধ্য হইতে বাছিয়া গুছিয়া দশ বিশটি শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। আবশ্যক মত তাহাই তাঁহারা আবৃত্তি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ কয়েকটি শ্লোক কোন ক্রমেই তাঁহাদের নব প্রচলিত মত সমর্থন করে না। এই কয়েকটি শ্লোককে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদক শ্লোক, (২) সাকার উপাসনা অপেক্ষা নির্গুণ উপাসনার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক শ্লোক। প্রথম শ্রেণীর শ্লোক যথা,—

(ক) আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ ইত্যাদি।

(খ) আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত।

(গ) যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্যৈষ মহিমাভুবি দিব্যে।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥

(ঘ) ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈ স্তপসা কর্ম্মণাবা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু
তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥

(ঙ) অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং।
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥



(চ) যন্মনসা ন মনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেব ব্রহ্মত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥

এ সকল শ্রুতির মধ্যে সাকার উপাসনার নাম গন্ধও নাই। সুতরাং এতদ্দ্বারা সাকার উপাসনার অসারত্ব কি প্রকারে প্রতিপন্ন হইল? এ সকল শ্রুতিতে অধ্যাত্মযোগ বা নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদন করিতেছে। কিন্তু তাই বলিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকারউপাসনার সহিত এই শ্রুতি-প্রতিপাদিত নির্গুণোপাসনার কোন সম্বন্ধ নাই। ইহা ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিত রূপে দেখান হইয়াছে। এ সকল শ্রুতিতে যাহা প্রতিপাদন করিতেছে, নিম্নলিখিত শ্লোক সকলও সেই একই কথা প্রতিপাদন করিতেছে—

(ছ) একোব্যাপী সমঃ শুদ্ধো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
জন্মবৃদ্ধ্যাদিরহিত আত্মা সর্ব্বগতোঽব্যয়ঃ॥
সিতনীলাদিভেদেন যথৈকং দৃশ্যতে নভঃ।
ভ্রান্তদৃষ্টিভিরাত্মাপি তথৈকঃ সন্ পৃথক্ পৃথক্॥
বিষ্ণুপুরাণ, ১ম অংশ, ৩য় অধ্যায়।

এতদ্দ্বারা আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

(জ) অরূপং ভাবনাগম্যং পরং ব্রহ্ম কুলেশ্বরি।
নির্ম্মলং নিষ্কলং নিত্যং নির্গুণং ব্যোমসন্নিভম্॥
কুলার্ণব, তৃতীয় উল্লাস।

এ শ্লোকও পরব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছে।

(ঝ) পরে ব্রহ্মণি বিজ্ঞাতে সমস্তৈর্নিয়মৈরলং।
তালবৃন্তেন কিং কার্য্যং লব্ধে মলয়মারুতে॥

এ শ্লোকে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে যমনিয়মাদির অনাবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতেছে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শ্লোকগুলি এই,—

(ক) উপেক্ষ্যতৎতীর্থ-যাত্রাং জপহোমাদিকুর্ব্বতাং।
পিণ্ডংসমুৎস্রজ্যকরং লেঢ়ীতি ন্যায় আপতেৎ॥

পঞ্চদশী, ধ্যানদীপ।

(খ) অরূপং রূপিণং কৃত্বা কর্ম্মকাণ্ডরতা নরাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানামৃতানন্দপরাঃ সুকৃতিনো নরাঃ॥

কুলার্ণব, ষষ্ঠ উল্লাস।

(গ) মনসাকল্পিতা মূর্ত্তির্নৃনাঞ্চেন্মোক্ষ-সাধিনী।
স্বপ্নলব্ধেন রাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

(ঘ) সাকারমনৃতং বিদ্ধি নিরাকারন্তু নিশ্চলং।
এতত্তত্ত্বোপদেশেন ন পুনর্ভবসম্ভবঃ॥

(ঙ) কৃত্বা মূর্ত্তিপরিজ্ঞানং চেতনস্ত ন কিং কুরু।
নির্ব্বেদসমতাযুক্ত্যা যস্তারয়তি সংসৃতেঃ॥

অষ্টাবক্রসংহিতা।

এই সকল শ্লোকের অর্থ বুঝিবার আগে একটা বিষয় স্মরণ করা আবশ্যক। হিন্দু-শাস্ত্রগ্রন্থসকল যাঁহারা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য দেখিয়া থাকিবেন, কোন গ্রন্থকার যখন নিজের মত প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন তিনি সেই মতের প্রশংসাসূচক কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করেন। তাঁহার নিজের প্রতিপাদিত বিষয়ের প্রশংসা করিতে



গিয়া, এমন কি সময় সময় অন্য প্রকার মতের নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। তাহার কারণ এই, যে ব্যক্তি যে প্রকার অধিকারী, তাহার জন্য সেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যে যে শাস্ত্রের অধিকারী, সে ভিন্ন অন্যের সে শাস্ত্র পড়িবার অধিকার নাই। যেমন অদ্বৈতবাদীর জন্য "পঞ্চদশী" কিংবা "অষ্টাবক্রসংহিতা" রচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থকার যাহাতে সেই অদ্বৈতাধিকারী অন্য শাস্ত্রপাঠে তাঁহার নির্দ্ধারিত পন্থা হইতে বিচলিত না হন, সেই জন্য তাঁহাদের গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা করিয়াছেন, এমন কি দ্বৈতবাদ ও সগুণ উপাসনার নিন্দা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সেইরূপ ভক্তিপ্রধান গ্রন্থে ভক্তিপন্থার যারপরনাই প্রশংসা করা হইয়াছে, জ্ঞানমার্গের নিন্দা করিতে গ্রন্থকার ত্রুটী করেন নাই। বৈষ্ণব গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের অনেক নিন্দা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে গেলে সকলেই স্বীকার করিবেন, শাস্ত্রসকলের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই সকল স্তুতিনিন্দাসূচক শ্লোক সকলে বিশেষ গুরুত্ব স্থাপন করা উচিত নহে।

আর একটি কথা। "পঞ্চদশী" "অষ্টাবক্রসংহিতা", "কুলার্ণব" প্রভৃতি নির্গুণোপাসনা-প্রতিপাদক গ্রন্থ। যাঁহারা নির্গুণ উপাসনা বা অধ্যাত্মযোগ অবলম্বন করিবার অধিকারী, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এ সকল গ্রন্থে নির্গুণোপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। যাঁহাদের নির্গুণ উপাসনার অধিকার জন্মে নাই, তাঁহাদের এই সকল গ্রন্থের উপদেশ অনুসারে কাজ করিবার

কোনই অধিকার নাই। "এম্-এ, পাশ না করিলে ভাল চাকরী পাইবে না, সুতরাং এম্-এ, পাশ কর" যদি কেহ এরূপ উপদেশ দেন, তবে বুঝিতে হইবে, এরূপ উপদেশ যাহারা প্রথমে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশ্য তাহাদের জন্য নহে। যাঁহারা বি-এ, পাশ করিয়াছেন, কেবল তাহাদিগের সম্বন্ধেই এই উপদেশ প্রযোজ্য। সেইরূপ—"ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করিলে মুক্তি হয় না, অতএব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর" যদি এরূপ উপদেশ কোন পুস্তকে লেখা থাকে, তাহা কাহার প্রতি প্রযোজ্য ? তাহা কি সর্ব্বসাধারণের প্রতি প্রযোজ্য ? কখনই না। যে মহাত্মা বহুজীবন ধর্ম্মানুশীলন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, কেবল তাঁহারই সম্বন্ধে এ উপদেশ খাটে। বলা বাহুল্য, পঞ্চদশী, কুলার্ণব, মহানির্ব্বাণতন্ত্র, অষ্টাবক্রসংহিতার উদ্ধৃত শ্লোক সকল কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের "অধিকারীর" জন্যই লেখা হইয়াছে, সে সকল কেবল সেই "অধিকারী" সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এখন উক্ত শ্লোক সকলের বিচার করা যাউক।

পঞ্চদশীর মতের ব্যাখ্যা।

(ক) "পরব্রহ্মের উপাসনাকে উপেক্ষা করিয়া যাহারা তীর্থযাত্রা, জপ হোমাদি করিয়া থাকে, তাহার হস্তস্থিত খাদ্যদ্রব্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজহস্তকেই লেহন করে।" *

বলা বাহুল্য, এই শ্লোক দ্বারা পঞ্চদশীকার যাঁহারা নির্গুণ উপাসনার অধিকারী, কেবল তাঁহাদিগকেই তীর্থযাত্রা, জপ, হোমাদি দ্বারা বৃথা কালক্ষেপণ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু



যাঁহাদের নির্গুণোপাসনার অধিকার নাই, তাঁহাদিগকে এ উপদেশ দেওয়া হয় নাই। এটি পঞ্চদশী, "ধ্যানদীপের" ১৩০শ শ্লোক, ইহার একটু উপরে পঞ্চদশীকার বলিয়াছেন,—

"পামরাণাং ব্যবহৃতেঃ বরং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠিতিঃ
ততোঽপি সগুণোপাস্তি নির্গুণোপাসনং ততঃ
যাবদ্ বিজ্ঞান-সামীপ্যং তাবৎ শ্রৈষ্ঠ্যং বিবর্দ্ধতে।
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষাৎ নির্গুণোপাসনং শনৈঃ ॥ ১২১—২২।

অর্থাৎ পামরদিগের আচরণ অপেক্ষা কর্ম্মাদি অনুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ ; তদপেক্ষা সগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ, এবং সগুণোপাসনা অপেক্ষা নির্গুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ। কারণ যতই উপাসনা প্রণালী ব্রহ্মজ্ঞানের নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহার শ্রেষ্ঠতা বর্দ্ধিত হয়। নির্গুণোপাসনা অভ্যাস করিতে করিতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। অতএব নির্গুণোপাসনা যে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ অধিকারীর অনুষ্ঠেয়, তাহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইল। সুতরাং এখানে একথা লিখিয়া তাহার ৮ শ্লোক নীচে কখনও গ্রন্থকার নির্গুণোপাসনা সর্ব্বসাধারণের অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদেশ দিতে পারেন না। বলা বাহুল্য, এ সকল শ্লোক নির্গুণোপাসনার প্রশংসাসূচক।

কুলার্ণবের মতের ব্যাখ্যা।

(খ) এ শ্লোকের অর্থ—রূপহীন পরমাত্মাকে রূপবিশিষ্ট কল্পনা করিয়া মানুষ্যেরা কর্ম্মকাণ্ডে রত হয়, আর পুণ্যবান্ মানবগণ ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ অমৃত ও আনন্দপরায়ণ হইয়া থাকেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কুলার্ণব নির্গুণোপাসনা প্রতিপাদক গ্রন্থ ; ইহাতে 'কর্ম্মকাণ্ডের'

নিন্দা থাকা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। দ্বিতীয়তঃ জ্ঞানমার্গের পক্ষে কর্ম্মকাণ্ডাদি অনুষ্ঠান কেবল চিত্তশুদ্ধি ও চিত্তের একাগ্রতার জন্য অনুষ্ঠেয়, মূল উদ্দেশ্য ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়স্বরূপ (as means to an end) অনুষ্ঠেয়। যাঁহারা সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়া উপায়ে রত হন, তাঁহাদিগকে সাবধান করিবার জন্য এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে এই উদ্দেশ্য স্পষ্টই দেখা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে এই—"সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"—সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করা হইয়াছে, কদাচ অহিতের জন্য নহে। এখন সাধকমাত্রেই সেই ব্রহ্মমূর্ত্তির উপাসনা করিতে গিয়া কর্ম্মকাণ্ডে রত হইয়া পড়েন, আর অন্য লোকেরা ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পান করেন,—নিষ্ফল কর্ম্মকাণ্ডে রত হওয়াই মূর্ত্তিপূজার অবশ্যম্ভাবী ফল—পরবর্ত্তী শ্লোকের যদি এরূপ অর্থ করা হয়, তবে ব্রহ্মের সেই রূপকল্পনা দ্বারা কি প্রকারে হিত সাধিত হইল? সুতরাং পরবর্ত্তী শ্লোকের নিরাকারবাদী যে অর্থ করিয়াছেন, পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত তাহার বিরোধ হয়। তৃতীয়তঃ, এ শ্লোকে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ বলিলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। যাঁহারা নিতান্ত "সুকৃতি" বলে ব্রহ্মজ্ঞান-সুধাপান করিবার "অধিকারী" হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞানামৃত পান দ্বারা কৃতার্থ হইতে পারেন। বলা বাহুল্য, সর্ব্বসাধারণে কদাচ তাহা পারে না।



মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতের ব্যাখ্যা

(গ) মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের অর্থ এই—"মনঃকল্পিত মূর্ত্তি যদি মানবগণের মুক্তির কারণ হয়, তবে মনুষ্যেরা স্বপ্নে লব্ধ রাজ্য দ্বারা অনায়াসে রাজা হইতে পারে।"

কুলার্ণবের ন্যায় মহানির্ব্বাণতন্ত্রও জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী। ইহাতে সাকারউপাসনা কেবল নির্গুণোপাসনার অধিকার লাভের জন্য, চিত্তশুদ্ধির জন্য, আবশ্যক এরূপ মত প্রতিপাদিত হইয়াছে,—

"অপ্রাপ্তযোগমর্ত্ত্যানাং সদা কামাভিলাষিণাং।
স্বভাবাজ্জায়তে দেবি প্রবৃত্তিঃ কর্ম্মসঙ্কুলে॥
তত্রাপি তে সানুরক্তা ধ্যানার্চ্চাজপসাধনে।
শ্রেয়স্তদেব জানন্তু তত্রৈব দৃঢ়নিশ্চয়াঃ।
অতঃ কর্ম্মবিধানানি প্রোক্তানি চিত্তশুদ্ধয়ে।
নামরূপং বহুবিধং তদর্থং কল্পিতং ময়া।"

হে দেবি! যে সকল মানব সর্ব্বদা কামাসক্ত, সুতরাং যোগমার্গের অধিকারী নহে, তাহাদের স্বভাবতঃ নানাপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। সে সকল কর্ম্ম (ধ্যান, অর্চ্চনা, জপ, সাধনাদি) যদি তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়াও আমার প্রতি অনুরক্তির সহিত সম্পন্ন করে, তাহাতেও তাহাদের শ্রেয়োলাভ হইবে বলিয়া তাহারা জানুক। অতএব তাহাদের চিত্তশুদ্ধির জন্য আমি নানা প্রকার কর্ম্মকাণ্ডের বিধান করিয়াছি ও তাহাদের জন্য আমার নানাবিধ রূপ ও নাম কল্পনা করিয়াছি।

অতএব দেখা গেল, মহানির্ব্বাণতন্ত্রের মতে কেবল চিত্তশুদ্ধির জন্য সাকারউপাসনার আবশ্যকতা, মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য নহে। সাকারউপাসনা করিতে করিতে কামনানিবৃত্তি হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগমার্গের "অধিকারী" হওয়া যায়। মনঃকল্পিত রূপ ও নাম কেবল সেই চিত্তশুদ্ধির জন্যই প্রয়োজনীয়। সেই রূপ ও নামের সাধনা অর্থাৎ সাকারউপাসনা করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার জন্মে। সেই রূপ ও নামের সাধনা দ্বারা কখনও মোক্ষলাভ হয় না। যে গ্রন্থের এইরূপ মত তাহাতে সাকারউপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে এরূপ মতের আশা করা অবৈধ। মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞানমার্গের উপদেশ করেন বলিয়া এরূপ বলিতেছেন ; কিন্তু যে সকল শাস্ত্র ভক্তিমার্গের উপদেশ দেন, তাহাতে সাকারউপাসনা দ্বারাই মুক্তিলাভ হইতে পারে এই মত প্রতিপাদিত হইয়াছে। গীতায় ভগবদুক্তিতে স্পষ্টাক্ষরে বলা হইয়াছে, সাকারউপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে। (দ্বাদশ অধ্যায় দেখ)। এইরূপে আমরা দেখিলাম, মহানির্ব্বাণতন্ত্র জ্ঞানমার্গের পক্ষপাতী বলিয়া সাকারউপাসনা দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না বলিতেছেন ; ইহা দ্বারা সাকারউপাসনার অসারতা প্রতিপন্ন হইতেছে না।

এখানে আর একটি কথা উঠিল। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র চিত্তশুদ্ধির জন্য নাম ও রূপের সাহায্যে সাকারউপাসনার আবশ্যকতা স্বীকৃত হইতেছে। নিরাকারবাদিগণ কি সকলেই চিত্তশুদ্ধি লাভ



করিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের সাকার উপাসনার কোনই আবশ্যকতা নাই ?

(ঘ) ও (ঙ)। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অষ্টাবক্রসংহিতা জ্ঞানমার্গ-প্রতিপাদক গ্রন্থ। সুতরাং তাহাতে জ্ঞানযোগেরই একমাত্র আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এখানে ভক্তিমার্গের সাকার-উপাসনাপ্রতিপাদক মত আশা করা অবৈধ। আর একথাও অবশ্য স্মরণ করা উচিত, একমাত্র জ্ঞানমার্গের অধিকারীকে লক্ষ্য করিয়াই এই উপদেশ দেওয়া হইয়াছে.—

অষ্টাবক্র সংহিতার ব্যাখ্যা

"চেতনের মূর্ত্তিপরিজ্ঞানপূর্ব্বক কোন কর্ম্ম করিও না।"

যাঁহাদের জ্ঞানমার্গে অধিকার জন্মে নাই, তাঁহাদের জন্য এ উপদেশ নহে।

আর একটি কথা। "সাকারকে মিথ্যা বলিয়া জান, নিরাকার ব্রহ্মকে নিত্য জ্ঞান কর, এই পরমতত্ত্বের উপদেশ দ্বারা পুনর্ব্বার সংসারে আর সম্ভব হয় না।" ইহার অর্থ কি এই হইতে পারে যে, সাকার উপাসনা মিথ্যা, অসার, অমূলক ? সাকার জড়পদার্থকে মিথ্যা না বলিয়া কে সত্য বলিবে ? আবার, সাকার ও নিরাকার, জড় ও চৈতন্য, নিত্য ও অনিত্য, এই তত্ত্বজ্ঞান হইলে মোক্ষলাভ হয়, এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারে ?

উল্লিখিত শ্লোক ছাড়া নিরাকারবাদী আরও দুইটি শ্লোক ভাগবত হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন ; যথা—

ভাগবতের শ্লোকের ব্যাখ্যা

(১) যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ়াৎ ভস্মন্যেবজুহোতি সঃ॥
তৃতীয় স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়।

(২) মৃচ্ছিলা-ধাতু-দার্ব্বাদি মূর্ত্তাবীশ্বর-বুদ্ধয়ঃ।
ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাংশান্তিং নযান্তিতে॥
তৃতীয়স্কন্ধ।

ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে মূল (context) দেখা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ ২৯শ অধ্যায়ে ভগবান্ অহৈতুকী ভক্তির সাধনপ্রণালী বর্ণনা করিতেছেন,—

মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ-পূজাস্তত্যভিবন্দনৈঃ।
ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া।
মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানু-শ্রবণান্নাম-সঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে।
আর্জ্জবেনার্য্য সঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়াতথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধআশয়ঃ।
পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাং॥
যথা বাতরথোঘ্রাণ মাবৃঙ্‌ক্তে গন্ধআশয়াৎ।
এবং যোগরতং চেত আত্মানমবিকারি যৎ॥
অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চাবিড়ম্বনাং॥
যোমাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরং।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ়াদ্ ভস্মন্যেবজুহোতি সঃ॥



দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈবতুষ্যেঽর্চ্চিতো ঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্নবেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥

১৬—২৫ শ্লোক।

অর্থাৎ আমার প্রতিমাদর্শন, স্পর্শন, পূজা, স্তুতি, বন্দনা দ্বারা, অনাসক্তচিত্তে সর্ব্বভূতে আমাকে ভাবনা দ্বারা, সাধুগণের সম্মান ও দরিদ্রের প্রতি অনুকম্পা দ্বারা, আত্মবৎ সর্ব্বভূতে মৈত্রী দ্বারা, যম ও নিয়মানুষ্ঠান দ্বারা, আধ্যাত্মিকতত্ত্বশ্রবণ ও আমার নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা, সরলতা সৎসঙ্গ নিরহঙ্কার এই সকল গুণের দ্বারা মৎপরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া শীঘ্রই আমার গুণশ্রবণমাত্রে আমাকে প্রাপ্ত হয়। যেমন গন্ধ বায়ুর সাহায্যে পুষ্প হইতে নাসিকাতে প্রবেশ করে, সেইরূপ বিকার-রহিত যোগরত চিত্ত আমাতে প্রবিষ্ট হয়। (কিন্তু চিত্তশুদ্ধি কেবল প্রতিমাপূজা দ্বারা হয় না, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি আবশ্যক; যাহারা সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি অভ্যাস না করিয়া কেবল প্রতিমা পূজা করে, ইহার পরের সাতটি শ্লোক দ্বারা তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে *)। আমি সর্ব্বদা সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছি,

* "চিত্তশুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতাত্মদৃষ্টৈব ভবতি ইতি বক্তুং, কেবল প্রতিমাদি নিষ্ঠাং নিন্দয়াহ অহমিতি সপ্তভিঃ।"—শ্রীধরস্বামী।

আমাকে সেই ভাবে না দেখিয়া মানবগণ প্রতিমাপূজার বিড়ম্বনা করে। যে আমাকে,—সর্ব্বভূতের মধ্যে আত্মারূপে বিদ্যমান পরমেশ্বরকে, পরিত্যাগ করিয়া মূর্খতাবশতঃ কেবল প্রতিমাপূজা করে, সে ভস্মে হোম করে। যে ব্যক্তি পরশরীরমধ্যস্থ আমাকে হিংসা করে, যে অভিমানী, আত্মপরভেদদর্শী, অন্যান্য প্রাণীতে বৈরাচরণ করে, তাহার মন কখনও শান্তি পায় না। যাহারা সর্ব্ব প্রাণীকে আবমাননা করিয়া প্রচুর উপহার দ্বারাও আমাকে প্রতিমাতে অর্চ্চনা করে, আমি তাহাদের পূজাতে তুষ্ট হই না। (তবে কি প্রতিমা পূজার কোন প্রয়োজন নাই? † অবশ্য আছে) যে পর্য্যন্ত হৃদয়ে ও সর্ব্বভূতের মধ্যে আমাকে অবস্থিত বলিয়া না জানিবে, সে পর্য্যন্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিয়া অবকাশ মতে আমার প্রতিমাতে আমাকে পূজা করিবে।

এতদ্দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি, ভাগবতের মতে,—

ভাগবতের মতে প্রতিমাপূজা আবশ্যক।

(ক) অহৈতুকী ভক্তি সাধনের পক্ষেও মূর্ত্তিপূজা আবশ্যক।

(খ) যে পর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সমদর্শন না জন্মে, সে পর্য্যন্ত প্রতিমাপূজা নিতান্ত আবশ্যক।

(গ) যাহারা সর্ব্বভূতে সমদর্শন অভ্যাস ভুলিয়া কেবল মাত্র প্রতিমাপূজাতে চিত্ত অভিনিবেশ করে, তাহারা নিন্দনীয়।

নিরাকারবাদী মূলের সহিত ঐক্য না করিয়া এই শ্লোকের

---

† "তর্হি কিমর্চ্চাদৌ অর্চ্চনমর্থকমেব নেত্যাহ।"—শ্রীধরস্বামী।



ভুল ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার মতের পোষকতা করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইল। কেবল মূর্খলোকদিগের চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য প্রতিমাপূজা, তাঁহার এ মত আদৌ ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় না। বরং এমন কি যাঁহারা অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহাদিগেরও প্রতিমাপূজা আবশ্যক, ইহা এতদ্দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

নিরাকারবাদীর উদ্ধৃত এই প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যাতে ভাগবতকারের সাকার উপাসনা সম্বন্ধে মত বিশেষরূপে জানা গেল। সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকের মূলের সহিত ঐক্য করিয়া ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক মনে করি।

ভগবদ্গীতার মতের ব্যাখ্যা।

এতদ্ভিন্ন ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ২০শ শ্লোক হইতে ২৫শ শ্লোক তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল শ্লোক দ্বারাও তিনি পৌত্তলিকতার অসারত্ব এবং নিরাকার ব্রহ্মোপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এস্থলেও তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত হইতে সেই কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে,—

"হে অর্জ্জুন! ত্রিবেদবিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানপর, যজ্ঞশেষে সোমরসপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন; পরিশেষে অতিপবিত্র সুরলোক প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্টদেবভোগ সকল উপভোগ করিয়া থাকেন। অনন্তর পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করেন। এইরূপে তাঁহারা বেদত্রয়বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান-

পর ও ভোগবিলাসী হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকেন। যাঁহারা অনন্যমনে আমাকে চিন্তা ও আরাধনা করেন, আমি সেই সকল মদেকনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে যোগক্ষেম প্রদান করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক অর্থাৎ আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে আমাকেই পূজা করিয়া থাকে। আমি সকল যজ্ঞের ভোক্তা ও প্রভু, কিন্তু তাহারা আমাকে যথার্থতঃ বিদিত হইতে পারে না, এই নিমিত্ত স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া থাকে। দেবব্রতপরায়ণ ব্যক্তি দেবগণ, পিতৃব্রত ব্যক্তিরা পিতৃগণ ও ভূতসেবকেরা ভূতসকলকে, এবং আমার উপাসকেরা আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

ইহার পর নিরাকারবাদী বলেন, "গীতার স্পষ্ট অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা অস্থায়ী স্বর্গভোগ হইতে পারে, কিন্তু মুক্তিলাভ হয় না।"

এ স্থলে প্রথম কথা এই, যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা অস্থায়ী স্বর্গভোগ হয় ও মুক্তিলাভ হয় না, সে কি যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনার দোষ, না যে ব্যক্তি সেই অস্থায়ী স্বর্গকামনা করিয়া দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞ করে তাহার দোষ? উপরের অনুবাদে স্পষ্টই আছে, "ত্রিবেদবিহিত-কর্ম্মানুষ্ঠানপর যজ্ঞশেষে সোমরসপায়ী, বিগতপাপ মহাত্মাগণ যজ্ঞদ্বারা আমার সৎকার করিয়া, **সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন।**" তাঁহারা সুরলোক লাভের অভিলাষ করেন বলিয়াই তাঁহাদের সুরলোকে গতি হইয়া পুনরায় পুণ্যক্ষয়ে অধোগতি হয়। যদি তাঁহারা মোক্ষলাভ অভিলাষ করিতেন, তবে নিশ্চয়ই সেই যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনা দ্বারা



মোক্ষলাভ করিতে পারিতেন। এই জন্য ভগবান্ অন্যত্র বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"

এ শ্লোকের অর্থ, যাঁহারা আমাকে সকাম ভাবে ও নিষ্কাম-ভাবে আরাধনা করেন, আমি তাঁহাদিগকে সেই ভাবেই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। সুতরাং যাঁহারা নিষ্কাম ভাবে দেবার্চ্চনা ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা যে মোক্ষলাভ করেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

আর একটি কথা এই। গীতাদ্বারা দেবার্চ্চনাদির অসারতা প্রতিপাদন হওয়া দূরে থাকুক, বরং সে সকলের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। নিরাকারবাদী যে শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার পরের শ্লোকেই ভগবান্ বলিয়াছেন—

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতং অশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।"

যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল প্রদান করে, আমি সেই সংযতাত্মা ব্যক্তির ভক্তিপূর্ব্বক নিবেদিত বস্তুসকল গ্রহণ করি।

নিরাকারবাদী এ শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেন না কেন? ইহা তাঁহার বিরুদ্ধে বলিয়া নয় কি?

ভগবান্ অন্যত্র বলিতেছেন,—

"যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেবতৎ।
যজ্ঞদান-তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥"
গীতা ১৮।৫-৬।

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করা উচিত নহে, সে সকল অনুষ্ঠান করাই উচিত। মনীষিগণ যজ্ঞদান তপস্যাদি কর্ম্মকাণ্ড অনুষ্ঠানের দ্বারা পবিত্র হন। কিন্তু এ সকল কর্ম্ম অনাসক্তচিত্তে ও নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠেয়। হে পার্থ! ইহাই আমার নিশ্চিত অভিমত বলিয়া জানিবে।

উল্লিখিত শ্লোক সকল ছাড়া নিরাকারবাদীর পুঁজীপাটায় আরও দুইটি শ্লোক আছে। আমি এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করিতেছি।

"অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খানাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা ॥"
শতাতপসংহিতা।

মনুষ্যগণের দেবতা জলে, মনীষিগণের দেবতা স্বর্গে, মূর্খদিগের দেবতা কাষ্ঠ ও পাষাণে, যোগিগণের দেবতা আত্মাতে।

"অগ্নৌ তিষ্ঠতি বিপ্রাণাং হৃদি দেবো মনীষিণাং।
প্রতিমাস্বল্পবুদ্ধীনাং সর্ব্বত্রবিদিতাত্মনাম্ ॥"
কুলার্ণব, নবম উল্লাস।

ব্রাহ্মণদিগের দেবতা অগ্নিতে, মনীষিগণের দেবতা হৃদয়ে, অল্পবুদ্ধিলোকের দেবতা প্রতিমাতে, আত্মবিদের দেবতা সর্ব্বত্র।

ইতিপূর্ব্বে সাকার উপাসনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পাঠক অবশ্যই দেখিয়াছেন, সাকারউপাসক এই দুই শ্লোকে বর্ণিত মূর্খ কিংবা অল্পবুদ্ধি নহেন। সাকার উপাসক মাত্রেই যেমন প্রতিমাতে কখন কখন দেবতার অধিষ্ঠান দেখিয়া পূজা করেন, তেমন সর্ব্বদা নিজহৃদয়েও দেবতাকে ধ্যান করিয়া পূজা করেন। যে সকল মূর্খ লোক সাকার উপাসনার কোন ধার ধারে না, তাহাদিগকেই এই শ্লোকদ্বয়ে লক্ষ্য করা হইয়াছে। উল্লিখিত পঞ্চদশীশ্লোকে তাহাদিগকে "পামর" বলা হইয়াছে।



উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সাকার উপাসনার একান্ত আবশ্যকতা নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইতেছে। নিরাকারবাদীগণ সাকার উপাসনার অসারতা প্রমাণ করিবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত, ভগবদ্গীতা, মহানির্ব্বাণতন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, তদ্দারা তাঁহাদের মত সমর্থিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং তাহার বিপরীত প্রমাণ হইতেছে। কি জ্ঞানযোগী, কি ভক্তিযোগী, কি কর্ম্মযোগী, ইঁহারা সকলেই যে একমাত্র সাকার উপাসনা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ অভীষ্টপথে অগ্রসর হইতে পারেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের মধ্য হইতে যে দশ বিশটি শ্লোক এই মতের আপাততঃ বিরোধসূচক বলিয়া বোধ হয়, সে গুলির মূলের সহিত ঐক্য করিয়া ব্যাখ্যা করাতে তদ্দারা এই মতের সম্পূর্ণ পোষকতা হইতেছে। সুতরাং একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রদ্বারা সাকারউপাসনার একান্ত আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

## সাকার উপাসনা কি চিরদিনই করিব ?

আজকাল একথা অনেকে বলিয়া থাকেন। সাকারউপাসনা দ্বারা নির্গুণোপাসনার ( জ্ঞানমার্গের ) অধিকার জন্মে, একথা যেন স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার কি কোন সীমা নাই ? যে সকল ব্যক্তি আজীবন কেবল সাকারউপাসনা করিয়াই কাটাইলেন, তাঁহাদের জীবন যে বৃথা গেল।

যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা দুইটি ভুল করেন। প্রথমতঃ তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের মত মনে করেন, পৃথিবীতে একবার জন্ম ও একবার মৃত্যু দ্বারাই বুঝি মানবজীবনের শেষ হইল। যখন একবার ভিন্ন জন্মগ্রহণ করিবার উপায় নাই, তখন যে রকমে হউক, এই জীবনেই সকল কাজ শেষ করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে পাশ্চাত্য-জগতে এই বিশ্বাস প্রচলিত, সেখানে এই এক জন্মের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদন করিতে অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথায় আমাদের কোন কাজ নাই। একবারের অধিক জন্ম নাই, ইহা খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত হইতে পারে, কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের সিদ্ধান্ত এই, একবার জন্ম ও একবার মৃত্যু দ্বারা মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং এজন্মে নিরাকার উপাসনা করা গেল না বলিয়া কাহারও ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই। দ্বিতীয় কথা, যাঁহারা উক্তরূপ আপত্তি

জোর করিয়া উচ্চাধিকার লাভ করিলে কোন ফল হয় না।



করেন, তাঁহাদের আর একটি ভ্রমবিশ্বাস এই যে, মানুষ নিজে ইচ্ছা করিলেই বুঝি উপাসনার পথ নির্ব্বাচন করিতে পারে ; কত দিন পর্য্যন্ত সাকার উপাসনা করিয়া পরে নির্গুণোপাসনার অধিকারী হইতে পারিবে, ইহা যেন সেই উপাসকের নিজের বিবেচনার অধীন। যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা চিত্তশুদ্ধি কাহাকে বলে, তাহা জানেন না। চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়া নির্গুণোপসনার অধিকারী হইতে হইলে, কতদূর কৃচ্ছ্রসাধন করিতে হয়, ইহা তাঁহারা কিছুই জানেন না। কত কত জন্ম কঠোর তীব্র সাধনা দ্বারা মানুষ তাহার জীবভাব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে লয়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা কেবল হিন্দু যোগী জানেন। সাকার উপাসনা হইতে নির্গুণোপসনায় উন্নীত হওয়া আমরা ইচ্ছা করিলেই পারি না। তবে এক কথা এই, এজন্মে যতটুকু সাধনা দ্বারা যতদূর অগ্রসর হওয়া গেল, তাহা বিনষ্ট হইবে না, তাহা আত্মার গায়ে অক্ষয় অক্ষরে খোদিত হইয়া রহিল, পর জন্মে আবার প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হইবে না, এ জন্মে যতদূর উন্নতি হইয়াছে, ঐশ্বরিক চিরন্তন নিয়ম-বলে তাহার পর হইতে আরম্ভ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে। এইরূপে যখন নির্গুণোপাসনার জন্য চিত্তভূমি উপযুক্ত হইবে, তখন আপনা হইতেই বিষয়বাসনা সকল সমূলে বিনষ্ট হইবে, আপনা হইতেই সদ্গুরুর শুভসম্মিলন হইবে, আপনা হইতেই সাধনোপযোগী সুবিধা সকল সংঘটিত হইবে। তখন সাকার

চিত্তভূমি প্রস্তুত হইলে আপনা হইতেই উচ্চাধিকার জন্মে।

উপাসনা, সন্ধ্যাপূজা করিতে কোনই প্রবৃত্তি হইবে না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে কে পূজা অর্চ্চনা ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিল? তাঁহার জীবনী লেখক বলেন,—

"তিনি সময়ে সময়ে সমস্ত দিন পুষ্প চয়ন করিয়া কালীর পূজা করিতেন। একদিন দেখিলেন যে, যাঁহার জন্য পুষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাঁহারই শরীর এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। বৃক্ষ সকল ফলফুলে তাঁহার অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিনি এই দেখিয়া আপনি হাসিয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, "প্রসাদি ফুলে কি ক'রে পূজা করিব?" তদবধি পূজা করা বন্ধ হইয়া গেল।"

এইরূপে আমরা দেখিলাম, এ জীবনে নির্গুণোপাসনা করিতে পারিলাম না বলিয়া কাহারও ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। যখন যাঁহার চিত্তভূমি পরিষ্কৃত হইবে, তখন তাঁহাকে আপনা হইতেই নির্গুণোপাসনা অবলম্বন করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, কৃত্রিম উপায়ে নির্গুণোপাসনার অধিকারী হওয়া যায় না।

কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন, সাকার উপাসকগণ ত আজীবন এক ভাবেই সাকার উপাসনা করিয়া আসিতেছেন— কিন্তু কৈ কাহারও ত কোন চিত্তের উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা পূর্ব্বে যেরূপ বিষয়াসক্ত, এখনও ত সেই রূপই আছেন। তাঁহাদের নৈতিক জীবন পূর্ব্বে যেরূপ মলিন ছিল, এখনও ত তাই আছে। তবে সাকার উপাসনা দ্বারা কি ফললাভ হইল? ইহার উত্তর এই, আজ কাল হিন্দুসমাজে



অতি অল্প লোকেই শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া প্রকৃতরূপে সন্ধ্যাপূজাদি করিয়া থাকেন। ইহা সেই সকল উপাসকের দোষ, সাকার উপাসনার দোষ নহে।

## পুরাণ সকলের বিদ্বেষ ভাব।

নিরাকারবাদী বলেন,—

"পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রচলিত হিন্দুসম্প্রদায় সকলের মধ্যে মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহা কেবল বিবিধ হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যেই রহিয়াছে, এমন নহে, শাস্ত্রেও ঐ মতবিরোধ ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দৃষ্ট হইতেছে। বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়সকলের অবলম্বিত শাস্ত্রসকল পরস্পরের প্রতি সুতীক্ষ্ণ বাণ বর্ষণ করিতেছে। পরস্পরের ধর্ম্মমত ও উপাস্য দেবতার মাহাত্ম্যখর্ব্ব করিতে প্রয়াস পাইতেছে।"

ইতিপূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ তাঁহাদের উপাস্যদেবতাকে অন্যান্য দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্বেষ-বুদ্ধিমূলক নহে। তবে আধুনিক কোন কোন শাস্ত্রে অন্যান্য দেবতার গৌরবখর্ব্ব করিয়া তৎপ্রতিপাদ্য দেবতার গৌরববর্দ্ধন করিতে যে প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষজনিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যখন কোন জাতির অধোগতি হয়, তখন সেই অধোগতির ছায়া সেই জাতির সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়। যখন কালক্রমে হিন্দুসমাজের অধোগতি হইল, তখন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষভাব সমাজের মধ্যে বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইল। বলা বাহুল্য, সেই সময়ে প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ শাস্ত্রেও সেই

বিদ্বেষভাবসূচক শ্লোক সকল রচনা করিয়া প্রক্ষেপ করিয়া (interpolate) দিল। আজকাল যেমন মাসিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক সংবাদপত্র দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ভাব প্রচারিত হইতেছে, ইতিপূর্ব্বে পুরাণ সকলের দ্বারা সেইরূপ হইত। তাহাতে যে উদ্দেশে ও যে ভাবে পুরাণ সকল প্রথমতঃ রচিত হইয়াছিল, তাহার অনেক বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু সকলশাস্ত্রের মূলে এক বেদ, এক শ্রুতি—এক শ্রুতির দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার বিধি রহিয়াছে, ইহা স্মরণ করিলে এই সকল বিদ্বেষদ্বারা মূল সিদ্ধান্তের কোনই ব্যতিক্রম ঘটে না। আজকাল শাস্ত্রগ্রন্থের বহুল প্রচার ও ধর্ম্মোপদেশকগণের চেষ্টায় এই সকল বিদ্বেষভাব অনেক পরিমাণে কমিয়াছে। কালক্রমে ইহা আরও কমিয়া যাইবে আশা করা যায়।

## নববিধান মতের আলোচনা।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন নববিধান মতের প্রবর্ত্তক। নববিধানের সহিত সাধারণ ব্রাহ্মমতের কিছু তারতম্য আছে। সুতরাং নববিধান মত কি, তাহা না দেখিলে এ পুস্তকে ব্রাহ্মমতের আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিবে। সেই নববিধান মত কি, তাহা একবার দেখা যাউক।

পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, তাহাদের অসারভাগ ত্যাগ করিয়া সারভাগ গ্রহণপূর্ব্বক এই নববিধান মত গঠিত হইয়াছে। যে ধর্ম্মের মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে, তাহার সমবায়ে এই নূতন



ধর্ম্ম প্রস্তুত হইয়াছে। নববিধানমতে, হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও সাকার উপাসনার অন্যান্য অংশ অসার আর নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনাই এক মাত্র সার অংশ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইরূপে অন্যান্য ধর্ম্মের মধ্য হইতেও কেবল ঈশ্বরোপাসনার ভাগ খাঁটী ও তাহার আনুষঙ্গিক যাহা কিছু, তাহা অসার বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। কিন্তু সেই নিরাকার ঈশ্বরকে কি প্রণালীতে উপাসনা করিতে হইবে, তাহা স্থির করিতে গিয়া, অন্যান্য ব্রাহ্মের ন্যায় ইহাঁরাও প্রটেষ্টান্ট্ খ্রীষ্টানদিগের (Protestant Churchএর) প্রণালী গ্রহণ করিতেছেন। মোটের উপর ধরিতে গেলে নববিধানের মতও বিলাতী Theism মতের রূপান্তর মাত্র।

সকল ধর্ম্মের সারভাগ গ্রহণ, এই ধর্ম্মমত কেবল মতবাদ (in theory) বলিয়া ধরিলে, শুনিতে খুব ভাল লাগে। কিন্তু সাধনক্ষেত্রে (in practice) ইহার মূল্য কিছুই নাই। প্রত্যেক ধর্ম্মের মধ্যে যে বিশ্বজনীন সত্য নিহিত আছে, তাহা সাধকের জীবনে বিকাশ করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মের, সেই সম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করা একান্ত আবশ্যক। সেই ধর্ম্মের যাহা অসার বলিয়া বোধ হয়, তাহা সার বলিয়া স্বীকার করা নিতান্ত আবশ্যক। বস্তুতঃ এ সংসারে অসার কিছুই নাই; কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব, কি প্রকৃতিতত্ত্ব যে দিকে তাকান যায়, সর্ব্বত্রই দেখা যায় অসারের মধ্য হইতে সার উৎপন্ন হইতেছে; অসার ভিন্ন সারের উৎপত্তি হইতে পারে না; অসার দ্বারা সার পরি-

রক্ষিত হইতেছে। সুতরাং যাহা আপাততঃ অসার বলিয়া বোধ হইতেছে, জ্ঞানের চক্ষে তাহাই সার।* ফুলগাছে ফুল ফুটিয়াছে, ফুল দেখিতে সুন্দর। এখন সেই ফুল কি আকাশ হইতে পড়িয়াছে? না, সেই গাছের মূল গুঁড়িরূপে, গুঁড়ি ডালরূপে, ডাল শাখারূপে, শাখা পত্ররূপে, পত্র ফুলরূপে পরিণত হইয়াছে? সেই মূল, গুঁড়ি, ডাল, শাখা, পত্র আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু যে ফুলের সৌন্দর্য্যে আমরা মোহিত হইতেছি, সেই ফুল কোথা হইতে আসিল? এখন সেই গাছের মধ্যে ফুলই সার বস্তু, না মূল, গুঁড়ি, ডাল, শাখা, পত্র ইহারা সকলেই সারবস্তু? নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে মুক্তি হয়, হিন্দুধর্ম্মের ইহাই সার সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান

* মহাপণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেন্সার্ বলেন :—

There are three cardinal facts ;—"The first is that with which we set out, namely, the existence of a fundamental verity under all forms of religion, however degraded. In each of them there is a soul of truth...The second of these cardinal facts set forth at length in the foregoing section is that while these concrete elements, in which each creed embodies this soul of truth, are as bad as measured by our absolute standard, they are good as measured by a relative standard. Though from higher perceptions they hide the abstract verity within them, yet to lower perceptions they render the verity more appreciable than it would otherwise be. They serve to make real and influential over men that which would



লাভ কি আকাশ হইতে আসে? না, বহুজীবনব্যাপী, বহুজন্মব্যাপী সাকার সাধনা দ্বারা হইয়া থাকে? সকল ধর্ম্ম সম্বন্ধেই এইরূপ। মূলকে ফুলে পরিণত হইতে হইলে তাহাকে কোন বিশেষ শাখার, বিশেষ প্রশাখার মধ্য দিয়া ক্রমোন্নতির নিয়মানুসারে হইতে হইবে। সেইরূপ মোক্ষার্থীকে প্রচলিত কোন বিশেষ ধর্ম্মের, বিশেষ সম্প্রদায়ের আনুগত্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

নববিধান মত যে কার্য্যক্ষেত্রে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা সহজে দেখা যাইতেছে। এই মতের প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মহাত্মা

else be unreal and uninfluential, or we *may call them protecting envelopes without which the contained truth would die. The remaining cardinal fact is that these various beliefs are parts of the constituted order of things* ; *and not accidental, but parts.* Seeing how one or other of them is everywhere present, is of perennial growth ; and when cut down, redevelops in a form slightly modified ; we cannot avoid the inference *that they are needful accompaniments of human life*, severally fitted to the Societies in which they are indigenous.—" *First Principles* pp. 121—122. ( The Italics are ours ).

অতএব আমরা দেখিলাম, হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে, কোন ধর্ম্মের কিছুই অসার নহে, কোন ধর্ম্মের মধ্য হইতেই কিছু অসার বলিয়া পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। "When cut down, redevelops in a form slighty modified."—নিরাকারবাদীর গানে ও বক্তৃতায় নিরাকার ব্রহ্মের যে হস্তপদ ও মুখ কল্পিত হয়, তাহার কারণ এই নহে কি?

কেশবচন্দ্র সেনের জীবন কালে, কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্ম্ম-জীবনের জন্য এই মত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর অতীত হইতে না হইতেই নববিধানের ভগ্নদশা উপস্থিত হইয়াছে। তাহা হওয়াই স্বাভাবিক। মহাজনগণ বিভিন্ন ধর্ম্মমতকে নদীর গতির সহিত তুলনা করিয়াছেন। কোন নদী সোজা চলিতেছে, কোন নদী বাঁকা চলিতেছে, এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন গতিতে, ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া, সকল নদীই এক সমুদ্রে পতিত হইতেছে। এখন যদি কোন ইঞ্জিনিয়ার বলেন, সকল নদীই এক পথে চলিবে; তিনি যদি গঙ্গা, মহানদী, গোদাবরী, সিন্ধু প্রভৃতি সকল নদীর জল প্রবাহিত হওয়ার জন্য একটা নূতন খাত কাটিয়া দেন, তাহার ফল কি হইবে? প্রাকৃতিক নিয়মের বলে সে খাত ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সকল নদীই নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হইবে। কাহার সাধ্য প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারে? তুমি ফুলের বাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলে, ভিন্ন ভিন্ন গাছে ভিন্ন ভিন্ন ফুল ফুটিয়া বাগান উজ্জ্বল করিয়াছে। তুমি মনে করিলে, এই সকল ফুল যদি ভিন্ন ভিন্ন গাছে না ফুটিয়া কেবল এক গাছে ফুটিত, তাহা হইলে আরও কত শোভা হইত! তোমার মনে যখনি এই ভাব হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ কার্য্যে পরিণত করিলে। তুমি একটি বটগাছ সেই বাগানের মধ্যস্থানে রোপণ করিয়া গোলাপ, মল্লিকা, বেল, যুঁই, কামিনী, চাঁপা, চামেলী, গন্ধরাজ, জবা প্রভৃতি যেখানে যে গাছে যে ফুল ছিল, সে সকল তুলিয়া আনিয়া বট-



গাছের ডালে ডালে গুঁজিয়া দিলে,—সে বটগাছের শোভা আর ধরে না! কিন্তু হায়! পরদিন প্রভাতে আসিয়া তুমি দেখিলে, যেমন বটগাছ তেমনি বটগাছই পড়িয়া আছে, সে শোভা আর নাই, সে সকল ফুল শুকাইয়া গিয়াছে; কিন্তু সেই ভিন্ন ভিন্ন গাছে আবার নূতন ফুল ফুটিয়াছে। তোমার সকল ফুলগাছকে এক করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বৃথা হইল। এই ফুলগাছ সম্বন্ধে যাহা ঘটিল, আজ নববিধান সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছে। কার সাধ্য প্রকৃতির নিয়মের অন্যথা করিতে পারে? বৈষম্য সৃষ্টির অবস্থা, সাম্য লয়ের অবস্থা—ইহাই চিরন্তন প্রাকৃতিক নিয়ম।

---

# উপসংহার

## সমন্বয় সাধনের চেষ্টা।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন তাঁহার নববিধান দ্বারা সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা অসম্ভব হইলেও তাঁহার উদ্যম আর একভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় নাই। কালক্রমে সাকারবাদী ও নিরাকারবাদিগণের মধ্যে উপাস্য ও উপাসনা বিষয়ে মতবৈষম্যের তীব্রতা হ্রাস হইয়া এখন তাহা সমন্বয়ের দিকে আসিয়াছে।*

* ৺রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উদার মত এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার মত পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

(১) সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয়েই এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাসনা করেন। কিন্তু সেই ব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। শ্রুতিকে অবলম্বন করিয়া সাকারবাদী বলেন, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ, তিনি অবাঙ্‌মনসগোচর, তাঁহাকে জানিবার কোন উপায় নাই, তাঁহার উপাসনাও সম্ভবপর নহে। নিরাকারবাদী, পাশ্চাত্য দার্শনিক পণ্ডিত হিগেলের মতানুসারে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়া, বলেন ব্রহ্ম স্বরূপতঃ নির্গুণ নহেন সগুণ; জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, subject ও object এর মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য। সেই সগুণ ব্রহ্মই উপাস্য।

(২) কিন্তু সাকারবাদীও ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ নির্গুণ বলিয়া আবার তাঁহার সগুণভাবও স্বীকার করেন। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মায়ার আশ্রয়ে সগুণভাব ধারণ করেন তখন তিনি ঈশ্বর ভগবান্ পুরুষোত্তম প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। দ্বৈতবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় নিরাকারবাদীদিগের ন্যায় ব্রহ্মের এই সগুণভাবই নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন। সাধারণতঃ সাকারবাদিগণ এই সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করেন। সুতরাং উপাস্য বিষয়ে সাকারবাদী ও নিরাকারবাদীর মধ্যে প্রকৃতরূপে কোন পার্থক্য নাই।

(৩) সাকারবাদী উপাসনাতে একটি অবলম্বনের আবশ্যকতা স্বীকার করেন। নিরাকারবাদীও একটি অবলম্বন চান। সাকারবাদীর সেই অবলম্বন তাঁহার ইষ্টদেবতা, অর্থাৎ সগুণ



ঈশ্বরের একটি মানসীমূর্ত্তি। নিরাকারবাদীর অবলম্বন নিরাকার পরম পুরুষ (personal god); নিরাকারবাদী সেই পরমপুরুষে প্রেম, দয়া, জ্ঞান প্রভৃতি মানবীয় ধর্ম্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সাকারবাদীও তাঁহার ইষ্ট দেবতাতে এই সকল গুণের অস্তিত্ব স্বীকার করেন,—অধিকন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে রূপ বা আকারও স্বীকার করেন। কারণ আকার বাদ দিয়া গুণের অস্তিত্ব আমাদের চিন্তার বহির্ভূত (inconceivable). নিরাকারবাদীর মতে ঈশ্বরের নাম আছে, রূপ নাই। সাকারবাদী বলেন, যেখানে নাম এবং গুণ আছে সেখানে রূপও আছে। নিরাকারবাদী স্পষ্টতঃ ঈশ্বরের রূপ স্বীকার না করিলেও প্রকারান্তরে স্বীকার না করিয়া পারেন না। তিনি ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ আকৃতি বা মূর্ত্তি দর্শন করিয়া উপাসনা না করিলেও জড়জগতে তাঁহার অনন্ত রূপ কল্পনা করিয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। ব্রাহ্মসঙ্গীতগুলি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হওয়ার কারণ এই যে, তাহাতে জড়জগতের সৌন্দর্য্য ও সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের লীলা বর্ণনা করা হইয়াছে। অনেকগুলি সঙ্গীতে ঈশ্বরের হস্ত পদ মুখাদি কল্পনা করা হইয়াছে। মানুষ স্বভাবতঃ রূপের মোহে মুগ্ধ, রূপের সহিত মিলিতভাবে ঈশ্বরের লীলা কীর্ত্তন করা হয় বলিয়া ব্রহ্মসঙ্গীত এত মনোরম। যাহা হউক নিরাকারবাদী যদি ঈশ্বরের কেবল গুণ চিন্তা ও নামকীর্ত্তন করিয়াই তৃপ্তিলাভ করেন, তবে তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাকারবাদীদিগের মধ্যেও এরূপ কোন কোন

সম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা রূপচিন্তার আবশ্যকতা স্বীকার করেন না, কেবল নাম সঙ্কীর্ত্তন দ্বারাই তাঁহারা উপাসনা করিতে ভালবাসেন। আবার কেহ কেহ বা কেবল নামজপ দ্বারাই উপাসনা করেন, ঈশ্বরের কোন মূর্ত্তি ধ্যান করেন না।

(৪) সাকারবাদিগণ উপাসনার সুবিধার জন্য কখন কখন আর্টের ( art ) সাহায্য গ্রহন করেন। অর্থাৎ উপাসক তাঁহার ইষ্ট দেবতার মানসীমূর্ত্তিকে শিল্পকলার সাহায্যে পট বা প্রতিমা রূপে নয়নগোচর ( Visualise ) করিয়া তাঁহার উপাসনা করেন। ইহাতেই নিরাকারবাদীর ঘোর আপত্তি। কিন্তু একটু বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাতে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। আমরা মনে মনে যাহা চিন্তা করি, ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারি; আবার ভাষায় যাহা ব্যক্ত করি, চিত্র সাহায্যে তাহা অধিকতর পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করা যায়। ঈশ্বরের যদি প্রকৃতই বিশেষ বিশেষ গুণ থাকে, তবে তাহা যেমন ভাষায় ব্যক্ত করা যায়, তেমন চিত্র সাহায্যে তাহা আরও উত্তমরূপে ব্যক্ত করা যায়। সাকারবাদী যদি তাঁহার সাধনের সুগমের জন্য সেইরূপ আর্টের সাহায্য গ্রহণ করেন, তবে তাহাতে নিন্দার বিষয় কি ?

(৫) নিরাকারবাদী ঈশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করেন। সাকারবাদী যদি সেই সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরকে প্রতিমায় অধিষ্ঠিত জানিয়া তাঁহার পূজা করেন, তবে তাহাতেই বা দোষ কি ? নিরাকারবাদিগণ এই বাহ্য পূজাকেই পৌত্তলিকতা বলেন। আবার এরূপ নিরাকারবাদীও আছেন, যাঁহারা ধ্যান ধারণার আবশ্যকতাও স্বীকার করেন না। তাঁহাদের উপাসনা প্রণালী সংক্ষেপতঃ প্রটেষ্ট্যাণ্ট্ (protestant) খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের অনুকরণে সকলে মিলিত হইয়া ধন্যবাদ দেওয়া ও নামকীর্ত্তন করা। ইহাতেই যদি তাঁহাদের মনে ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হয় তবে তাহাতেই বা ক্ষতি কি ? আবার সাকারোপাসকের মনে যদি বাহ্যপূজা দ্বারা ভক্তির সঞ্চার হয়, নিরাকারবাদীর তাঁহাকে সেজন্য নিন্দা করা উচিত নহে। কারণ ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম অতি সুদুর্ল্লভ বস্তু। যাঁহার চিত্তে তাহা জন্মে তিনিই ধন্য। যে উপায়েই তাহা উৎপন্ন হউক, তাহা লইয়া আমাদিগের বাগ্‌বিতণ্ডা করার প্রয়োজন নাই।

আর একটি বিষয় চিন্তা করিলেও এই সমন্বয়ের পথ আরও সুগম হইবে। তাহা হইতেছে,

### ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা হিন্দু সমাজের উপকার স্মরণ।

ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা দ্বারা হিন্দু সমাজের দুইটি উপকার সাধিত হইয়াছে। যে সময়ে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই সময়ে হিন্দু সমাজের যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা একবার স্মরণ করা আবশ্যক। আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা, অবাধ মুদ্রাযন্ত্রের দ্বারা শাস্ত্রগ্রন্থের প্রচার ও শাস্ত্রাচার্য্যগণের উপদেশ দ্বারা অনেকেই হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে

পারিতেছেন। কিন্তু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে এ সকলের কিছুই ছিল না। হিন্দু সমাজের অধিকাংশ লোকেই হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল অন্ধ বিশ্বাসের সহিত বাহ্য আচার অনুষ্ঠান রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। সেই সময়ে খ্রীষ্টান্ মিশনারিগণের প্রাদুর্ভাব হইল। তাঁহাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য ও পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান দ্বারা এ দেশে এক নূতন আলোকশিখা প্রজ্বলিত হইয়াছিল। অন্ধকার হইতে হঠাৎ আলোকে আসিলে যেমন চক্ষে ধাঁদা লাগে, সেইরূপ তখন অনেকের চক্ষে পাশ্চাত্য আলোকের ধাঁদা লাগিয়াছিল। তাহার ফলে এ দেশের অনেকানেক লোক খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। দেশের এই দুরবস্থা দর্শনে স্বদেশপ্রাণ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের মনে বড়ই আঘাত লাগিয়াছিল। সেই খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রোতকে বাধা দেওয়ার জন্য তিনি হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থ অবলম্বনে খ্রীষ্টধর্ম্মের অনুরূপ এই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। হিন্দুগণের প্রতিমা পূজাই মিসনারিগণের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য স্থল ; এই ব্রাহ্মধর্ম্মে তাহা রহিত করা হইল। তখন যে সকল হিন্দুর মন খ্রীষ্টানদিগের উপদেশে বিচলিত হইয়াছিল, তাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রতিমা পূজা না থাকাতে ইহা নিরাপত্তিতে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবাহ এদেশে এক প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইল। কে বলিতে পারে, সে সময়ে এইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত না হইলে, অধিকাংশ হিন্দু সমাজ খ্রীষ্টান সমাজে পরিণত



হইত না ? হিন্দু সমাজকে খ্রীষ্টধর্ম্মের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভগবদিচ্ছায় এই ব্রাহ্মধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়াছিল। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সাধু পুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার দ্বারা এই ভগবদিচ্ছা সংসাধিত হইয়াছিল। খ্রীষ্টধর্ম্মের আক্রমণ হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া সমগ্র হিন্দু সমাজ ব্রাহ্ম সমাজের নিকট ঋণী। বিশেষতঃ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ঋণ হিন্দু সমাজ কখনও শোধ করিতে পারিবে না ।

আরও একটি কারণে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি হিন্দুসমাজের এই ঋণভার বর্দ্ধিত হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্ম খ্রীষ্টধর্ম্মকে দূরে রাখিয়া যেমন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছেন, সেইরূপ হিন্দুসমাজের মধ্যে শাস্ত্রশিক্ষা ও উপদেশ প্রবর্ত্তনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুসমাজের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্মের যে পুনরুত্থান প্রবাহ বিগত ৪০ বৎসর যাবৎ হিন্দুসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাদিগকে স্বধর্ম্মে জাগ্রত ( self-conscious ) করিয়া তুলিয়াছে, তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিপরীত মতবাদের আঘাত দ্বারা শক্তিসঞ্চয়ের ( conservation of energy ) ফল। ব্রাহ্মধর্ম্ম উৎপন্ন না হইলে কখনও এই পুনরুত্থান প্রবাহ প্রচলিত হইয়া হিন্দু সমাজে শাস্ত্র শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও পূর্ব্বসঞ্চিত আবর্জ্জনা রাশি ধৌত করিত না। এই কারণেও হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের নিকট বিশেষরূপে ঋণগ্রস্ত।

## ঋণশোধের উপায়।

সেই ঋণ কি প্রকারে শোধ হইতে পারে? না ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে স্থান দেওয়া দ্বারা। পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মগণ হিন্দুসমাজকে আর বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন না। অনেক খ্যাতনামা ব্রাহ্ম হিন্দু-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হিন্দুসমাজে পুনঃ প্রবেশ করিয়াছেন। যাঁহারা পৃথক হইয়া আছেন, তাঁহাদেরও মতবাদের তীব্রতা হ্রাস হইয়াছে। আবার এরূপ দেখা যাইতেছে, কোন কোন ব্রাহ্মের পুত্রসন্তানগণ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি আস্থা না রাখিয়া হিন্দু-ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন। কোন কোন ব্রাহ্ম হিন্দুনামে পরিচিত হইবার জন্য লালায়িত। তাঁহাদের সেই অভিপ্রায় হইতে ব্রাহ্মবিবাহবিষয়ক আইন সংপ্রতি সংশোধিত হইয়াছে। এইরূপে যে সকল ব্রাহ্ম হিন্দু-ধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত, সম্ভবপর হইলে তাঁহাদিগকে স্থান দেওয়াই কর্ত্তব্য। নিরীশ্বরবাদী উপাসকগণ যে উদার ও বিশাল হিন্দু-ধর্ম্মের ক্রোড়ে স্থান পাইয়াছেন, কোন কোন বিষয়ে বৈদিক-ধর্ম্মের বিরোধী হইয়াও বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়া আছেন, নিরাকারবাদী উপাসকগণের সেখানে স্থান পাওয়ার বাধা কি? নিরাকারবাদিগণ হিন্দুদিগকে পূর্ব্বে পৌত্তলিক বলিয়া যেরূপ ঘৃণা করিতেন, পরস্পর ভাবের আদান প্রদান দ্বারা উদারতা ( toleration ) বৃদ্ধি পাইলে সে ঘৃণাও থাকিবে না। তাঁহাদের একটা কথা স্মরণ করা উচিত। কেবল হিন্দুধর্ম্ম



কেন, জগতের যে কোন ধর্ম্ম প্রগাঢ় ভক্তির সহিত অনুষ্ঠিত হইলে তাহা পৌত্তলিকতা অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না। আমাদের এই পৌত্তলিকতা পাশ্চাত্য সভ্যতার চক্ষে নিন্দনীয় হইলেও তাহা আমাদের দোষ নহে, একটি বিশেষ গুণ। এমন কি স্বামী-স্ত্রীর প্রেম কিম্বা পিতামাতার প্রতি ভালবাসাও যদি সাধারণের অনুমোদিত ও অনুষ্ঠিত সীমা অতিক্রম করে, তাহাও পাশ্চাত্য জগতে এই পৌত্তলিকতার ( idolatry ) মধ্যে গণ্য। ইংরেজী অভিধানে idolatry শব্দের অর্থ excessive love ( অতিরিক্ত ভালবাসা )। সুতরাং কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের প্রতি মনপ্রাণ সমর্পণ করিতে হইলে, এই পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায় নাই। আমাদের এই পৌত্তলিকতা অপবাদ অঙ্গের ভূষণ হউক! হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ! আসুন আমরা সকলে একমনে একপ্রাণে এই পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করি!! বিশ্বনিয়ন্তা সদাশিব আমাদিগকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করুন!!!

"সনো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

ইতি জেলা ফরিদপুর বাউবথালিগ্রামনিবাসী—
শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুচরণারবিন্দমধুপ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ বিরচিত
সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার

সমাপ্ত

"ব্রহ্মার্পণমস্তু"।

---

# পরিশিষ্ট।

( ক ) জ্ঞানের উৎপত্তি (theory of knowledge. ) সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের মত।

( খ ) স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণপরমহংসের সাকারোপাসনা সম্বন্ধে মত।

( গ ) কয়েকটি বিরুদ্ধ সমালোচনা ও তাহার উত্তর।

## ( ক ) জ্ঞানের উৎপত্তি ( theory of knowledge )

### স্পিনোজা ( Spinoza )

স্পিনোজার মতে মাত্র একটি পদার্থের অস্তিত্ব আছে—তাহা অনন্ত, দিব্য বস্তু (substance). তাহার দুইটা দিক,—জড় ও চৈতন্য (body & Soul ), এই একই বস্তুকে বিস্তৃতির (extension) দিক হইতে দেখিলে, ইহাকে জড় বলা যায়, আবার মননের দিক হইতে দেখিলে ইহাকে চৈতন্য ( spirit ) বলা হয়। ইনি বিশ্বের একমাত্র কারণ, কিন্তু স্বয়ংভূ, অর্থাৎ ইঁহার অন্য কারণ নাই। ইঁহারই নাম ঈশ্বর। ঈশ্বর অনন্ত, সেইজন্য তাঁহার গুণ ( attributes ) ও অনন্ত। কিন্তু মানুষের মন কেবল তাঁহার দুইটি গুণ জানিতে পারে—মনন (thought) এবং বিস্তৃতি (extension). স্পিনোজার মতে সদ্‌বস্তুর ন্যায় এই সকল গুণেরও প্রকৃত অস্তিত্ব আছে। দেহ ভিন্ন idea থাকিতে পারে না, আবার idea ভিন্ন দেহও থাকিতে পারে না। জ্ঞানলাভের তিনটি মনোবৃত্তি আছে—(১) ঐন্দ্রিয়িক অনুভূতি ( Sensuous representation ), ( ২ ) বিচার ( Reason ) এবং ( ৩ ) পরোক্ষানুভূতি ( Intuition). মন বহির্জ্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা idea সংগ্রহ করে, পরে বিচারের দ্বারা তাহা হইতে যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। পরোক্ষানুভূতি বিচারের উপর নির্ভর করে না, তাহা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান।

### ডেকার্টিস্ ( Descartes )

ডেকার্টিস্ সন্দেহবাদী। তিনি বিনা প্রমাণে ঈশ্বরের সত্তা অথবা বাহ্য জগতের অস্তিত্ব কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজি নহেন। কেবল একটি বিষয় তিনি বিশ্বাস করেন—অর্থাৎ "আমি সন্দেহ করিতেছি"—"আমি



চিন্তা করিতেছি সুতরাং আমার অস্তিত্ব আছে" ( "Cogito ergo Sum" ) কিন্তু আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধে এই যে ধারণা ( idea ) তাহা কোথা হইতে আসিল ? প্রত্যেক 'আইডিয়ার' ( idea ) একটা কারণ আছে। "That every idea must have a cause follows from the clear and distinct principle "nothing produces nothing", এইরূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা আমরা বহিরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাই না ; তাহা আমাদের অন্তরে নিহিত থাকে। বহির্জ্জগতের যে অস্তিত্ব আছে তাহা আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জানিতে পারি। ডেকার্টের মতে আমাদের জ্ঞান দুই প্রকার—"actiones" ও "passiones"—আত্মা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে 'actiones' বলে, আর বহির্জ্জগতের ক্রিয়াদ্বারা যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহাকে passiones বলে। জ্ঞানের ক্রিয়া ছয় ভাগে বিভক্ত—the external senses, the natural appetites, the passions, imaginations, intellect or reason, will. তাঁহার মতে ideas তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—innate, adventitious and ipsefacto.

স্পিনোজার ন্যায় ডেকার্টিস্ ও একমাত্র Substance বা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাহার নাম ঈশ্বর। কিন্তু তিনি আবার mind ও body—মন ও বহির্জ্জগতকে দুইটি পৃথক বস্তু বলেন। বহির্জ্জগতের মনের উপর ক্রিয়াদ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

### Locke ( লক্ )

লকের মতে আমাদের কোন ideaই সহজাত নহে। আমাদের সর্ব্ব-প্রকার জ্ঞান বহির্জ্জগৎ হইতে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উৎপন্ন হয়। জন্মের পরে মানুষের মন একখানা সাদা কাগজের মত থাকে, তাহার উপরে

চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপরসাদি বহির্জ্জগতের ছাপ পড়ে। পরে মন চিন্তাশক্তির সাহায্যে সেই সকল বহির্জ্জগতের চিত্রের দ্বারা নূতন নূতন ভাবের ( ideas ) উদ্ভাবন করে। এই সকল idea দুই শ্রেণীর—Simple ( সরল ) ও Complex ( জটিল )—প্রথম শ্রেণীর ভাব সকল বহির্জ্জগতের পদার্থ সকলের সহিত মিলিয়া যায় ; কারণ সেগুলি বহির্জ্জগতের পদার্থসকলেরই চিত্র। কিন্তু জটিল ভাবসকলের অনুরূপ বহির্জ্জগতে কোন পদার্থ নাও থাকিতে পারে। এইরূপ বহির্জ্জগতের জ্ঞান ভিন্ন আমাদের নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা জ্ঞান আছে, তাহা আমাদের সহজাত। আর ঈশ্বর সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয় তাহা বিচার দ্বারা উৎপন্ন ( demonstrative ).

## বার্কেলি ( Berkeley )

বার্কেলি বলেন বহির্জ্জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। যত কিছু জ্ঞান আমাদের মনেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু মনের মধ্যে সহজাত কোন জাতিবাচক বা গুণবাচক (abstract or general ideas) ভাব থাকিতে পারে না। 'মানুষ' বলিতে স্ত্রীপুরুষ, বালক বালিকা, বৃদ্ধ—ইহাদের একটা সাধারণ নাম বুঝায় ; কিন্তু মানুষ কথাটি মনে ধারণা করিলে, আমরা কোন বিশেষ বয়স, বিশেষ আকারের ব্যক্তি বিশেষকেই মনে ভাবি। আমাদের মনে মানুষ সাধারণ বলিয়া কোন পদার্থের ধারণা হয় না। তবে মনুষ্য জাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে আমরা প্রতীক ( Symbol ) স্বরূপ মানুষ শব্দ ব্যবহার করিতে পারি। বহির্জ্জগতে একটা বৃক্ষ আছে আমি দেখিতেছি, কিন্তু উহা যে আছে আমি কি প্রকারে জানিলাম ? কারণ আমি উহা দেখিতেছি। সুতরাং উহা আমি দেখিতেছি বলিয়াই উহা আছে ; আমি না দেখিলে যে উহা আছে



তাহার প্রমাণ কি ? এইরূপ যুক্তিদ্বারা বার্কেলি বলেন—"It is a contraditiction to suppose that an object can exist imperceived"—কেহ দেখিতেছে না, অথচ একটা পদার্থ আছে, এরূপ কথা স্বতঃ বিরুদ্ধ। আমাদের মনের মধ্যে যে সকল ভাব ( ideas ) আছে, যে সকল চিত্র আছে, কেবল তাহাদেরই প্রকৃত অস্তিত্ব স্বীকার করা যায়। তাহাদের বহির্জ্জগতের কোন অবলম্বনের প্রয়োজন নাই, মনই তাহাদের একমাত্র অবলম্বন। বহির্জ্জগতের কোন পদার্থ যখন মনের মধ্যে সশরীরে প্রবেশ করে না, অথবা মনের মধ্যে idea ( ভাব ) সৃষ্টি করে না, একমাত্র মন বা আত্মা হইতেই যখন জগতের উৎপত্তি প্রমাণিত হয়, তখন ঈশ্বর যে একটা মনের অতিরিক্ত বহির্জ্জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিবার প্রয়োজন কি ? যদি বল, আমরা না দেখিলেও পদার্থের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে কিন্তু সে কোথায় থাকে ? বাহিরের জগতে থাকে না, থাকে অন্য লোকের মনে—আত্মসমষ্টিতে বা আত্মার সমুদ্রস্বরূপ ঈশ্বরের মধ্যে।

## হিউম ( Hume )

হিউম বার্কেলির ঠিক বিপরীত কথা বলেন। তাঁহার মতে বহির্জ্জগতের জড়পদার্থ সকলই মনের উপর impression ( দাগ ) উৎপাদন করে ; তাহা হইতে ideas জন্মে। "Every idea is an image or copy of an impression"—প্রত্যেকটি ভাবই বহির্জ্জগতের একটি চিত্র বিশেষ। সেই সকল বিভিন্ন চিত্রের সংযোগ বিয়োগ দ্বারা জ্ঞান ( experience ) উৎপন্ন হয়। বুদ্ধি সেই সকল experience এর মধ্য হইতেই বিশ্লেষণ দ্বারা নূতন তথ্য আবিষ্কার করে ; ( all judgments are analytic, synthetic judgments rest on experience )

বহির্জ্জগৎ হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান ভিন্ন মন অন্য প্রকার জ্ঞান উৎপাদন করিতে পারে না। সেই জ্ঞানের বস্তু হইতে যে সকল সিদ্ধান্ত করা হয়, তাহাতে কোন নূতন তথ্য উদ্ভাবিত হয় না। বহির্জ্জগতের লব্ধ জ্ঞান ভিন্ন আমরা যদি কোন নূতন সিদ্ধান্ত উদ্ভাবন করি, তবে তাহা কেবল কল্পনা দ্বারা, অথবা আমাদের বিশ্বাসের ( belief ) দ্বারা। তাহার কোন বাস্তব সত্তার প্রমাণ নাই। কতকগুলি গুণ এক সঙ্গে মিলিত দেখিয়া আমরা তাহাকে একটা বস্তু সংজ্ঞা দান করি; তাহার কারণ সেই সকল গুণ সর্ব্বদাই সেই একস্থানে আমরা মিলিত দেখি। এইরূপ আমরা মানসিক গুণসকলের একটা সমষ্টির নাম দেই আত্মা। সেই গুণসমষ্টি ভিন্ন অন্য কোন প্রকার স্থায়ী আত্মা আছে কিনা আমরা তাহা জানি না।

আমরা দেখিলাম উল্লিখিত দার্শনিকদিগের বিবাদ প্রধানতঃ একটি বিষয় লইয়া। এক দল বলেন আমাদের যত কিছু জ্ঞান সব মন হইতে উৎপন্ন, ইঁহাদিগের এই মতকে idealism or rationalism বলে; বার্কেলি এই দলের প্রধান। অন্য সম্প্রদায় বলেন, আমাদের জ্ঞান বহির্জ্জগৎ হইতে উৎপন্ন; ইঁহাদিগের মতকে realism or empericism বলে; হিউম এই দলের প্রধান। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা ইস্যু ধার্য্য করিয়া মহামতি ক্যাণ্ট্ ( Kant ) এই বিবাদের মীমাংসা করেন। তাঁহার মীমাংসাই পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ একপ্রকার সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার সেই ইস্যু এই :—

"Are all our ideas the result of experience, or are they wholly or in part an original possession of our mind ?" অর্থাৎ আমাদের সমস্তপ্রকার জ্ঞান বহির্জ্জগৎ হইতে উৎপন্ন, অথবা তাহারা সম্পূর্ণরূপ অথবা আংশিকরূপে আমাদের মন হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ আমাদের সহজাত ?



ক্যাণ্ট্ বলেন উভয় পক্ষের দাবিই অসঙ্গত। যাঁহারা বলেন, আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই বহির্জ্জগৎ হইতে experience (ভূয়োদর্শন) দ্বারা উৎপন্ন তাঁহারা একটা মস্ত ভুল করেন। Necessary and universal truths অর্থাৎ চিরন্তন সত্য সকল এরূপভাবে জন্মিতে পারে না। আবার পক্ষান্তরে কেবল মানসিক চিন্তা দ্বারা বহির্জ্জগতের পদার্থসকল উৎপন্ন হইতে পারে না। ক্যাণ্টের মতে উভয় মতের সম্মিলন দ্বারাই প্রকৃত সত্য পাওয়া যায়।—"Neither sense alone nor the understanding alone produces knowldge, but both cognitive powers are necessary, the active and the passive, the conceptual and the intuitive" অর্থাৎ জ্ঞান লাভের জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের যেরূপ আবশ্যকতা, সেইরূপ বুদ্ধিরও আবশ্যকতা; ইন্দ্রিয় সকল বহির্জ্জগৎ হইতে জ্ঞানের বস্তু সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বুদ্ধির নিকট ধরিয়া দেয়, বুদ্ধি তাহা লইয়া concept অথবা ideas (জ্ঞান) গঠন করে। যে প্রণালীতে এই প্রকার জ্ঞান লাভ হয় তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

## ক্যাণ্ট ( Kant )

ক্যাণ্টের মতে আমাদের জ্ঞেয় বস্তু সকল বহির্জ্জগৎ হইতে আসে, তাহারা দেশ ও কালের ( space & time ) দ্বারা রূপান্তরিত হইয়া বুদ্ধির ( understanding ) কোঠায় পড়ে, এবং সেখানে বুদ্ধির যে সকল অবয়ব ( categories ) আছে, তাহাদের ছাঁচে ঢালা হইয়া যায়। আমাদের হিন্দুদর্শনশাস্ত্র অনুসারে মন বুদ্ধি ইহারা সূক্ষ্ম জড় পদার্থ, সুতরাং ইহারা অনায়াসেই বাহ্য বস্তুর ( phenomena ) আকারে আকারিত হইতে পারে। কিন্তু ক্যাণ্ট্ বুদ্ধিকে জড় বলিয়া

স্বীকার করেন না। সেজন্য তাঁহাকে একটা সমস্যায় পড়িতে হইয়াছে, বাহিরের জড়পদার্থ (Phenomena) কি প্রকারে চিৎস্বরূপ অন্তঃকরণে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে? ("How can sensible objects be sub-sumed under intelligible notions? How can the categories be applied to objects?)" ইহার উত্তরে, তিনি বলেন, জড় ও চিৎ বস্তুর মধ্যে মিলন ঘটাইবার জন্য একজন ঘটক আছেন, তাঁহার নাম কাল (time), তিনি বরের মাসী আবার কন্যারও পিসী। তিনি যেমন মনের অন্তঃপুরে থাকেন, তেমন আবার পরদার বাহিরে অর্থাৎ বহির্জ্জগতেও আনাগোনা করেন। তিনি অন্তঃপুরে থাকেন বলিয়া categoryদের সঙ্গে যেমন সমধর্ম্মা, আবার বাহিরের বস্তুসকলকে ও মনের অন্দরে আসিতে হইলে তাঁহার সহিত ভাব না করিয়া আসিতে পারে না।

("A quality of time such as simultaneousness is, as *a-priori* on one side homogeneous with the categories; while on the other side, in as much as all objects can be perceived in time, it is homogenous with the objects"—*Schwegler* p. 222) এইরূপে 'কাল'ত ঘটকালি করিলেন, কিন্তু category রূপ ক'নেকে সাজাইবে কে? ক'নে উপযুক্ত বেশে না সাজাইলে বর (object) তাহাকে যদি গ্রহণ না করে? ক'নের একজন অনুচরী আছে তাহার নাম ছায়া (schema) তাহার উপর এই ভার পড়িল।

"The schema is a product of imagination, which spontaneously determines inner sense so; but the schema is not to be confounded with the mere image.



The latter is always an individual perception, the former on the contrary, is a universal form which imagination produces, as picture of a category through which the category itself becomes capable of application to the appearance in sense"—*I bid*

এই 'স্কিমা' বা ছায়া কোন বস্তু বিশেষের চিত্র নহে, কিন্তু অনেক গুলি সমজাতীয় বস্তুর একটা সাধারণ চিত্র—ত্রিভুজ বলিতে যেমন সমকোণ, দ্বিসমকোণ, অসমকোণ ত্রিভুজের একটা সাধারণ চিত্র; অথবা কুকুর বলিতে নানা জাতীয় দেশীয় বিদেশীয় কুকুরের একটা সাধারণ চিত্র—সেইরূপ। কল্পনার সাহায্যে ইহা category কে আপনার সাজে সাজাইয়া লয়। তখন বর বধূকে পছন্দ না করিয়া পারে না এবং উভয়ের মিলনে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি।

এই ধরুন বাহিরে একটা জিনিষ আছে, আমার চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয় তাহার নানা প্রকার impression আমার মস্তিষ্কে ও মনে আনিয়া দিল। চক্ষু তাহার যে impressionটা ধরিল তাহা হইল লালরঙ্, নাসিকা যে impression টা ধরিল তাহার নাম হইল গন্ধ, স্পর্শ যে impressionটা ধরিল তাহা হইল কোমলতা। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন impression ঠিক একই মুহূর্ত্তে কিম্বা পর পর মনের মধ্যে হইল, সুতরাং কাল তাহা নিয়মিত করিল। আবার সেই জিনিষটা আমার বাহিরে আছে, সেজন্য দেশ (Space) ও তাহাতে সাহায্য করিল। মনের sensibility বিভাগে এইরূপে সেই impressionগুলি দেশ ও কালের সাহায্যে একটির পর একটি গিয়া পৌঁছিল বটে, কিন্তু তখনও আমার একটা বস্তুর জ্ঞান হইল

না। তখন কাল আবার সেইগুলিকে বুদ্ধির ( understanding ) কোঠায় পৌছিয়া দিল। বুদ্ধির যে সকল বৃত্তি বা অবয়ব আছে ( categories ), কাল তাহার schema দ্বারা তাহাদের কোন একটার সহিত এই impession গুলিকে মিলাইয়া দিতে লাগিল। সেখানে এই impressionগুলি পরস্পর মিলিত হইয়া একটা বস্তুর চিত্র অর্থাৎ লালরঙের ফুলরূপে কল্পনায় ভাসিতে লাগিল। তখন এইরূপ ফুল আর কোথায় দেখিয়াছি, এরূপ আলোড়ন আরম্ভ হইল। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে এরূপ আর একটি ফুলের চিত্র পাওয়া গেল। এবং তাহার সহিত এই চিত্রটিকে মিল করিয়া বাহিরের জিনিষটিকে একটি গোলাপ ফুল বলিয়া জ্ঞান হইল। মনের এইরূপ বিভিন্ন রূপরসাদি impressionগুলিকে বস্তুর আকারে ঢালাই করাকে "synthetic unity of apperception" বলে।

এইরূপে আমরা দেখিলাম, আমাদের বাহিরের রূপরসাদি আমাদের অন্তঃকরণে অর্থাৎ জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করিলেই তাহারা একটা সাকার চিত্র ( image ) রূপে পরিণত হয়, এবং তাহাই বাহিরের সেই বস্তুটিকে একটা বিশেষ জড় পদার্থ বলিয়া চিনাইয়া দেয়। বাহির হইতে আমি পাইয়াছিলাম কেবল কতকগুলি impression; সেই কাঁচা মালগুলিকে সুন্দর আকারে পরিণত করিয়া আমি বাহিরে যখন পাঠাইলাম তখন তাহা হইল একটি গোলাপ ফুল। এই অর্থে ক্যাণ্ট্ বলেন "The understanding is the law-giver of nature"—অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিই বহির্জ্জগতের আকার প্রদান করে। বুদ্ধির মধ্যে যে সকল বৃত্তি আছে, তাহারাই বাহিরের কাঁচামালগুলিকে ঢালাই করিয়া বহির্জ্জগতের রূপদান করে। তবে এইরূপ কাঁচা মাল (phenomena) না পাইলে বুদ্ধি জ্ঞানের বস্তু



কিছুই দিতে পারে না। বুদ্ধির মধ্যে যে সব বৃত্তি (pure concepts) আছে, তাহারা কেবল ফাকা। "Concepts without intuition are empty." * সুতরাং জ্ঞানোৎপত্তি সম্বন্ধে phenomenaই আসল বস্তু, concept কেবল তাহাদের আকার দান করে মাত্র। Pure conceptএর কোন বাস্তবতা নাই।

পূর্ব্বে দেখিয়াছি, বাহিরের বস্তু যে সকল phenomena প্রেরণ করে, তাহাই মনোরাজ্যে যাইয়া বাস্তব আকার ধারণ করে। যেমন চক্ষুতে প্রতিফলিত লাল রঙ্, নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট গন্ধ, হস্তের কোমল স্পর্শ প্রভৃতি impression বুদ্ধি বৃত্তিতে একীভূত হইয়া একটা গোলাপ-ফুলের আকার ধারণ করিল। কিন্তু যে সকল impression বুদ্ধিরাজ্যে উপস্থিত হইল, তাহাদের সমষ্টি একটা জবাফুল না হইয়া গোলাপফুল হইল কেন? অর্থাৎ বাহিরের প্রকৃত বস্তুটা যখন আমাদের জ্ঞানের অগম্য, তাহাদের impression গুলিই যখন আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই, তখন সে গুলি একভাবে আকারিত না হইয়া অন্য ভাবে আকারিত হয় কেন? ইহার কারণ বাহিরের সেই বস্তুর মধ্যে পাওয়া

---

* "A pure use of the categories is no doubt possible, that is, not self-contradictory, but it has no kind of objective validity, because it refers to no intuition to which it is meant to impart the unity of an object. The categories remain for ever mere functions of thought by which no object can be given to me, but by which I can only think whatever may be given to me in intuition." Critique of Pure Reason Maxmuillar's Translation Vol II. P. 220 *Falckenberg's History of Modern Philosophy* P. 369.

যায় না। গোলাপফুল জবাফুলের আকার ধারণ না করিবার কারণ দ্রষ্টার জন্মগত সংস্কার।*

ক্যাণ্টের মতে এই তিনটি বিষয়ের পার্থক্য বুঝিতে হইবে যথা :—

(১) *Things-in-themselves*, অর্থাৎ বস্তুর প্রকৃত সত্তা, যাহা আমাদের জ্ঞানের অগোচর।

(২) *Phenomena*— অর্থাৎ মায়িক জগৎ—যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারা জ্ঞানগম্য হয়।

(৩) *Our representation of phenomena*, অর্থাৎ সেই মায়িক জগৎ আমাদের নিকট যে ভাবে জ্ঞানগম্য হয়।

---

*"It reminds one of the objection sometimes taken to Kant's doctrine of the forms that it does not explain why the manifold of intuition does not get into wrong forms **** *** It will not do to say that the object not only gives the sensation but also begets the association—traces which bring the right idea of the interpretation of the sensation. For so long as we admit that to know anything is to assimilate it, the *Primum cognitum* cannot be explained by the causality of the object. We must admit an idea behind all presentation—a *regressas infinitum* has to be accepted. So why a person should have certain sense—experience rather than any other can only be understood in the light of the principle that every man freely accepts, if not makes, his circumstances. Every man is born with the seed of all his future psycho-physical existence, with instinct for action and original disposition for certain forms of cognition."

*Studies in Vedantism* By. Prof. Krishna ch. Bhattachargya.



"In the realm of things-in-themselves there is no motion ; in the world of phenomena earth moves round the sun ; in the sphere of representation the sun moves round the earth."

বাস্তব পক্ষে সূর্য্যের কোন গতি নাই, মায়িক রাজ্যে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে ; কিন্তু আমরা দেখি, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। বাস্তব রাজ্যে গোলাপ ফুল কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি,—অথবা ইথার ( ether ) সমুদ্রে একটি আবর্ত্ত বিশেষ ; মায়িক জগতে তাহা একটি ফুল ; আমার চক্ষে দেখি তাহার লালরঙ্।

ক্যাণ্টের মতে—"Things-in-themselves are unknowable" বস্তুর বাস্তবসত্তা আমাদের অজ্ঞেয়।

আমাদের জ্ঞান phenomena অর্থাৎ মায়িক জগতে সীমাবদ্ধ। বার্কিলি বলিয়াছেন—আমি একটা বস্তু দেখিতেছি বলিয়াই উহা আছে—( "It is a contradiction to suppose that our object can exist unperceived" )—এ সম্বন্ধে ক্যাণ্ট বলেন, মায়িক জগতের ঘটনা ও বস্তুসকল, আমি দেখার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান ছিল, আমি দেখার পরেও বর্ত্তমান থাকিবে। একটি গোলাপগাছে ফুল ফুটিয়াছে ; আমি বাগানে আসার আগেও তাহা সেই ভাবে ছিল, আবার আমি বাগান হইতে চলিয়া গেলেও তাহা থাকিবে। তাহার প্রমাণ কি ? আমি দেখার পরে বাতাসে গোলাপফুলের পাপড়ি গুলি খসিয়া মাটিতে পড়িয়াছে আমি পরে আসিয়া তাহা যখন দেখিতে পাই, তখন নিশ্চয়ই আমার অনুপস্থিতি সময়ে গোলাপফুলও সেখানে ছিল। সুতরাং আমার তাৎকালিক জ্ঞান হইতে বস্তুর একটা পৃথক অস্তিত্ব আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু তখন

সেই বস্তু কোথায় থাকে? দেশ ও কাল ব্যতিরেকে যখন বস্তু থাকিতে পারে না, আর দেশ ও কাল যখন মনেরই ধর্ম্ম; তখন আমার অনুপস্থিতিতে সেই বস্তুটি কাহার মনে থাকে? ইহার উত্তরে ক্যাণ্ট বলেন– বস্তু থাকে "in the transcendental consciousness of the race"—সমস্ত মানবজাতির আত্মায়।

যাহা হউক, জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে ক্যাণ্টের চরম সিদ্ধান্ত এই— "All our knowledge begins with the senses, proceeds thence to the understanding and ends with reason." অর্থাৎ আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আরব্ধ হইয়া বুদ্ধিতে পৌঁছে এবং বিবেকে * শেষ হয়। কিন্তু বিবেক ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে চাহে না। ইন্দ্রিয়াতীত, মায়িক জগতের পরপারে যে অখণ্ড অনন্ত সত্তা বিদ্যমান, তাহার প্রতিও লুব্ধদৃষ্টি নিক্ষেপ করে। সেই অখণ্ড সত্তার মধ্যে তিনটি idea আছে—মানবাত্মা, পরমাত্মা বা ঈশ্বর এবং জগতের প্রকৃত সত্তা। বিবেক তর্ক দ্বারা এই তিনটি বিষয়ের তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে যাইয়া নানা প্রকার ভ্রমসঙ্কুল ও স্বতোবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। সুতরাং সেই ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্য "তর্কে বহুদূর," সেদিকে যাইতে হইলে বিশ্বাসই আমাদের একমাত্র সম্বল। আমাদের সাংসারিক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ও নৈতিক জীবনের উন্নতির জন্য ঈশ্বর, পরকাল ও বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে আমাদিগকে কতকগুলি postulate (স্বতঃসিদ্ধান্ত) মানিয়া লইতে হইবে। ক্যাণ্ট তাঁহার Critique of Practical Reasonএ সেই সকল বিচার করিয়াছেন।*

* এখানে reason শব্দের অন্য ভাল অনুবাদ খুঁজিয়া না পাইয়া বিবেক শব্দ ব্যবহার করিলাম। বিবেক conscience নহে।

*All knowing is limited to phenomena or possible experience.



আমরা ক্যাণ্টের মতের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা দেখিলাম, তাঁহার মতে আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান মায়িক জগতের সাহায্যে উৎপন্ন হয়; বহির্জগতের চিত্র সকল দেশ ও কালে অঙ্কিত হইয়া আমাদের বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। সেই সকল চিত্র অবশ্যই সাকার, সুতরাং আমাদের জ্ঞান মাত্রেই সাকার।

## ফিক্‌টে ( Fichte )

ক্যাণ্টের মতে "The understanding is the lawgiver of nature"—অর্থাৎ আমাদের বুদ্ধিই বহির্জ্জগতের রূপ ও আকারাদি প্রদান করে। ক্যাণ্টের শিষ্য ফিক্‌টে ( Fichte ) ইহার এক কাঠি উপরে উঠিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা বহির্জ্জগতের কেবল রূপ ও আকারাদি সৃষ্টি করি না, বহির্জ্জগৎটাই আমাদের মনের সৃষ্টি, তাহার কোন বাস্তব সত্তা নাই। তাঁহার মতে "The thing-in-itself, is, like the rest, only thought in the ego"—আমাদের আত্মার মধ্যেই দুই পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি আছে—তাহার একটা বহির্মুখী ( centrifugal ), আর একটি অন্তর্মুখী ( centripetal ) একটি সম্প্রসারিণী, আর একটি সংকোচকারিণী। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির ক্রিয়া দ্বারা আমাদের জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; তাহার ছয়টি ক্রম আছে যথা—Sensation, intuition, image, understanding,

But beyond the limits of experience, things are ( exist ), and ought to be. We ought to act morally. We are volitional and active beings under laws of reason, and though we are unable to know things in themselves, yet we may and must postulate them—our freedom, God and immortality. The discovery of the law and of conditions of morality is the mission of practical philosophy."—( Falckenbarg ).

judgment, reason. এই কয়েকটি ক্রিয়া দ্বারা বহির্জ্জগৎ সৃষ্ট হয়, এবং আমাদের জ্ঞান বহির্জ্জগতে সম্প্রসারিত হয়। এই প্রকার জ্ঞান যখন আত্মার মধ্য হইতে মনোরাজ্যে বহির্জ্জগতের চিত্রসকল উদ্ভাবন করে তখন এই জ্ঞানও সাকার॥

## শেলিং ( Schelling )

ফিকৃটে (Fichte) যেমন বহির্জগতের বাস্তব সত্তা অস্বীকার করিয়া মনের দ্বারা তাহা সৃষ্টি করিলেন, শেলিং (Schelling) আবার তাহার বিপরীত দিকে তাঁহার দার্শনিক মত স্থাপন করিলেন। তাঁহার মতে বহির্জগৎকে একেবারে তুচ্ছ করিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে না।— "Spirit develops out of nature. Nature itself has a spiritual element in it; it is undeveloped slumbering unconscious, benumbed intelligence." প্রকৃতি হইতেই চৈতন্যের অভিব্যক্তি হয়, প্রকৃতি নিদ্রিত চৈতন্য।

ফিকৃটে যেমন আত্মার মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তির কল্পনা করিয়াছেন, শেলিং সেইরূপ প্রকৃতির মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তির কথা বলেন; একটি আকর্ষণী শক্তি, অন্যটি বিপ্রকর্ষণী শক্তি—যেমন চুম্বক-খণ্ডের মধ্যে দুইটি বিপরীত শক্তির সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃতির এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবসম্পন্ন শক্তিকে ব্যাপিয়া আর একটি তৃতীয় মহাশক্তি আছে, তাহাকে বিশ্বাত্মা (world soul) বলা যাইতে পারে। শেলিংয়ের মতে জড়প্রকৃতি হইতে যেমন ক্রমশঃ জীবজগতের অভিব্যক্তি হইতেছে, সেইরূপ জীবজগৎও জড়ে পরিণত হইতে পারে। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন—"Since truth is the agreement of thought and its object, every cognition necessarily implies the coming together of a subjective



and objective factor"—অর্থাৎ জ্ঞাতা ও বাহিরের জ্ঞেয়-বস্তু এই উভয়ের সম্মিলন দ্বারা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যেমন জড় পদার্থ ক্রম-বিকাশ দ্বারা আত্মার মধ্যে জ্ঞানের বিকাশ ঘটাইতে পারে, সেইরূপ আত্মার মধ্য হইতেও জড়শক্তির ক্রিয়া দ্বারা জ্ঞানের বিকাশ হয়। জ্ঞান প্রথমে Sensation দিয়া আরব্ধ হয়, তখন বাহিরের একটা thing-in-itself তাহার Phenomenon দ্বারা ego এর উপর ক্রিয়া করে। পরে reflection এবং judgment এর মধ্য দিয়া willing এ পরিণত হয়। বলা বাহুল্য এই সকল জ্ঞানের কার্য্যে জড়-জগতের প্রভাব দেদীপ্যমান, সুতরাং এইরূপ জ্ঞান সাকার।

## হিগেল (Hegel)

হিগেল (Hegel) এই দুইটি পরস্পর বিরোধী দার্শনিক মতের সমবায় ও সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাঁহার নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার ঈশ্বর ও জগৎ-সম্বন্ধীয় মত পূর্ব্বে বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহার কি মত তাহাই দেখিব। তাঁহার মতে "All being is thought realised" ......"The world a development of thought"...... "Thought and being are identical"—এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, হিগেল বহির্জগৎকে চৈতন্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ধর্ম্মা বলিয়া মনে করেন না।

হিগেলের মতে phenomenal world ( মায়িক জগৎ ) আমাদের জ্ঞানের বিষয় নহে, ঈশ্বর-চৈতন্য (absolute)ই আমাদের একমাত্র জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়। সে জ্ঞান কি প্রকারে হয়? Reason ( বিচার ) দ্বারা। শেলিঙের মতে কোন একটা concrete ( বিশেষ ) বস্তু অবলম্বনে

জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। ক্যাণ্ট্ বলেন সেই concrete object (বিশেষ বস্তু) হইতে বুদ্ধির সাহায্যে যে abstract concept প্রস্তুত হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। হিগেলের মতে concrete conceptই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, তাহা হইতেই বিচার দ্বারা আমরা absolute এর জ্ঞান লাভ করিতে পারি। সেই concrete concept কাহাকে বলে? "A concrete concept would be one which sought the universal not without the particular, but in it; which should not find the infinite beyond the finite, nor the absolute at an unattainable distance above the world, nor the essence hidden behind the phenomena, but manifesting itself therein. (*Falckenberg P. 492*)

অর্থাৎ বিশেষ বস্তু হইতে পৃথক্ ভাবে ব্যাপক বস্তুকে, সান্ত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে অনন্তকে, মায়িক জগৎ হইতে দূরবর্ত্তী ভাবে বস্তুসত্তাকে খুঁজিতে হইবে না। অনন্তকে সান্তের মধ্যে, ব্যাপকে ব্যাপ্যের মধ্যে, চিৎসত্তাকে জড়ের মধ্যেই দেখিতে হইবে। সেই অনন্ত চিৎ-সত্তা এই মায়িকজগতেই প্রকাশমান আছেন এইরূপ জ্ঞান করিতে হইবে। কি প্রকারে এই সান্ত মায়িক জগতের সাহায্যে অনন্তের জ্ঞান হইতে পারে, সে সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে আমরা স্পষ্টই দেখিলাম, হিগেলের মতে আমাদের ঈশ্বর সম্বন্ধীয় জ্ঞান মায়িক জগতের মধ্য দিয়া, মায়িক জগতের সাহায্যেই হইয়া থাকে। ইতি পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে, জগতের সহিত সম্মিলিত হইয়া আমাদের যে জ্ঞান জন্মে তাহা সাকার। অতএব হিগেলের মতে ঈশ্বরের জ্ঞান সাকার।

---



## (খ) স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত
### (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত হইতে উদ্ধৃত)

একজন ব্রাহ্মভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ।—তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার। যারা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাঁদের স্বপ্নবৎ মনে হ'য়েছে, তাঁদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটা জিনিষ, জগৎ একটা জিনিষ। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর 'ব্যক্তি' (Personal God) হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী—যেমন বেদান্ত-বাদী—কেবল নেতি নেতি বিচার করে। বিচার ক'রে জ্ঞানীর বোধে বোধ হয় যে, 'আমিও মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা—স্বপ্নবৎ'। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি, মুখে বল্‌তে পারে না।

"কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র—কূল কিনারা নাই—ভক্তিহিমে জল স্থানে স্থানে বরফ হ'য়ে যায়—বরফ আকারে জমাট বাঁধে। অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে কখন কখন সাকাররূপ ধ'রে থাকেন। জ্ঞান সূর্য্য উঠলে, সেই বরফ গ'লে যায়, তখন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ব'লে বোধ হয় না—তাঁর রূপও দর্শন হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বল্‌বে? যিনি বল্‌বেন, তিনিই নাই, তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না।

"বিচার করতে করতে আমি টামি আর থাকে না। প্যাঁজের প্রথমে লাল খোসা তুমি ছাড়ালে, তারপর সাদা পুরু খোসা। এইরূপ বরাবর ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না।

"যেখানে নিজের 'আমি' খুঁজে পাওয়া যায় না আর খুঁজেই বা কে?—সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ কিরূপ হয়, সে কথা কে

ব'ল্‌বে! একটা লুণের পুতুল সমুদ্র মাপ্‌তে গি'ছিল। সমুদ্রে যাই নেমেছে, অমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?

"পূর্ণ-জ্ঞানের লক্ষণ,—পূর্ণ-জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হ'য়ে যায়। তখন আমি রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দরূপ সাগরে গ'লে এক হ'য়ে যায়, আর একটুও ভেদ বুদ্ধি থাকে না।

"বিচার করা যতক্ষণ না শেষ হয়, লোকে ফড়্ ফড়্ ক'রে তর্ক করে। শেষ হ'লে চুপ হ'য়ে যায়। কলসী পূর্ণ হ'লে কলসীর জল পুকুরের জল এক হ'লে, আর শব্দ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ হয়, ততক্ষণ শব্দ। "আগেকার লোকে বল্‌তো, কালাপানীতে জাহাজ গেলে ফেরে না।

[ 'আমি' কিন্তু যায় না ]

"আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল" (হাস্য) হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না। তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।

"ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম। অর্থাৎ তিনি সগুণ—একজন ব্যক্তি হ'য়ে রূপ হ'য়ে, দেখা দেন। তিনিই প্রার্থনা শুনেন। তোমরা যে প্রার্থনা করো; তাঁহাকেই করো। তোমরা বেদান্তবাদী নও, জ্ঞানী নও; তোমরা ভক্ত। সাকার রূপ মানো আর না মান, এসে যায় না। ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ব'লে বোধ থাক্‌লেই হলো, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় করেন, যে ব্যক্তি অনন্তশক্তি।

"ভক্তিপথেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।"

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ)।

"একজন ব্রাহ্ম-ভক্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় ঈশ্বরকে কি দেখা যায়? যদি দেখা যায়, দেখিতে পাই না কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ।—হাঁ, অবশ্য দেখা যায়—সাকার রূপ দেখা যায়, আবার স্বরূপও দেখা যায়। তা তোমায় বুঝাব কেমন ক'রে?



ব্রাহ্ম-ভক্ত।—কি উপায়ে দেখা যেতে পারে?

শ্রীরামকৃষ্ণ।—ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর জন্য কাঁদ্‌তে পার? লোকে ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, টাকার জন্য এক ঘটী কাঁদে! কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদ্‌ছে? যতক্ষণ ছেলে চুষি নিয়ে ভুলে থাকে, মা রান্নাবান্না বাড়ীর কাজ সব করে। ছেলের যখন চুষি ভাল লাগে না—চুষি ফেলে চীৎকার ক'রে কাঁদে, তখন মা ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে হুড়্ হুড়্ ক'রে এসে ছেলেকে কোলে লয়।

ব্রাহ্ম-ভক্ত।—মহাশয়! ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ বলে সাকার,—কেউ বলে নিরাকার,—আবার সাকারবাদীগণের নিকট নানারূপের কথা শুন্‌তে পাই। এত গণ্ডগোল কেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ।—যে ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে। বাস্তবিক কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যদি একবার লাভ কর্‌তে পারা যায়, তাহ'লে তিনি সব বুঝিয়ে দেন! সে পাড়াতেই গেলে না—সব খবর পাবে কেমন করে?

"একটা গল্প শোন। একজন বাহ্যে গিছিল। সে দেখ্‌লে যে গাছের উপর একটী জানোয়ার রয়েছে। সে এসে আর একজনকে বল্‌লে—দেখ, অমুক গাছে একটী সুন্দর লাল রঙ্গের জানোয়ার দেখে এলাম। লোকটী উত্তর কর্‌লে, 'আমি যখন বাহ্যে গিছিলাম আমিও দেখেছি—তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন? সে যে সবুজ রঙ! আর একজন বল্লে; 'না-না-আমি দেখেছি; হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্‌লে, না জরদা, বেগুনী, নীল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছ-তলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্‌লে, "আমি এই গাছতলায় থাকি, আমি সে জানোয়ারটীকে বেশ জানি—তোমরা যা যা বল্‌ছ সব সত্য—সে কখন

লাল, কখন সবুজ, কখন হল্‌দে, কখন নীল, আরো সব কত কি হয়। বহুরূপী! আবার কখন দেখি কোনও রঙই নাই।

"অর্থাৎ যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তা করে, সেই জান্তে পারে তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানারূপে দেখা দেন, নানা ভাবে দেখা দেন,—তিনি সগুণ আবার তিনি নির্গুণ। যে গাছতলায় থাকে, সে জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ—আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কষ্ট পায়।

"কবীর ব'লত 'নিরাকার আমার বাপ, সাকার আমার মা।'

"ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে, সেইরূপে তিনি দেখা দেন—তিনি যে ভক্ত-বৎসল! পুরাণে আছে বীরভক্ত হনুমানের জন্য তিনি রামরূপ ধ'রেছিলেন।

"বেদান্ত বিচারের কাছে রূপটুপ্‌ উড়ে যায়। সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি ( Person ), ব'লে বোধ সম্ভব হয়। বিচারের চক্ষে দেখ্‌লে ভক্তের 'আমি' অভিমান, ভক্তকে একটু দূরে রেখেছে। কালীরূপ কি শ্যামরূপ চৌদ্দপোয়া কেন? দূরে ব'লে। দূরে ব'লে সূর্য্য ছোট দেখায়। কাছে যাও তখন এত বৃহৎ দেখাবে যে, ধারণা ক'রতে পা'রবে না। আবার কালীরূপ কি শ্যামরূপ শ্যামবর্ণ কেন? সেও দূর বলে। যেমন দীঘির জল দূরে থেকে সবুজ; নীল বা কালবর্ণ দেখায়, কাছে গিয়ে হাতে ক'রে জল তুলে দেখ, কোন রঙই নাই। আকাশ দূরে দেখ্‌লে নীলবর্ণ, কাছে দেখ, কোন রঙই নাই।

"তাই বল্‌ছি, বেদান্ত দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ মুখে বলা যায় না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য, ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।



শ্রীরামকৃষ্ণ।—ভক্তিপথ তোমাদের পথ। এ খুব ভাল—এ সহজ পথ। অনন্ত ঈশ্বরকে কি জানা যায়? আর তাঁকে জান্‌বারই বা কি দরকার? এই দুর্ল্লভ মানুষ জনম পেয়ে আমার দরকার তাঁর পাদপদ্মে যেন ভক্তি হয়।

"যদি আমার এক ঘটী জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপ্‌বার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হয়ে যাই—শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জান্‌বার দরকারই বা কি?

( শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ, ৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ )

"( মাষ্টারের প্রতি )। আর তোমায় বল্‌ছি—রূপ, ঈশ্বরীয় রূপ, অবিশ্বাস কোরো না। রূপ আছে বিশ্বাস কোরো। তারপর যে রূপটী ভালবাস সেইরূপ ধ্যান কোরো। ( গোবিন্দের প্রতি ) কি জান, যতক্ষণ ভোগবাসনা ততক্ষণ ঈশ্বরকে জান্‌তে বা দর্শন ক'র্‌তে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ছেলে, খেলা নিয়ে ভুলে থাকে। সন্দেশ দিয়ে ভুলোও, খানিক সন্দেশ খাবে। যখন খেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তখন বলে 'মা যাব'; আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, কোনও কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে। যে কোলে ক'রে নিয়ে যায় তারই সঙ্গে যাবে।

"সংসারের ভোগ হয়ে গেলে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি ক'রে তাঁ'কে পাবো, কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শুনে।"

[ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ ]

"বিজয়। ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার।

শ্রীরামকৃষ্ণ। যিনি ব্রহ্ম তিনি কালী ( মা আদ্যাশক্তি )। যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বোলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি প্রলয় এই সব

কাজ করেন, তাঁকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেলচে, দুলচে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী! কি না— যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সহিত রমণ করেন! কালী 'সাকারা আকার নিরাকারা'। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা ক'র্বে। একটা দৃঢ় ক'রে তাঁকে চিন্তা ক'র্লে, তিনিই জানিয়ে দেবেন, তিনি কেমন। শ্যামপুকুরে পৌঁছিলে তেলীপাড়াও জান্তে পারবে। জান্তে পারবে যে তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়। তিনি তোমার কাছে এসে কথা কবেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস করো, সব হ'য়ে যাবে। আর একটা কথা—তোমার নিরাকার ব'লে যদি বিশ্বাস, তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো। কিন্তু মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কোরো না। তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা জোর ক'রে বোলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। ব'লো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার; আর কত কি হ'তে পারেন তিনি জানেন; আমি জানি না, বুঝ্তে পারি না।' মানুষের একছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা ক'রে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। ১ম ভাগ, ১২শ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ]

---

# সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার

## পরিশিষ্ট।

### (গ) কয়েকটি বিরুদ্ধসমালোচনা ও তাহার উত্তর।

—৪—

(১) শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পত্র। :—

ওঁ

52/2 Park Street
7th August/98.

বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন

আপনার প্রদত্ত উপহার খানি পাঠ করিয়া একদিকে যেমন প্রীতিলাভ করিলাম আর একদিকে তেমনি দুঃখিত হইলাম। আপনার মতো বিদ্বান্ ব্যক্তিকে পৌত্তলিকতার সপক্ষে ওরূপ Special pleading করা, আমার মতে, শোভা পায় না:—Shakespeare Falstaffe এর মুখে এইরূপ কথা যোজনা করিয়াছেন—"The prince may for recreation's sake, prove a false thief; for the poor abuses of the time want countenance." পৌত্তলিকতার নামে একটা অপবাদ আছে বলিয়া, সে বেচারীর প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে countenance করা Falstaffe এর মতো লোককে শোভা পায়— কিন্তু আপনার মতো লোককে শোভা পায় না। (১) মনে করিবেন

(১) মাননীয় ঠাকুর মহাশয় পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে তাঁহার মত যে পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা প্রথম অধ্যায়ে তাঁহার লিখিত একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি।

না যে, কেবল ব্রাহ্মেরাই পৌত্তলিকতার প্রতি নারাজ—আমাদের দেশের পূর্ব্বতন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরাও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। (২)

আপনি প্রথমে সাকার নিরাকারের মধ্যে এ পিট ও পিট সম্বন্ধ (ব্যঙ্গব্যঞ্জক সম্বন্ধ) দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন—ইহাতে পাঠকের সহসা মনে হইতে পারে যে, আপনি abstraction এর বিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু শেষে, আপনি উভয়ের মধ্যে একেবারেই সম্বন্ধ রহিত করিয়া অদ্বৈতের পরাকাষ্ঠা abstraction এ ঝম্প প্রদান করিয়াছেন। প্রথমে আপনি সাকারের উপর যেমন বেজায় ঝোঁক দিয়াছেন, শেষে নিরাকারের উপর তেমনি বেজায় ঝোঁক দিয়াছেন। (৩) দর্শন এইরূপ ঝোঁকে ঝোঁকে চলাতে আমাদের দেশের Practical রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। আমি এই পত্রের মধ্যে আমার সমস্ত মন্তব্য খুলিয়া লিখিতে পারিব না—একটি উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইব। আমি ইংরাজি বাঙ্গালা মিশাইয়া লিখিতেছি কেবল সংক্ষেপ এবং সুবিধার জন্য।

---

(২) আমাদের দেশের "পূর্ব্বতন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিরা" অর্থাৎ ঋষিগণ সাকার উপাসনার নিন্দা করেন নাই। তাঁহারাই উপাসকদিগের হিতের জন্য সাকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা ইতিপূর্ব্বে বিশেষ রূপে দেখান হইয়াছে। এমন কি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ও স্থান বিশেষে সাকার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন। (৪ পৃষ্ঠা দেখ)। শাস্ত্রে যে সকল শ্লোক সাকার উপাসনার নিন্দাসূচক বলিয়া আপাততঃ মনে হয়, আমরা তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছি, যে তদ্দারা সাকার উপাসনার নিন্দা করা হয় নাই। (৩২৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

(৩) আমি সাকার ও নিরাকারের মধ্যে সম্বন্ধ রহিত করি নাই। এক ব্রহ্মেরই দুইটী aspect বা ভাব—সগুণ ও নির্গুণ ভাব—ইহা আমি দ্বিতীয় অধ্যায়ে



Personal Godকে যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রাণ থাকিতে তাঁহাকে means to an end করিতে পারেন না। তার সাক্ষী—বৈষ্ণবেরা কখনই ভগবান্‌কে পরব্রহ্মে লীন হইবার সোপান বোধে তাঁহার উপাসনা করিতে সম্মত হইবেন না। যখন মনে মনে জানিতেছি যে, সগুণব্রহ্ম কেবল একটা কল্পনা—নির্গুণ ব্রহ্মই আসল বস্তু, তখন সেরূপ স্থলে সগুণ ব্রহ্মের প্রতি অভক্তি হইবারই কথা—রঙ্গভূমিতে নট রাজা সাজিয়া দাঁড়াইলে তাহার প্রতি কাহারও রাজভক্তি হইতে পারে না। * absraction, আমার মতে, সত্যও নহে আর তাহার প্রতি ভক্তিও হয় না। পৌত্তলিকতা এক রকমের abstraction, অদ্বৈতবাদ আর এক রকমের abstraction। (৪) এ পত্রে আমি আমার মনোগত ভাব আর অধিক প্রকাশ করিতে পারিলাম না—

---

বিশদরূপে আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছি। কিন্তু অধিকারিভেদে তাঁহার উপাসনা প্রণালী বিভিন্ন, ইহাই আমি প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তাঁহার নির্গুণ সত্তা উপাসনার বিষয় নহে, ইহাই শ্রুতিস্মৃতি সিদ্ধান্ত মত। অদ্বৈতবাদী তাঁহার নির্গুণ ভাবকেই সত্য বলিয়া জানেন, সগুণভাবের পারমার্থিক সত্তা স্বীকার করেন না। দ্বৈতবাদিগণ আবার সগুণ ভাবকেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করেন, নির্গুণ ভাবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আমি এই দুই মতই যথাস্থানে ব্যাখ্যা করিয়াছি। আবার ইহাও দেখাইয়াছি, যে অদ্বৈত মতে ও ব্যবহারিক জগতে দ্বৈতভাব স্বীকার করা হয়; সেইজন্য অদ্বৈত বাদিগণও প্রচলিত সাকার উপাসনার আবশ্যকতা স্বীকার করেন। সুতরাং ব্যবহারিক জগতে অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদীর মধ্যে উপাসনা বিষয়ে পার্থক্য নাই। এখানেই উভয় মতের সমন্বয়।

* "তোমাকে ভক্তির অপাত্র জানিয়াও আপাততঃ তোমাকে ভক্তি করি" বলিলে ভক্তি করা হয় না। ভক্তির পরাকাষ্ঠা পাত্র বোধে—সম্পূর্ণ সত্য বোধে—জাজ্বল্যমান সত্য বোধে—সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ভক্তিই ভক্তি।

(৪) বৈষ্ণবগণ দ্বৈতবাদী, কেহ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদী। তাঁহারা ভগবান্ বা কৃষ্ণকে

অবকাশ মতে এ বিষয়ে আমার মতামত প্রবন্ধাকারে বিস্তার করিয়া লিখিবার ইচ্ছা আছে।

আপনার ভাষা অতীব বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল এবং নিখুঁত পরিষ্কার—পাঠকের আশু হৃদয়গ্রাহী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই; কিন্তু যে সকল কথা আপনি তুলিয়াছেন তাহার মীমাংসা অনেক হাত জলের নীচে পড়িয়া রহিয়াছে।

অনুরক্ত শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

## (২) শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "আধুনিক সাহিত্য" হইতে গৃহীত :—

"সাকার ও নিরাকার" *

"ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার এইরূপ তর্ক মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশে

পরমপুরুষ ( Prsonal God ) জানিয়া উপাসনা করেন। তাঁহাদের মতে ভগবানের সগুণ সাকার ভাব নিত্য। ভগবানের অতিরিক্ত নিগু'ণ ব্রহ্মের অস্তিত্ব তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহারা ভগবানের উপাসনাকে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার সোপান ( means to an end ) বলিয়া মনে করিতে পারেন না। তাঁহাদের নিকট ভগবান্ সর্ব্বগুণের আধার পরমপুরুষ বা পুরুষোত্তম, সুতরাং তিনি abstraction নহেন। শাক্ত সম্প্রদায়ও জগন্মাতাকে, এবং শৈব সম্প্রদায়ও শিবকে এই ভাবে উপাসনা করেন। কিন্তু শাক্ত ও শৈব মত অদ্বৈতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, এই সকল সাধক শক্তি বা শিবের নিত্য সাকার রূপ স্বীকার করেন না। শক্তি বা শিবকে তাঁহারা ব্রহ্মের অভিব্যক্ত রূপ বলিয়া মনে করেন—যে অর্থে মানব দেহধারী জীব আত্মার অভিব্যক্ত রূপ, অথবা স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্ত রূপ। ( দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) আমরা ব্যবহারিক জগতে ( Practical world ) এ জগতের এই অভিব্যক্ত রূপকে যেমন সত্য বলিয়া জানিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করি, শৈব ও শাক্ত সাধক ও সেই ভাবে তাঁহাদের ইষ্টদেবতার রূপকে সত্য বলিয়া জানেন। তাহাতে ভক্তি প্রকাশের কোন বাধা হয় না।

* সাকার ও নিরাকার তত্ত্ব। শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি, এ. প্রণীত।



শুনা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সমালোচ্য গ্রন্থে তর্কটা ততদূর স্থূল নহে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে ঈশ্বরকে সাকার ভাবে উপাসনা করিতে হইবে কি নিরাকার ভাবে?

"কেহ কেহ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকেন, যে, যে লোক নিরাকারে মন দিতে পারে না, তাহার পক্ষে সাকার উপাসনা শ্রেয়ঃ।

"কিন্তু গ্রন্থকার সেরূপ মাঝামাঝি কিছু বলিতে চাহেন না, তিনি বলেন নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না। হয় সোঽহং ব্রহ্ম হইয়া যাও নয় মূর্ত্তিপূজা কর। তিনি কালাপাহাড়ের ঠিক বিপরীত মুখে সংহার কার্য্য সুরু করিয়াছেন। মূর্ত্তি-পূজাকে কেবল যে তিনি রক্ষা করিতে চাহেন তাহা নহে, অমূর্ত্ত পূজাকে তর্কের দ্বারা ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন।

"কি হইতে পারে এবং কি হইতে পারে না তর্ক অপেক্ষা ইতিহাসে তাহার প্রমাণ সহজে পাওয়া যায়। জল যে শীতে জমিয়া বরফ হইতে পারে উষ্ণপ্রধান দেশের রাজাকে তাহা তর্কে বুঝান অসাধ্য; কিন্তু যদি তিনি একবার হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া আসেন, তবে এ সম্বন্ধে আর কথা থাকে না। লেখক মহাশয় সে রাস্তায় যান নাই, তিনি তর্কের দ্বারা বলিয়াছেন নিরাকার উপাসনা হইতেই পারে না।

"মুসলমানেরা মূর্ত্তিপূজা করে না। অথচ মুসলমান্ সম্প্রদায়ের মধ্য ভক্ত কেহ নাই বা কখনও জন্মে নাই, একথা বিশ্বাস্য নহে। কি করিয়া যে তাঁহাদের ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি হয় তাহা যতীন্দ্রমোহন বাবু না বুঝিতে পারেন—কিন্তু মূর্ত্তিপূজা করিয়া নহে একথা নিশ্চয়।

"নানক যে জগতের ভক্তশ্রেষ্ঠদের মধ্যে একজন নহেন, তাহা কেহ সাহস করিয়া বলিবেন না। তিনি যে সোঽহং ব্রহ্মবাদী ছিলেন না ইহাও নিঃসন্দেহ। তিনি যে প্রচলিত মূর্ত্তি উপাসনা বিশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অমূর্ত্ত উপাসনা প্রচার করিয়াছেন, ইহার একটী বই কারণ খুঁজিয়া

পাওয়া যায় না। নিশ্চয় তিনি নিরাকার উপাসনায় চরিতার্থ লাভ করিতেন, এবং মূর্ত্তি উপাসনায় তাঁহার ব্যাঘাত করিয়াছিল। (১)

"ব্রাহ্মদের মধ্যেও নিঃসন্দেহ কেহ না কেহ আছেন, যিনি প্রবল ভক্তির আবেগ বশতঃই মূর্ত্তিপূজা পরিহার পূর্ব্বক সমস্ত জীবন নিরাকার উপাসনায় যাপন করিয়াছেন। গ্রন্থকারের মতে তিনি ভ্রান্ত হইতে পারেন কিন্তু তিনি যে ভক্ত তাহা কেবল তর্কে নহে আচরণে এবং বহুপীড়নেও ত্যাগ স্বীকারে প্রমাণ করিয়াছেন। (২)

"এককালে ভারতবর্ষে মূর্ত্তিপূজা ছিল না। (৩) কিন্তু সেই দূর কাল সম্বন্ধে ঐতিহাসিক প্রমাণ উত্থাপন করা নিষ্ফল। আধুনিক কালের যে কয়টী উদাহরণ দেওয়া গেল তাহা হইতে অন্ততঃ এইটুকু প্রমাণ হয় যে, কোন কোন ভক্ত মূর্ত্তিপূজায় বিরক্ত হইয়া তাহা ত্যাগ করিয়াছেন; এবং অনেক ভক্ত পৃথিবীর অনেক দেশে অমূর্ত্ত উপাসনায় ভক্তিবৃত্তির পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছেন।

"গ্রন্থকার বলেন, মানিলাম তাঁহারা মূর্ত্তিপূজা করেন না, কিন্তু তাঁহারা নিরাকার উপাসনা করেন, ইহা হইতেই পারে না।—কারণ "জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থের জ্ঞান সাকার।" এবং "জাতিবাচক ও গুণবাচক পদার্থ অবলম্বনে ঈশ্বরের জ্ঞান সাকার।"

"এ কেমন তর্ক, যেমন,—যদি আমি বলি ক বাঁকা পথে চলে এবং খ

(১) ইহার উত্তর তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ৭১ পৃষ্ঠা দেখ।

(২) সে বিষয়ে আমারও কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা "অবিধি পূর্ব্বক" ভগবদুপাসনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক ভক্ত আছেন।

(৩) একথা স্বীকার করিতে পারি না। বৈদিক যুগেও ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি দেবতাকে সাকার রূপে পূজা করা হইত; তবে মূর্ত্তি গড়িয়া নহে। মনঃকল্পিত মূর্ত্তি ও মূর্ত্তি।



সোজা পথে চলে, তুমি বলিতে পার খ ও সোজা পথে চলে না—কারণ সরল রেখা কাল্পনিক; পৃথিবীতে কোথায়ও সরল রেখা নাই।

"কথাটা সত্য বটে কিন্তু তথাপি ইহা তর্ক মাত্র। আমাদের ভাষা আমাদের মনকে একদম ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। এবং আমাদের মন সীমাবদ্ধ। সুতরাং আমাদের ভাষা আপেক্ষিক। আমরা যাহাকে তীক্ষ্ণ বলি, অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে—তাহা ভোঁতা হইয়া পড়ে, আমরা যাহাকে নিটোল গোল বলি তাহাকে সহস্রগুণ বাড়াইয়া দেখিলে তাহার অসমানতা ধরা পড়িয়া যায়। অনুবীক্ষণ দিয়া দেখিতে গেলে নিরাকার উপাসনার মধ্যে যে আকারের আভাস পাওয়া যায় না তাহা বলিতে সাহস করি না।

"তাহা যদি হইল, তবে আমরা যাহাকে সাকার উপাসনা বলি তাহাতেই বা দোষ কি? নিরাকার যখন পূর্ণভাবে মনের অগম্য তখন তাঁহাকে সুগম আকারে পূজা করাই ভাল।

"আকার আমাদের মনের পক্ষে সুগম হইতে পারে কিন্তু তাই বলিয়া নিরাকার যে আকারের দ্বারা সুগম হইতে পারেন তাহা ঠিক নহে—ঠিক তাহার উল্‌টা। (৪)

"মনে কর আমি সমুদ্রের ধারণা করিতে ইচ্ছা করি। সমুদ্রের ক্রোশ দুই তফাতে আছি। আমি তাহা দেখিতে যাত্রা করিবার সময় পণ্ডিত আসিয়া বলিলেন, সমুদ্র এতই বড় যে স্বচক্ষে দেখিয়াও তাহার ধারণা হইতে পারে না। কারণ আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ; আমরা সমুদ্রের মধ্যে যতই দূরে যাই, যতই প্রয়াস পাই, সমুদ্রকে ছোট করিয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। অতএব তোমার অন্দরের মধ্যে একটা ছোট ডোবা খুঁড়িয়া

(৪) ইহার উত্তর পঞ্চম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাহাকে সমুদ্র বলিয়া কল্পনা কর। কিন্তু দর্শন শক্তির সাধ্য সীমা দ্বারা সমুদ্র দেখিয়াও যদি সমুদ্রের ধারণা সম্পূর্ণ না হয় তবে ডোবা হইতে সমুদ্রের ধারণা অসম্ভব বলিলেও হয়।

"অনন্ত আকাশ আমাদের কাছে মণ্ডল বদ্ধ, কি তাই বলিয়া ঘরের দ্বার বদ্ধ করিয়া আকাশ দেখিবার সাধ মিটাইতে পারি না; আমি যতদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাই তাহা দেখিয়া আমার তৃপ্তি হয় না।

"এই যে প্রয়াস, বস্তুত, ইহাই উপাসনা। আমার শেষ পর্য্যন্ত গিয়াও যখন তাঁহার শেষ পাই না; আমার মন যখন একাকী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যাত্রা করিয়া বাহির হয়, যখন অগণ্য গ্রহ চন্দ্র তারকার অনন্ত জটিল জ্যোতিররণ্য মধ্যে সে হারাইয়া যায়—এবং প্রভাতকর-প্লাবিত নীলাকাশের মহোচ্চ দেশে বিলীনপ্রায় বিহঙ্গমের মত উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে গাহিয়া উঠে, তুমি ভূমা, আমি তোমার শেষ পাইলাম না—তখন তাহাতেই সে কৃতার্থ হয়। সেই অন্ত না পাইয়াই তাহার সুখ, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি।" টলেমির জগৎতন্ত্র আমাদের ধারণাযোগ্য। পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া বদ্ধ কঠিন আকাশে জ্যোতিষ্কগণ সঙ্কীর্ণ নিয়মে ঘুরিতেছে ইহা ঠিক মনুষ্য-মনের আয়ত্তগম্য; কিন্তু আধুনা জ্যোতির্ব্বিদ্যার বন্ধন মুক্তি হইয়াছে; সে সীমাবদ্ধ ধারণার বাহিরে অনন্ত রহস্যের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে বলিয়া তাহার গৌরব বাড়িয়াছে। জগৎটা যে পৃথিবীর প্রাঙ্গন মাত্র নহে, পৃথিবীকে বিশ্বজগতে ধূলিকণার অধম এই সংবাদেই আমাদের কল্পনা প্রসারিত হইয়া যায়।

"আমাদের উপাস্য দেবতাকেও যখন কেবল মাত্র মনুষ্যের গৃহ-প্রাঙ্গণের মধ্যে বদ্ধ করিয়া না দেখি, তাঁহাকে আমাদের ধারণার অতীত বলিয়া জানি, যখন ঋষিদের মুখে শুনি

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন,—



অর্থাৎ মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে সেই আনন্দকে সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি কাহা হইতেও ভয় পান না—তখনই আমাদের বদ্ধ হৃদয় মুক্তির আশ্বাস লাভ করিতে থাকে। বাক্য মন যাঁহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে তিনি যে আমাদের পক্ষে শূন্য স্বরূপ তাহা নহে, তিনিই আনন্দ।

"যাঁহাকে আমাদের অপেক্ষা বড় বলিয়া জানি, তাঁহাকে উপাসনা করি। আমাদের সর্ব্বোচ্চ উপাসনা তিনিই আকর্ষণ করেন, যিনি এত বড় যে কোথায়ও তাহার শেষ নাই। (৫)

"তর্কের মুখে বলা যাইতে পারে, তাঁহাকে জানিব বড় করিয়া কিন্তু দেখিব ছোট করিয়া। (৬) আপনাকে আপনি খণ্ডন করিয়া চলা কি সহজ কাজ? বিশেষতঃ ইন্দ্রিয় প্রশ্রয় পাইলে সে মনের অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে। সেই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যতটুকু লইলে নয় তদপেক্ষা বেশি কর্ত্তৃত্ব তাহার হাতে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমর্পণ করিলে মনের জড়ত্ব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। (৭)

"তাঁহাকে ছোট করিয়াই বা দেখিব কেন?

"নতুবা তাঁহাকে কিছু একটা বলিয়া মনে হয় না; তিনি মন হইতে ক্রমশঃ স্খলিত হইয়া পড়েন।

---

(৫) সাকার উপাসকও তাঁহার উপাস্যদেবতাকে এইভাবে দেখেন। ইহা এই গ্রন্থের অনেক স্থানে দেখান হইয়াছে।

(৬) ঠিক যেমন সূর্য্যকে আমরা পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বলিয়া জানিলেও তাহাকে দেখি ছোট করিয়া—একখানা থালার মত। এরূপ দেখা ভিন্ন আমাদের যে অন্য উপায় নাই, কারণ আমাদের ইন্দ্রিয় মন অসীমের ধারণা করিতে পারে না। আমাদের সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান আপেক্ষিক (relative)

(৭) চব্বিশঘণ্টা বিষয় ব্যাপারে আমরা ইন্দ্রিয়ের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতেছি, তাহাতে মন জড় হয় না কেন?

"কিন্তু মহৎ লক্ষ্যের জন্য ফাঁকি দিয়া সারিবার সংক্ষিপ্ত রাস্তা নাই। (৮) দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। সেই দুর্গম পথ এড়াইবার উপায় থাকিলে ভাবনা ছিল না। কষ্ট করিতে হয়, চেষ্টা করিতে হয় বলিয়া বিনা প্রয়াসের পথ অবলম্বন করিলে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া যায়। যে লোক ধনী হইতে চায় সে সমস্ত দিন থাকিয়া রাত্রি একটা পর্য্যন্ত হিসাব মিলাইয়া তবে শুইতে যায়; পায়ের উপর পা দিয়া তার অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না।—আর যে ঈশ্বরকে চায়,—পথ দুর্গম বলিয়া সে কি খেলা করিয়া তাঁহাকে পাইবে?

"আসলকথা, ঈশ্বরকে সকলে চায় না, পরমার্থিক দিকে, স্বভাবতঃই অনেকের মন নাই। ধন, ঐশ্বর্য্য, সুখ, সৌভাগ্য, পাপক্ষয়, এবং পুণ্য অর্জ্জনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেবসেবা ও ধর্ম্মকর্ম্ম করাকে জর্জ্জ এলিয়াট্ other-worldliness নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ সেটা পারলৌকিক বৈষয়িকতা। তাহা আধ্যাত্মিকতা নহে। যাহাদের সেই দিকে লক্ষ্য, সাকার-নিরাকার তাহাদের পক্ষে উপলক্ষ মাত্র। সুতরাং হাতের কাছে যেটা থাকে, যাহাতে সুবিধা পায়, দশজনে যেটা পরামর্শ দেয়, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মচতুর লোক পুণ্যের খাতায় লাভের অঙ্ক জমা করিতে থাকে। নিরাকারবাদী এবং সাকারবাদী উভয় দলেই তেমন লোক ঢের আছে। (৯)

(৮) একথা সাকারবাদীও বলেন না। তাঁহাদের পথই বরং অধিক দুর্গম পথ। একজন সাকারবাদী তাঁহার ধর্ম্মসাধনের জন্য যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করেন, একজন নিরাকারবাদী তাহার কল্পনাও করিতে পারেন না। ইহা সকলেই জানেন, এসম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

(৯) ঠিক কথা। সমালোচক নিজেই লিখিয়াছেন—"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি সে আমার নয় * * * যে কিছু আনন্দ আছে, দৃশ্যে গন্ধে গানে—তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।" এরূপ সাধনায় কোন কৃচ্ছ্রসাধন, কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার আছে কি? বিষয় ভোগ ষোলআনা বহাল রাখিয়া আধ্যাত্মিক জীবনলাভ অতি দূরের কথা।



"কিন্তু আধ্যাত্মিকতা যাঁহাদের প্রকৃতির সহজ ধর্ম্ম, সংসার যাঁহাদিগকে তৃপ্ত ও বিক্ষিপ্ত করিতে পারে না—যেদিকেই স্থাপন কর, কম্পাসের কাটার মতন যাঁহাদের মন এক অনির্ব্বচনীয় চুম্বক আকর্ষণে অনন্তের দিকে আপনি ফিরিয়া দাঁড়ায়, জগদীশ্বরকে বাদ দিলে, যাঁহাদের নিকট আমাদের স্থিতি-গতি-চিন্তা-চেষ্টা ক্রিয়া-কর্ম্ম একেবারেই নিরর্থক এবং সমস্ত জগদ্ব্যাপার নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা, যাঁহারা অন্তরাত্মার মধ্যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ আনন্দ উপভোগ করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন, যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, সাধনা তাঁহাদের নিকট দুঃসাধ্য নহে এবং তাঁহারা আপনাকে আপনার ঈশ্বরকে ভুলাইয়া সংক্ষেপে কার্য্যোদ্ধার করিতে চাহেন না—কারণ, নিত্য সাধনাতেই তাঁহাদের সুখ, নিয়তপ্রয়াসেই—তাঁহাদের প্রকৃতির পরিতৃপ্তি। (ক)

"সেইরূপ কোনও স্বভাবভক্ত যখন মূর্ত্তিপূজার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি আপন অসামান্য প্রতিভাবলে মূর্ত্তিকে অমূর্ত্ত করিয়া দেখিতে পারেন, তাঁহার প্রত্যক্ষবর্ত্তী কোনও সীমা তাঁহাকে অসীমের নিকট হইতে কাড়িয়া রাখিতে পারে না; তাঁহার চক্ষু যাহা দেখে তাঁহার মন তাঁহাকে বিদ্যুদ্বেগে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়; বাহিরের উপলক্ষ্য তাঁহার নিকট কেবল অভ্যাসক্রমে থাকে মাত্র, তাঁহাকে দূর করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না; বিশ্বসংসারই তাঁহার নিকট রূপক, প্রতিমার ত কথাই নাই; যে লোকের অক্ষর জ্ঞান আছে সে যেমন অক্ষরকে অক্ষররূপে দেখে না, সে যেমন কাগজের উপর যখন "গা" এবং "ছ" দেখে তখন ক্ষুদ্র গয়ে আকার ছ দেখে না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনশ্চক্ষে শাখাপল্লবিত বৃক্ষ দেখিতে পায়—

(ক) অতি সত্য কথা। কিন্তু সেরূপ সাধক লক্ষের মধ্যে একজন পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। সাকারবাদিদিগেরও সেই একই লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা এতদূর কৃচ্ছ্রসাধন করেন।

তেমনই তিনি সম্মুখে স্থাপিত বস্তুকে দেখিয়াও, দেখিতে পান না, মুহূর্ত্তমধ্যে অন্তঃকরণে সেই অমূর্ত্ত আনন্দ উপলব্ধি করেন; যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। কিন্তু এই ইন্দ্রজাল অসামান্য প্রতিভাদ্বারাই সাধ্য। সে প্রতিভা চৈতন্যের ছিল, রামপ্রসাদ সেনের ছিল। (খ)

"আবার প্রকৃতি ভেদে কোন-কোন ও স্বভাবভক্ত লোক প্রচলিত মূর্ত্তিদ্বারা ঈশ্বরের পূজাকে আত্মাবমাননা এবং পরমাত্মাবমাননা বলিয়া অভ্যাস বন্ধন ছেদন করিয়া আত্মার মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে তাঁহার উপাসনা করেন। মহম্মদ এবং নানক তাহার দৃষ্টান্ত।

"কিন্তু আমাদের মধ্যে ভক্তির প্রতিভা খুব অল্প লোকেরই আছে। প্রত্যক্ষ সংসার-অরণ্য আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মাঝে মাঝে তাহার ঐ ডালপালার অবকাশপথে অধ্যাত্মরশ্মি দেবদূতের-তর্জ্জনীর মত আমাদের অন্ধকারের এক অংশ স্পর্শ করিয়া যায়। এখন, আমরা যদি মাঝে মাঝে সংসারের বনচ্ছায়াতলে কীটানুসন্ধান ছাড়িয়া দিয়া অনন্ত আকাশের মধ্যে মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে চাই ত কি করিব? (গ)

---

(খ) সকল সাকার উপাসকই প্রতিমার মধ্যে অনন্ত পুরুষের উপাসনা করেন। প্রতিমা তাঁহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করে। চৈতন্য ও রামপ্রসাদ মূর্ত্তিকে ছাড়াইয়া অমূর্ত্তের দর্শন লাভ করেন নাই; মূর্ত্তির মধ্যেই অমূর্ত্তের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। They met the deity through and within the image and not in-spite of the image.

(গ) সমালোচকও তাহা প্রকৃত পক্ষে করিতে চান না—

"যে কিছু আনন্দ আছে, ছন্দে গন্ধে গানে।
তোমার আনন্দ রবে, তার মাঝখানে।"

তিনি সংসারের বনচ্ছায়া-তলে থাকিয়াই, দৃশ্যগন্ধগানের মধ্যে মুক্তির আনন্দ ভোগ করিতে চান। সাকারবাদীও তাহাই করেন। সেই বনচ্ছায়ার ফাঁকে ফাঁকেই মুক্ত আকাশ দেখা যায়। যিনি মুক্তক্ষেত্রে বাহির হইয়া অনন্ত আকাশ তলে দাঁড়াইতে চান, তাঁহাকে বৈরাগ্যসাধন করিতেই হইবে। হিন্দু সন্ন্যাসীরা সেই পথাবলম্বী।



"যদি চাই" একথা বলিতে হইল। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা সকলে চাই না, ঈশ্বরকে উপলক্ষ্য করিয়া আর কিছু চাই। কিন্তু যদি চাই তবে কি করিব।

"তবে যাহাতে বাধা যাহাতে অন্ধকার তাহা সাবধানে এড়াইয়া যেদিকে আলোক আপনাকে প্রকাশ করে সেই পথ দিয়া পাখা মেলিয়া আকাশের দিকে উড়িতে হইবে। সে পথ কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের পথ, ধূলির পথ, পৃথিবীর পথ নহে; তাহা পদচিহ্নহীন বায়ুর পথ, আলোকের পথ, আকাশের পথ। আমাদের পক্ষে সেই এক পথ।

"যাঁহারা মুক্তক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা মাটিতে বসিয়াও আকাশের আলো পান, কিন্তু যাঁহারা জটিল প্রবৃত্তিজালে পরিবৃত হইয়া আছে, তাঁহাদিগকে একেবারে পৃথিবীর দিক হইতে উড়িয়া বাহির হইয়া যাইতে হয়।

"তাহা না করিয়া আমরা যদি আমাদেরই প্রবৃত্তি আমাদেরই আকৃতি দিয়া দেবতা গড়ি, তবে তাহার মধ্যে মুক্তি কোনখানে? যদি তাঁহাকে স্নান করাই, খাওয়াই, মশারিতে শোয়াই, এমন কি তাঁহার জন্য নটী নিযুক্ত করিয়া রাখি তবে তাহার ফল কি হয়? তবে নিজের প্রবৃত্তিকেই দেবতা করিয়া পূজা করা হয়। (১০) আমাদের লোভ, আমাদের হিংসা আমাদের ক্ষুদ্রতাকে দেবতারূপে অমর করিয়া রাখি। এই কারণেই কালীকে দস্যু আপন দস্যুবৃত্তির সহায় বলিয়া জ্ঞান করে; মিথ্যাশপথকারী আদালতে জয় লাভের জন্য পশু মানত করে, এমন কি, যে সকল অন্যায় অবিচার দুষ্কর্ম্ম মনুষ্যলোকে গর্হিত বলিয়া খ্যাত দেবচরিত্রে তাহাও অনিন্দনীয় বলিয়া স্থান পায়। আমাদের দেশের দেবতা কি কেবল মূর্ত্তিতেই বদ্ধ যে রূপক ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে আমরা ভাবের স্বাধীনতা লাভ করিব?

---

(১০) ইহার উত্তর সপ্তম অধ্যায়ে দেওয়া হইয়াছে। ২১৩ পৃষ্ঠা দেখ।

চারি হাতকে যেন আমরা চারিদিকবর্ত্তী কর্ম্মশীলতা বলিয়া মনে করিলাম, কিন্তু পুরাণে, উপপুরাণে, যাত্রায়, কথকতায় তাঁহার জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ রাগদ্বেষ, সুখ-দুঃখ দৈন্য-দুর্ব্বলতার বিচিত্র পাঠ ও পাঠান্তর হইতে মনকে মুক্ত করিব কেমন করিয়া ? (১১) যতপ্রকার কৌশলে মানুষের মনকে ভুলাইয়া একেবারে আটে-ঘাটে বাঁধা যায় তাহার কোনটীরই ত্রুটী নাই। এবং এতপ্রকার স্থূল শৃঋলে সযত্ন বন্ধনকে গ্রন্থকার যদি তাঁহার নির্গুণ ব্রহ্মলাভের সোপান বলিয়া গণ্য করেন, তবে মাছির পক্ষে মাকড়সার জালে পড়াই আকাশে উড়িবার উপায় মনে করা অসঙ্গত হইবে না। (১২)

"দেব-চরিত্র সম্বন্ধে যে সকল ভ্রষ্ট আদর্শের কল্পনা আমাদের দেশে শাখা পল্লবিত হইয়া চারিদিকে শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহা কল্পনার বিকার ; গ্রন্থকার বোধ হয় তাহা হিন্দু সমাজের অধোগতির ফল বলিয়া জ্ঞান করেন এবং সম্ভবতঃ তাহা সংশোধন করিয়া লইতে উপদেশ দেন। সংশোধনের উপায় কি ? তিনি একস্থলে বলিয়াছেন "সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার বিধি রহিয়াছে।"

"বিধি রহিয়াছে কিন্তু কেহ কখনও চেষ্টা করিয়াছেন ? পৌরাণিক ধর্ম্মের সহিত বৈদিক ধর্ম্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কোনও পণ্ডিত আজ পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের একটা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কি ? ইহা কি সকলের দ্বারা সাধ্য ? (১৩)

---

(১১) ১১৪—১৬ পৃষ্ঠা দেখ।

(১২) অনেক মহাত্মা সেই মাকড়সার জাল ছিঁড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু আবার সেই জালে ধরা দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, যাহাকে জাল বলা যায়, তাহা প্রকৃত পক্ষে জাল নহে, তাহা আধ্যাত্মিক জীবন লাভের সোপান।

(১৩) ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক মহাত্মা সে চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন অনেক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারক অদ্যাবধি তাহা করিতেছেন।



"পৌরাণিক ধর্ম্ম ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম্ম। কালক্রমে হিন্দুর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৈদিক আর্য্যগণ যে সমাজ, যে রীতি, যে বিশ্বাস, যে মানসিক প্রকৃতি লইয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অনার্য্যদের সংঘর্ষে মিশ্রণে বিচিত্র অবস্থান্তরে স্বভাবের নিয়মে ক্রমশঃই তাহা রূপান্তরিত হইয়া আসিয়াছে। সেই সকল নব নব অভিব্যক্তি নব নব পুরাণে আপনাকে আকার বদ্ধ করিয়াছে। বেদ যে অবস্থার শাস্ত্র, পুরাণ সে অবস্থার শাস্ত্র নহে। সুতরাং বেদকেই যদি প্রমাণ বলিয়া মানা যায় তবে পুরাণকে ছাড়িতে হয়। এমন কি গ্রন্থকার নিজে বলিয়াছেন এবং ফলেও দেখা যায়, এক পুরাণকে মানিলে, অন্য পুরাণের সহিত বিরোধ বাধিয়া উঠে। বর্ত্তমানে হিন্দু সমাজ বেদকে মুখে মান্য করিয়া কাজের বেলা পুরাণকে অবলম্বন করে। উভয়ের মধ্যে যে কোনপ্রকার অসামঞ্জস্য আছে সে তর্ক উত্থাপিত হয় না। (১৪)

"হিন্দু ধর্ম্মের এই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। কারণ পুরাণ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বদ্ধ নহে, প্রচলিত ভাষাতেও রচিত হয়।—মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। মেয়েদের ব্রতকথাও তাহার উদাহরণ; অন্নদামঙ্গলে যদিও পৌরাণিক শিবদুর্গার লীলা বর্ণিত, এবং যদিও তাহার রচয়িতা ভারতচন্দ্র শাস্ত্রে পণ্ডিত তথাপি তাহার মধ্যে জন সাধারণ প্রচলিত আধুনিক কল্পনা-বিকার সহজেই স্থান লাভ করিয়াছে। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও

---

(১৪) বেদের সত্য সকল পুরাণের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে। যখন পুরাণের সহিত বেদের অনৈক্য দেখা যায়, তখন পুরাণকে ছাড়িতে হইবে। এক পুরাণের সহিত অন্য পুরাণের বিরোধ বেদের দ্বারাই মীমাংসিত হয়। বেদে যাহা theory, পুরাণে তাহার practical উপদেশ আছে। সেই জন্যই সাধারণতঃ পুরাণের উপদেশানুসারে উপাসনাদি নির্ব্বাহিত হয়।

তাহাই। হর পার্ব্বতীর কোন্দল, কোঁচনারীদের প্রতি শিবের আসক্তি ও নিজের গাত্রমল দিয়া দুর্গাকর্ত্তৃক খেলার পুত্তলি নির্ম্মাণ ও তাহা হইতে গণেশের জন্ম, এ সমস্ত কাহিনী আধুনিক, প্রাদেশিক; শ্রুতি ইহার মূল নহে, লোকের কল্পনাই ইহার মূল; দেবতাকে নিজের পরিমাপে নির্ম্মাণ চেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ। (১৫) ইহার মধ্যে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য এবং অসাধারণ লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য।

"সংক্ষেপে আমাদের শেষ বক্তব্য এই যে, যে সকল ভক্ত মহাপুরুষ চির প্রথাগত সাকার উপাসনা ত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা অসামান্য প্রতিভাবলে উদ্দীপ্ত ভাবাবেগে দৃষ্টিগোচরকেও দৃষ্টিপথাতীত করিয়া তুলিয়াছেন। বাধা তাহাদের নিকট বাধা নহে, রঙ্গ্‌টেন আবিষ্কৃত রশ্মির ন্যায় তাঁহাদের মন শত প্রাচীর বেষ্টিত জড় আবরণ অনায়াসে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোকের কাছে বাধা যে বাধা তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহাদের মনের স্বাভাবিক জড়ত্ব জড়কে আশ্রয় করিতে চায়, তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই। ইহা তাহাদিগকে অগ্রসর করে না, বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। ইহাদ্বারা সে ভক্তিসুখ লাভ করিতে পারে, কিন্তু তাহা মুক্তি সুখ নহে। (১৬)

---

(১৫) ঠিক কথা। যে যে প্রকৃতির লোক, সে তাহার নিজ প্রকৃতি অনুসারে তাহার উপাস্য দেবতা কল্পনা করিয়া লয়। যাহারা ঘোর তামসিক প্রকৃতির লোক, তাহাদিগকে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক উপদেশ দেওয়া বৃথা। ইহার সংশোধনের উপায় সৎশিক্ষা বিস্তার ও সদ্‌গুরুর উপদেশ দান।

(১৬) মুক্তি সুখ লাভ করা পরম সৌভাগ্যের কথা। মুক্তির অধিকারী সকল সমাজেই অত্যন্ত বিরল। সাধারণ লোকে জড়ের সাহায্যে ভক্তি সুখ লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু সেই ভক্তি সুখই বা কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যাঁহারা জড়কে



"সকল সম্প্রদায়েরই অধিকাংশ লোক সমাজের অনুসরণে অভ্যস্ত আচার পালন করেন। ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকে নিয়মিত কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করেন এবং শব্দ শুনিয়া যান, এবং মূর্ত্তি উপাসকদের অনেকে বাহ্যিক পূজা ও মৌখিক জপ করিয়া কর্ত্তব্য সারিয়া দেন। কিন্তু যাঁহারা কেবল সামাজিক ব্রাহ্ম নহেন, আধ্যাত্মিক ব্রাহ্ম তাঁহাদের উপাসনাকে গ্রন্থকার যেরূপ উদ্‌ভ্রান্ত মনে করেন তাহা সেরূপ নহে।" (১৭)

---

মুক্তি লাভের বাধা মনে করিয়া সাকারোপাসনা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা মুক্তি ত পানই না, পরন্তু ভক্তিসুখ লাভেও বঞ্চিত হন। তাঁহারা জড়কে ছাড়িতে পারেন, কিন্তু জড় তাঁহাদিগকে ছাড়ে কই? জড়ভীতিই অনেকের নূতন বন্ধন হইয়া দাঁড়ায়, ইহা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাস পড়িলে জানা যায়।

(১৭) "আধ্যাত্মিক ব্রাহ্ম" দিগকে গ্রন্থকার যথেষ্ট ভক্তি করেন।

## (৩) আর কয়েকটি প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার পুস্তকের প্রতিবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী "সাকারবাদের অদ্ভুত সমর্থন" নামক এক পুস্তিকা বাহির করেন। সেই সঙ্গে ১৮২০—২১ শকে প্রকাশিত "তত্ত্বকৌমুদী" পাক্ষিক পত্রিকায় "অযথা অভিযোগ" নামে আর একটি বিস্তৃত সমালোচনা ও প্রতিবাদ বাহির হয়। গ্রন্থমধ্যে এই দুইটি প্রতিবাদের কোন কোন কথার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কথার উত্তর নিম্নে দিতেছি। ধীরেন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধে গ্রন্থকারকে যেরূপ গালি দিয়াছিলেন আমার বিশ্বাস এখন তাহা পাঠ করিলে তিনি নিজেও বিশেষরূপে লজ্জিত হইবেন। * সুতরাং তাঁহার সে সকল কথার উত্তর দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

---

* নিম্নে তাহার দুইটি নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি।—

(১) "গ্রন্থকার দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিয়াছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, কিন্তু তিনি আবার ভয় দেখাইয়াছেন যে ব্রহ্মোপাসনা এত কঠিন যে তাহা বুঝিতে পারিলে কেহ তাহার বাড়ীর কাছদিয়াও যাইতে চাহিবে না। কঠিন বলিয়াইত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে, দুর্গম বলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ত অতি কাপুরুষের কাজ। চিত্ত সংযমের নামে সিংহ মহাশয়ের বুঝি হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাই তিনি ব্রহ্মোপাসনার ত্রিসীমানায় আসিতে প্রস্তুত নহেন। ভয় পাইবারই কথা। যে দেশে নৈতিক চরিত্রে শত জঘন্যতা সত্বেও লোকে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হয়, যে দেশে উপাস্য দেবতা চরিত্রহীন হইয়াও উপাসকের ভক্তি শ্রদ্ধা হইতে বঞ্চিত হয় না, সেই দেশে জন্মিয়া সোজা ধর্ম্ম থাকিতে ধর্ম্মসাধনে সংযম প্রভৃতি বিভীষিকা দেখিয়া কেহ কেহ যে ভীত হইবেন তাহার আর আশ্চর্য্য কি?"

গীতার "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাং" ইত্যাদি—ভগবদ্‌বাক্যের ব্যাখ্যার উপরে এইরূপ সমালোচনা কতদূর শোভন ও প্রাসঙ্গিক তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।



(১) ব্রহ্মের প্রকাশমান অবস্থা সসীম, ব্রহ্ম অপেক্ষা ক্ষুদ্র; দেশকালের অধীন; দেশকাল আত্মার অধীন; সুতরাং উপাসক অপেক্ষা উপাস্য ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

উত্তর ঃ—মূলতঃ ব্রহ্মে ও আত্মায় কোন ভেদ নাই; ব্রহ্ম ও আত্মা একই বস্তু। কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে ক্ষুদ্র। জীবাত্মা দেশকালের দ্বারা সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ জীবের নিকট তাহার উপাস্য ব্রহ্ম ও সীমাবদ্ধ

---

(২) "গ্রন্থকার একবার বলিতেছেন 'আমাদের এরূপ কোন চিত্তবৃত্তি নাই যদ্দ্বারা আমরা নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে জানিতে পারি'। আবার তিনি প্রশ্ন করিয়াছেন—'আমরা কি নির্গুণ ব্রহ্মকে জানি না? ইহার উত্তরে বলেন—'মানুষ ব্রহ্মকে, জানিতে পারে বৈ কি? কিন্তু তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। মানুষ ব্রহ্ম হইয়া যায়। জানিবার যখন শক্তিই নাই তখন জানি কিরূপে? [অধ্যাত্মযোগের সাধনা দ্বারা সেই শক্তি জন্মে—কিন্তু যখন সমাধি দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তখন "ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মৈব ভবতি"—ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্ম হইয়া যান, তখন তাঁহাকে মানুষ না বলিয়া জীবন্মুক্ত পুরুষ বা ব্রহ্ম বলাই সঙ্গত] তিনি আবার বলিতেছেন—'মানুষের মনুষ্যত্ব ব্রহ্মস্বরূপে লীন হইয়া যায়'—'নিরাকার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে তাহার মানুষত্ব ছাড়িতে হয়।' [ঠিক কথা—যিনি অধ্যাত্ম যোগের সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে মানুষ না বলিয়া জীবন্মুক্ত বলাই সঙ্গত]।

"ওখানে বলিতেছেন ব্রহ্মজ্ঞ হইলে মানুষের মানুষত্ব যায়, এখানে বলিলেন মানুষত্ব গেলে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়; এবং পূর্ব্বে বলিয়াছেন—ব্রহ্মকে জানিতে পারে এরূপ চিত্তবৃত্তি তাহার নাই। কিরূপ চিত্তবিকার উপস্থিত হইলে এরূপ প্রলাপোক্তি সম্ভব তাহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন।"

আমি যাহা বলিয়াছি স্বর্গীয় মহাত্মা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও তাহা অন্য ভাবে বলিয়াছেন—"একটা নুনের পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যাই নেবেছে এমনি গ'লে মিশে গেল। তখন খবর কে দিবেক?" ইহাও কি প্রলাপোক্তি?

রূপে প্রতীয়মান হন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ব্রহ্মের চারিটি অবস্থা বা প্রকাশ এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জীবাত্মার ও চারিটি অবস্থার বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইহার কোন অবস্থায়ই উপাস্য উপাসক হইতে ক্ষুদ্র হন না।

(২) যদি বল তুরীয় ব্রহ্ম নির্গুণ, তুমি কিরূপে জানিলে যে নির্গুণ ব্রহ্ম পুরুষ নহেন? তিনি নির্গুণ হইলে তাঁহার সম্বন্ধে হাঁ—না কিছুই বলা চলে না।

উত্তর। দ্বিতীয় অধ্যায় ১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) Concept এর ধারণা ব্যতীত Percept এর ধারণা হয় না।

উঃ। ৯৮-৯৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(৪) আত্মজ্ঞান ছাড়া বিষয়জ্ঞান হয় না।

উঃ। ৩৭ পৃষ্ঠা দেখ। কিন্তু বিষয়ের জ্ঞানের সহিত আত্মার অর্থাৎ জ্ঞাতার (Subject) যে জ্ঞান হয় তাহাই চরমজ্ঞান নহে। প্রকৃত আত্মজ্ঞান, যাহা দ্বারা নির্ব্বাণমুক্তি হয়, তাহার মধ্যে বিষয় জ্ঞানের লেশ মাত্রও থাকে না। (৪৯ পৃষ্ঠা দেখ)

(৫) সগুণ ও সাকার এক নহে; সাকার বিশিষ্ট বস্তুসকল গুণের প্রকাশ হইলেও গুণের সকল প্রকাশই সাকার নহে।

উঃ। একথা স্বীকার করি। বেদান্তমতে ঈশ্বরের তিনটি দেহ আছে—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। কারণ দেহকে আকার বিশিষ্ট বলা যায় না। কিন্তু অন্য দুইটি দেহই সাকার। ঈশ্বরের কারণ শরীর সগুণ হইয়াও সাকার নহে।

(৬) ব্রহ্ম সাকার না হইয়াও সকল কর্ম্ম করিতে পারেন।

উঃ। আবার ইচ্ছা করিলে আকার ধারণও করিতে পারেন। (তৃতীয় অধ্যায় ৬৭ পৃঃ দেখ)।



(৭) গীতার "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং" ইত্যাদি দ্বাদশ অধ্যায়ের শ্লোকে নির্গুণোপাসনা অসম্ভব বলিয়া উক্ত হয় নাই, ক্লেশ সাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উঃ। "নেদং যদিদমুপাসতে" এই শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ২৮পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। গীতায় যাহাকে নির্গুণোপাসনা বলা হইয়াছে, তাহার বিবরণ ২৫৬ পৃষ্ঠায় দেখ। উক্ত শ্রুতিবাক্যের সহিত গীতার কোন বিরোধ নাই। গীতায় যে নির্গুণোপাসনার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার নাম অধ্যাত্ম যোগ, ব্রাহ্ম-সমাজের নিরাকার উপাসনার সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই।

(৮) সন্ধ্যার মন্ত্রে সাকারোপাসক অগ্নি, জল, সূর্য্য প্রভৃতির উপাসনা করেন।

উঃ। কখনই না। সাকারোপাসক এই সকল জড়বস্তুর উপাসনা করেন না, এই সকল জড়াধিষ্ঠিত বিশ্বব্যাপী পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। (১৫১ পৃষ্ঠা দেখ)।

(৯) ধারণায় আমাপেক্ষা যে ক্ষুদ্র তাহাকে ধারণা করা সম্ভব। ধারণা ভিন্ন উপাসনা না হইলে ক্ষুদ্রেরই উপাসনা করা হয়।

উঃ। আমাদের মন এরূপ ভাবে গঠিত যে তাহা space ও time এর দ্বারা সীমাবদ্ধ করা ভিন্ন কোন বিষয়েরই চিন্তা করিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর চিন্তা করিতে হইলেই তাঁহাকে সেই মনের কুঠরিতে ফেলিয়া সসীমভাবে চিন্তা করিতে হইবে। ধারণাও একপ্রকার চিন্তা। সুতরাং ঈশ্বরকে ধারণা করিতে হইলে সেই সসীম ভাবেই চিন্তা করিতে হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ক্ষুদ্র হন না। আকাশের চিত্র আমার মনে সীমাবদ্ধ ভাবে প্রতিফলিত হয় বলিয়া, আকাশ কি ক্ষুদ্র হইয়া যায়? কখনই না। হিগেলও সসীমের মধ্যে অসীমের ধারণার কথা বলিয়াছেন, নচেৎ অনন্তের জ্ঞান অসম্ভব। (৪৫ ও ১৬৩ পৃষ্ঠা দেখ।)

(১০) ব্রহ্মের রূপকল্পনা যে অপরাধ তাহা ব্যাসের "রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য" এই উক্তিতে জানা যায়।

উঃ। এই ব্যাসোক্তির ব্যাখ্যা ২৮০ পৃষ্ঠায় দেখ।

(১১) শিব বিষ্ণু গণপতি সূর্য্য দুর্গা প্রভৃতির উপাসনা যদি এক ব্রহ্মেরই উপাসনা হয়, তবে এই সকল সম্প্রদায় বিভাগ কেন?

উঃ। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও ত সম্প্রদায় বিভাগ দেখা যায়। হিন্দুধর্ম্ম উপাসকদিগকে উপাস্যের রূপগুণাদি চিন্তন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছে। সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা প্রকাশ হইতেই নানা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। কিন্তু সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তাঁহারা সকলেই জানেন যে তাঁহারা এক পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। (২০৭ পৃষ্ঠা দেখ,

(১২) "যচ্ছেদ্ বাঙ্ মনসি প্রাজ্ঞঃ"—এস্থলে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে মনে সংযত করার কথা বলা হইয়াছে, লয় করার কথা বলা হয় নাই। নচিকেতা লয় সাধন না করিয়াও কি প্রকারে যমের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন? অর্জ্জুনইবা একমাত্র আগ্রহ দ্বারাই বা কি প্রকারে ভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্পন্ন রূপ দেখিতে পাইলেন?

উঃ। সমাধি সাধনে ইন্দ্রিয়াদি মনে, মন বুদ্ধিতে যেরূপ ভাবে সংযত হয়, তাহারই অপর নাম লয়। শাস্ত্রের অন্যত্র এই লয় কথাই ব্যবহৃত হইয়াছে। নচিকেতা যখন ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন, তখনই তাঁহার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছিল তাহা কে বলিবে? ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ শ্রবণ এক কথা, আর সাধনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ অন্য কথা। অর্জ্জুন ভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন রূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন নাই।

(১৩) শাণ্ডিল্য সূত্রে ভক্তির লক্ষণে "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে" বলা হইয়াছে, সাকার ঈশ্বরের কোন কথা নাই।



উঃ। শাণ্ডিল্য ঋষি ঈশ্বর মানে যে নিরাকার ঈশ্বর হইতে পারেন, একথা বোধ হয় ধারণাই করিতে পারেন নাই। কারণ বেদান্তমতে ব্রহ্মই নির্গুণ নিরাকার, ঈশ্বর সগুণ, সাকার।

(১৪) গোবিন্দাচার্য্য তাঁহার কারিকায় লিখিয়াছেন—

"উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম যত্তৎশব্দোপলক্ষিতম্।"
যতোবেতি যতোবায় ইত্যাদি শ্রুতিসম্মতম্॥"

ইহা দ্বারা পরব্রহ্ম উপাস্য একথা বলা হইয়াছে।

উঃ। কোন কোন শ্রুতিতেও "ব্রহ্ম উপাস্য" একথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সে উপাসনার অর্থ অন্য প্রকার। ৩০ পৃষ্ঠা দেখ।

(১৫) বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে, যে ব্যক্তি দেবতাদিগের পূজা করে সে দেবতাদিগের পশু ("দেবানাং পশুরেব সঃ")। সুতরাং ব্রহ্মোপাসনাই একমাত্র কর্ত্তব্য।

ইহার তাৎপর্য্য এই, জগতে গো-অশ্বাদি পশুগণ যেমন নিজেদের প্রভু বা রক্ষককে ভোগ বা পালন করিয়া থাকে, তদ্রূপ বহুপশুস্থানীয় এক একটি অবিদ্বান্ পুরুষ ও দেবগণকে যাগযজ্ঞাদি দ্বারা পালন করিয়া থাকে। সেই জন্য কোন একটি মনুষ্য অবিদ্যাবস্থা হইতে উত্থান করিবার উদ্যোগ করিলে দেবগণের অসন্তুষ্টি জন্মে। সেই জন্য মানুষের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দেবগণের প্রিয় নহে। এস্থলে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ কথাও বলা হইয়াছে যে যিনি অবিদ্যাবস্থা হইতে উত্থিত হইয়াছেন, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন কেবল তিনিই পশু নহেন। আর সকলেই দেবতাদের পশু, কেহ বাধ্য পশু আর কেহ বা অবাধ্য পশু।

---

# সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার সম্বন্ধে কয়েকখানি প্রশংসাপত্র হইতে উদ্ধৃত।

পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ৺চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের মত :—

"সাকার নিরাকার তত্ত্ববিচার পুস্তকের কিয়দংশ পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাষা মার্জ্জিত, প্রাঞ্জল। গ্রন্থকারের বহুদর্শিতা, চিন্তাশীলতা এবং সূক্ষ্ম গবেষণা গ্রন্থে বিশেষরূপে পরিব্যক্ত হয়। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় নিতান্ত জটিল ও দুরূহ, তাহা গ্রন্থের নামেই প্রকাশ পাইতেছে। তথাপি গ্রন্থকারের লিপিকৌশল বিষয়ের দুরূহতা ও জটিলতা যতদুর সম্ভব হইতে পারে, নিবারণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে বিষয়ে গ্রন্থকার অনেকটা কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ইহা সামান্য প্রশংসার কথা নহে গ্রন্থকারের ধর্ম্মানুরাগ অতীব প্রশংসনীয়। আমার বিশ্বাস এই গ্রন্থপাঠে অনেক সন্দিহান ব্যক্তি যথেষ্ট উপকার পাইবেন। সর্ব্ববিষয়ে গ্রন্থকারের সহিত আমার মতের মিল না থাকিলেও, গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে, ইহা না বলিয়া থাকিতে পারি না। আশীর্ব্বাদ করি, গ্রন্থকার দীর্ঘজীবী হউন।"

সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ৺চন্দ্রনাথ বসু এম, এ মহাশয়ের ১৩০৫ সনের ৮ই ভাদ্র তারিখের পত্র হইতে উদ্ধৃত :—

"এমন সুন্দর গ্রন্থ বাঙ্গালায় অতি অল্পই দেখিয়াছি। আপনার পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, তর্ক নৈপুণ্য, যুক্তির সুন্দর শৃঙ্খলা ও চমৎকার বান্ধনী ভাষা ও ভাবের ভদ্রোচিত পরিশুদ্ধতা এই সমস্ত দেখিয়া আমি কি পর্য্যন্ত

আনন্দ লাভ করিয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। এই গ্রন্থখানি লিখিয়া আপনি বাঙ্গালা সাহিত্যের গুরুত্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।"

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত **শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ** বলেন—

"আপনার গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রচুর শিক্ষা ও আনন্দ লাভ করিয়াছি। আপনার শাস্ত্রজ্ঞান, যুক্তিকৌশল ও চিন্তাশীলতা বিশেষভাবে প্রশংসনীয় আপনি বিচার করিয়া যথার্থ তত্ত্বেই উপনীত হইয়াছেন।" (১২।১০।৯৮)।

উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল ইনস্পেকটার **৺রায় রাধানাথ রায় বাহাদুরের** পত্র হইতে উদ্ধৃত—

"আপনার "সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার" পাঠ করিয়া আমি কিরূপ প্রীতিলাভ করিয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে। পাণ্ডিত্যে এবং যুক্তিকৌশলে এ পুস্তকখানিকে বঙ্গভাষার গৌরবস্তম্ভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। ইহা কেবল বাঙ্গালীর সম্পত্তি নহে, ভারতীয় প্রত্যেক হিন্দুর সম্পত্তি। আমি আশা করি ইহা প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহভূষণ হইবে।" ১৯।১০।৯৮।

পণ্ডিতপ্রবর ভক্তকবি **শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন** মহাশয় বলেন—

"আমি আপনার সাকার ও নিরাকার তত্ত্ববিচার গ্রন্থ অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি। উহাতে আপনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রকৃত প্রতিবাদ নাই। সাকারবাদের বিরুদ্ধে যিনি যাহা ইচ্ছা বলুন, আসল কথার খণ্ডন কেহ করিতে পারেন বলিয়া আমার ধারণা নাই। আপনি



যে যথার্থ ভক্ত, সুপণ্ডিত ও সুলেখক, তাহা আপনার গ্রন্থ পড়িলেই জানা যায়। তারা মা আপনাকে নিরাময় ও চিরজীবী করুন।

তদ্ব্রহ্ম কীদৃগ্ গুণরূপহীনং
কিং বুধ্যতে মূঢ়ধিয়া ময়াতৎ।
রূপেণ তারা মম মা জ্বলন্তী
ধত্তে গুণান্ সা কতি বা বদেৎ কঃ॥

রূপহীন গুণহীন ব্রহ্ম যে কেমন ?
কি বুঝিব ? আমি মূঢ় অজ্ঞানে মগন ;
আমার তারা মা সে যে রূপে আলো করে;
কে বলিতে পারে সে যে কত রূপ ধরে ?"

LATE MR. B. C. MITRA M. A.—District and Sessions Judge wrote :—

" * * My opinion is in general agreement with that expressed by Babu Chandra Nath Basu. Both in matter and manner, barring what will be presently noticed, I consider your effort excellent. It has given me sincere pleasure to observe in the book a combination of earnestness, enthusiasm and close reasoning which is really very bracing and refreshing * * * * * * * * * 23. 10. 98.

LATE BABU HARI CHARAN RAY M. A.—Principal Chittagong college wrote :—

" * * * The manner in which you have dealt with the various abstruse questions reflects great credit on you, and the Hindu community has reason to be grateful to you for your able championship. The insight you have displayed into some of the obscure

corners of the most metaphysical of all religions is hardly to be met with in any one else of your age. What is often rare in controversial works of the kind in question is good taste and moderation. But in this respect too you have set an example worthy of the religion you profess. In short I consider your work worthy of the disciple of your *Gurudeva*" (19. 12. 98).

## শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ কবিরঞ্জন প্রণীত অন্যান্য পুস্তক।

### ১। ধ্রুবতারা ( সামাজিক উপনাস )

সপ্তম সংস্করণ—মূল্য ২৲

এই সর্ব্বজন সমাদৃত উপন্যাসের অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। **৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর** C. I. Z. বলেন—"আপনার ধ্রুবতারা বাঙ্গালা সাহিত্যে একটি অত্যুজ্জ্বল তারারূপে ধ্রুবস্থান পাইবে।"

### ২। উড়িষ্যার চিত্র ( অভিনব উপন্যাস )

৩য় সংস্করণ—মূল্য ২৲

এই আখ্যায়িকা কৌতুক, করুণ ও হাস্য রসের জীবন্ত ছবি। ইহা কল্পনার বিচিত্র বর্ণ সম্পদে উজ্জ্বল, অথচ ইতিহাসের উপাদানে পরিপুষ্ট। উৎকলে ভ্রমণকারিগণ ইহাতে উড়িষ্যার সামান্য কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সমগ্র সমাজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, ইত্যাদি সমাগ্রে দেখিবেন। **শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** বলেন,—

"সচেতন চিত্ত এবং সর্ব্বদর্শী কল্পনা বিধাতার দুর্লভ দান। আচার



জানিলেই জানান যায় না। যতীন্দ্র বাবুর জানিবার শক্তি ও জানাইবার শক্তি উভয়েরই ভালরূপ পরিচয় পাওয়া গেছে।"

ইহা একধারে ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও বাস্তব চিত্র সম্বলিত উপন্যাস ( Realistic novel ) বঙ্গভাষায় এরূপ পুস্তক আর নাই।

### ৩। অনুপমা ( সামাজিক উপন্যাস )

২য় সংস্করণ—মূল্য ২৲

"*Anupama* is a novel in which some of the burning social problems of the day e. g., the elevation of the depressed classes, the remarriage of Hindu widows &c have been discussed. ... ... Those who love to retain all that is best and noblest in Hindu Society cannot do better than go to the author for inspiration."

*Modern Review.*

শ্রীযুক্ত রায় দীননাথ সান্যাল বাহাদুর বলেন,—

"বঙ্গের সাহিত্য গগনে আপনার "অনুপমা" ধ্রুবতারার মতই ধ্রুবভাবে বিরাজ করিবে, এরূপ আশা করিতে পারা যায়।" বাল বিধবাদের হস্তে দেওয়ার উপযুক্ত এরূপ উপন্যাস আর নাই।

### ৪। তোড়া

২য় সংস্করণ — মূল্য ॥৹

ইহাতে কয়েকটি সুমধুর ব্যঙ্গ চিত্র, সরস ক্ষুদ্র গল্প ও কৌতুকজনক সমালোচনা আছে। বিবাহের উপহার দেওয়ার পক্ষে উৎকৃষ্ট।

### ৫। তপস্যা

মূল্য ॥৹

গ্রন্থকার বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই নব জাগরণের দিনে নব্য যুবকদিগকে জাতীয় উন্নতির পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আত্মশক্তি ( Soul force ) লাভ করিতে হইলে কিরূপ তপস্যার প্রয়োজন তাহা

তিনি "বিশ্বামিত্রের তপস্যা" প্রভৃতি প্রাচীন আখ্যায়িকার সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য পাঠ্য।

৬। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষা। মূল্য ॥০

আর্টের দোহাই দিয়া যে সকল দুর্নীতিপূর্ণ গল্প ও উপন্যাস সাহিত্য ও সমাজের স্বাস্থ্য দূষিত করিতেছে, এই পুস্তকে তাহার কয়েকখানি আর্টের দিক দিয়া ও সমাজের দিক দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হইয়াছে। এই পুস্তকের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"সেই সময়ে প্রবন্ধগুলি পাঠ করিয়া যে আরাম ও আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, পূতিগন্ধপূর্ণ গৃহে সহসা সুবিমল প্রভাত-বায়ু প্রবেশ করিলে যে আরাম ও আনন্দ পাওয়া যায়, একমাত্র তাহারই সহিত উহার তুলনা হয়।"

---